নূরজাহান

সুকন্যা —



করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯



প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৩৭

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
দিলীপকুমার চৌধুরী
সরস্বতী প্রেস
১২ পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
শ্রীগণেশ বসু

দশ টাকা



নূরজাহান

ভূমিকা

নূরজাহানের জীবন-আলেখ্য মুঘল-ইতিহাসের এক কৌতূহলোদ্দীপক উপাখ্যান। নানা তথ্য, বিদেশীদের ভ্রমণকাহিনী, আত্মকথা, জীবনী, রাজ্য-বিবরণী প্রভৃতির মধ্য দিয়া এই বিচিত্ররূপিণীর বর্ণনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সেই সমস্ত উপাখ্যান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে এই জীবনকাহিনী রচনার প্রয়াস।

সম্রাজ্ঞী নূরজাহান কখনও খোলা দরবারে সিংহাসনে বসে রাজ্য পরিচালনা করেন নি, জালিপাথরের আড়াল থেকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, অদৃশ্য থেকে দৃশ্য নিয়ন্ত্রণ করেছেন, আর সিংহাসনে বসে জাহাঙ্গীর তাতে সায় দিয়েছেন। তাই নূরজাহানের জীবন-আলেখ্যের সঙ্গে সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসন, মুঘলযুগের ইতিহাস, যুদ্ধ-অভিযান, জয়-পরাজয়, আমীর-ওমরাহদের খুঁটিনাটি বর্ণনা জড়িয়ে গেছে। তবে এটা ধান ভানতে শিবের গীত নয়। প্রতিমার পূর্ণ পরিস্ফুটন যেমন চালচিত্রে, নূরজাহানের পূর্ণ প্রকাশ তেমনি জাহাঙ্গীরের রাজত্বে, মুঘল যুগের ঐতিহাসিক ঘটনায়।

সন্নিবিষ্ট কাহিনী ও চরিত্র কল্পনাশ্রয়ী নয়, পুরোপুরি ইতিহাস-কেন্দ্রিক। তবে সংলাপগুলি তৈরি করে নিতে হয়েছে—অবশ্য ঘটনা ও পরিবেশের সঙ্গে তাল রেখে।

গ্রন্থের নট-নটীদের নাম উচ্চারণ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, খাঁটি ফার্সী উচ্চারণে আমরা অনভ্যস্ত বলে প্রচলিত জনপ্রিয় উচ্চারণ গৃহীত হয়েছে।

অনেক গ্রন্থ, বিবরণী, তথ্য সন্ধান করে ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কাহিনীকে ঐক্য দেবার চেষ্টা করেছি। কিছু কিছু গ্রন্থের তালিকা গ্রন্থপঞ্জীতে উদ্ধৃত হয়েছে। যাঁরা আমাকে এই দুষ্কর কার্যে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চৌধুরী, অধ্যাপক ডক্টর নিমাইসাধন বসু ও অধ্যাপক বিনয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় গ্রন্থপঞ্জীর (বাংলা) শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ আমাকে একখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। অধ্যাপক পরভেজ শাহিদি (অধুনা লোকান্তরিত) নূরজাহানের ফার্সী কবিতাগুলির ইংরেজী অনুবাদ করে দিয়ে

আমার জটিল কাজকে সহজ করেছেন। এঁদের সকলকেই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শিল্পী শ্রীগণেশ বসু অকাতর আয়াস স্বীকার করে এই গ্রন্থকে সুসজ্জিত করেছেন এবং প্রকাশক শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায় আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রন্থটিকে সুচারুরূপে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। এঁদের দুজনকেই আমি প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

'নূরজাহান'কে পাঠক-পাঠিকার ভালো লাগলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে॥

সুকন্যা।

উৎসর্গ

শ্রীমান শঙ্করীপ্রসাদ বসু-কে

Nurjahan

A life-story

By

Sukanya

Price : 10·00



'সখুবাবা'—বুদ্ধিমান, একগুঁয়ে
(প্রাচীন মুঘল চিত্র অবলম্বনে)



নূরজাহান নির্ভর জাহাঙ্গীর—'শুধু মদ আর মাংস, আর কিছু নয়।'

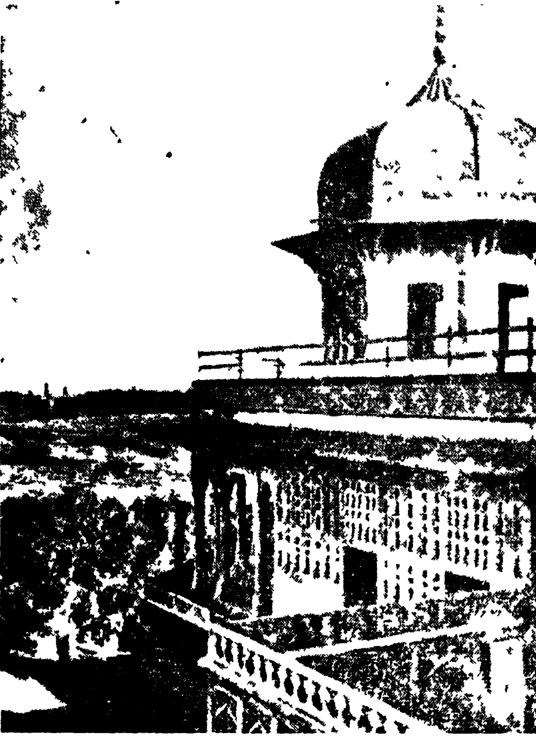




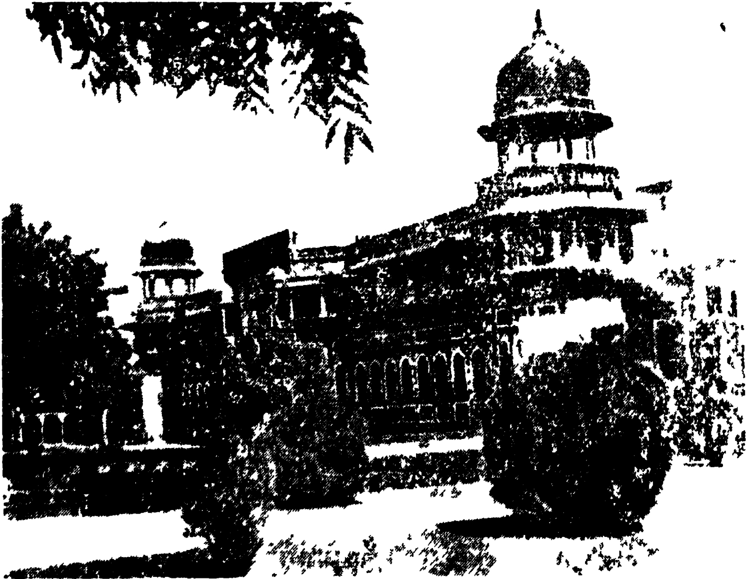
নূরজাহানের নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা,
এ সোনার দাম অনেক।



নূরজাহান—স্থিরযৌবনা উর্বশী
(জনসন সংগ্রহ, লণ্ডন, এ্যালবাম-৫৭, নং—১৭)



সামান বুরুজ বা জেস্‌মিন টাওয়াব—নূবজাহানেব বড পছন্দেব চামেলী মহল (আগ্রা ফোর্ট)



জাহাঙ্গীর মহল (আগ্রা ফোর্ট), এব প্রতি রন্ধ্রে ছিল- -শক্তি আব কামনা, নেশা আব উচ্ছলতা।



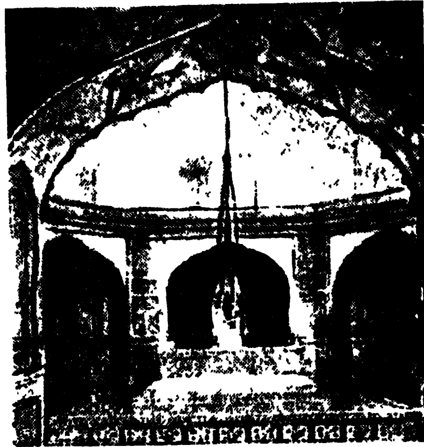
নূরজাহানের সমাধিভবন—বাহুল্য-বর্জিত, নিরাভরণ, সাধারণ।



সমাধির অভ্যন্তরে একটি নয়, পাশাপাশি ছুটি কবর,
মা আর মেয়ে, নুরজাহান ও লাডলিবেগম।



শাহ্‌দারায় জাহাঙ্গীরের সমাধি-ভবন



জাহাঙ্গীরের কবর—সেদিনটা ছিল
২৮শে অক্টোবর, ১৬২৭।

জাহাঙ্গীরের হাতের লেখা

'কোথায় থাকেন উনি ?' সাগ্রহে আকবর জিজ্ঞাসা করেন।

'এই তো মাত্র কয়েক ক্রোশের পথ—সিক্রী গাঁয়ে।'

'কি নাম তাঁর ?'

'সেখ সেলিম চিস্তি—ও গাঁয়ের তিনি জীবন।'

আকবর আর দেরি করলেন না, ছুটে গেলেন, সেলিম চিস্তির কাছে প্রার্থনা জানালেন,—মুঘল সিংহাসনের উত্তরাধিকারী চাই···

'প্রার্থনা পূরণ হবে'—সেলিম চিস্তি উত্তর দিলেন।

শ্রদ্ধায় আর আশায় আকবর মাথা নোয়ালেন।

ভগবান মুখ তুলে তাকালেন।

আকবরের রাজপুত বেগম মরিয়ম-উজ-জমানী—অম্বররাজ বিহারীমলের মেয়ে আর ভগবান দাসের বোন—তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল সিক্রীতে। সেখানে যথাসময়ে সেলিম চিস্তির কুটীরে জন্ম হল আকবরের উত্তরাধিকারী—পুত্রের শুধু জন্মই হল না—সে দিব্যি সুস্থ দেহে বেঁচে থেকে—বলতে গেলে চন্দ্রকলার মতোই—দিনে দিনে বড় হয়ে উঠল।

আকবরের মন কৃতজ্ঞতার ভরে গেল।

সেলিম চিস্তির নাম স্মরণ করে আকবর তার এমন 'দোর-ধরা' ছেলের (child of many prayers) নাম রাখলেন সেলিম—মুহম্মদ সুলতান সেলিম। আকবর আদর করে ডাকতেন 'সেখুবাবা'।

বড় আদরের ছেলে সেখুবাবা। অবশ্য তারপরে খুব কম সময়ের ব্যবধান আকবরের আরও দুটি ছেলে হয়েছিল। তাঁদের নাম মুরাদ আর দানিয়েল।

তবু বড় ছেলে বলে কথা—যুবরাজ। অমন বাপ আকবরের পর যিনি সিংহাসনে বসবেন, সাম্রাজ্যের হাল ধরবেন, তাঁকে মানুষ করা কি চাট্টিখানি কথা।

আকবর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ছেলেকে 'মানুষ' করার জন্য।

প্রথম—লেখাপড়া।

তারপর তারই সঙ্গে হিন্দুস্থান শাসন করার জন্য ভালয়-মন্দয় মেশানো রাজনীতির গূঢ়তত্ত্ব মুখস্থ করা। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যা, শরীরচর্চা, বিভিন্ন অস্ত্রচালনায় বিশেষ দক্ষতা—এ সব কিছু মিলিয়ে তবে তো রাজা! 'Every inch a king.'

স্নেহে যত্নে আর সতর্কতায় সেলিম বড় হতে লাগলেন। বেশী আদরে অবিশ্যি ছোটবেলা থেকেই 'সেখুবাবা' কেমন যেন একটু খামখেয়ালী গোছের হয়ে উঠলেন। তবে ও কিছু নয়, বড় হলে জ্ঞানগম্যি বাড়বে, ছেলে ধীরস্থির হবে।

ঠিক চার বছর, চার মাস চারদিনের দিন সেলিমের 'হাতেখড়ি' হল—লেখাপড়া শুরু হল। সে যুগের তামাম হিন্দুস্থানের নামী শিক্ষকদের ফতেপুর সিক্রীতে ডেকে পাঠানো হল। আকবর ভাল করে দেখে শুনে সেলিমের শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। প্রথম শিক্ষক ছিলেন জ্ঞানবৃদ্ধ মৌলানা মীর কলান হার্ভি। তারপর এলেন সেখ আমেদ।

আকবরের পূর্বপুরুষ তৈমুরলঙের বিদ্যাবুদ্ধি আর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন ঐতিহাসিক গিবন সাহেব। ইতিহাসে খ্যাত তাঁর বংশধরদের মধ্যেও ছিল সেই ক্ষুরধার বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য আর মেধা।

আকবর নাকি ছিলেন নিরক্ষর। কিন্তু সে শুধু থিওরিতে, প্র্যাকটিক্যাল লাইফে তাঁর মতো মেধা জ্ঞানানুসন্ধিৎসা খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়। না হলে ফতেপুর সিক্রীর ইবাদতখানা বা ধর্মালোচনাগৃহ তৈরি হতো না।

শিক্ষকদের কাছে সেলিম শিখলেন ফারসী, তুর্কী, আরবী ও হিন্দী সাহিত্য। তার সঙ্গে গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা। সঙ্গীত ও শিল্পকলা, বিশেষ করে চিত্রবিদ্যার ওপর

সেলিমের একটা সহজাত আকর্ষণ তো ছিলই। অন্যদিকে অস্ত্রবিদ্যাতেই বা তাঁকে ঠেকায় কে!

আকবরের মন ভরে উঠল সেলিমের এই বহুমুখী শিক্ষাপ্রতিভায়—রাজার ছেলে বটে। তবে সেলিমের শিক্ষাজীবনের ওপর শিক্ষকদের মধ্যে যিনি সবচাইতে বেশি ছায়াপাত করেছিলেন, তাঁর নাম আবদুর রহিম খান্‌খানা—কূটরাজনীতিজ্ঞ অথচ সর্ববিদ্যাবিশারদ এক মহৎ পণ্ডিত। তাঁরই শিক্ষায় সেলিম সাহিত্যে রসের সন্ধান পেয়েছিলেন—ফলে ফারসীতে কবিতা রচনা করতেন, হিন্দুস্থানী গান শুনে বিভোর হয়ে থাকতেন।

একদিকে কবিতার ছন্দ, সুরের ঝঙ্কার, অন্যদিকে গভীর বনে গিয়ে নিপুণ লক্ষ্যে শিকার। শিকারের নেশায় মাঝে মাঝে সেলিম মত্ত হয়ে উঠতেন—

এই সব কিছু মিলিয়ে সেলিমের চরিত্র।

জীবনে কত বড় বড় যুদ্ধে জয়লাভ করতে হবে—আকবর তাই হাতেকলমে শিক্ষা দেবার জন্য সেলিমকে একটা গোটা রেজিমেণ্টের সেনাপতি করে পাঠালেন কাবুল অভিযানে। কারণ যুদ্ধের ব্যাপারে স্বাধীন চিন্তা আর তৎপরতা পরীক্ষার উপযুক্ত স্থান তো যুদ্ধক্ষেত্র!

১৫৭৭ খ্রীস্টাব্দে সেলিম হলেন দশহাজার সৈন্যের সেনাপতি। ১৫৮৫ খ্রীস্টাব্দে বারো হাজার সৈন্যের। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব বাড়বে—এতে আর আশ্চর্য কি!

ভারতবর্ষের এই ইতিহাসের ফাঁকে কিন্তু আর একটি গল্প শুরু হয়েছিল পারস্যে, তেহ্‌রানে। পারস্যের সিংহাসনে তখন ছিলেন শাহ্ তমাস্প। তাঁর অধীনে এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন মির্জা গিয়াস উদ্দিন মুহম্মদ বেগ, সংক্ষেপে গিয়াস বেগ।

গিয়াস বেগের বাবা খাজা মুহম্মদ শরীফ-ও ছিলেন তেহ্‌রানের একজন নামকরা লোক—যেমন প্রতিপত্তি, তেমনি ঐশ্বর্য।

সবার ওপর ছিল বাপ-ছেলের পাণ্ডিত্য, তাঁদের গভীর জ্ঞান।

শাহ্ তমাস্পের দরবারে গুণীর কদর ছিল সকলের আগে। বাপ-ছেলের এই প্রতিপত্তি, পাণ্ডিত্য আর লক্ষ্মীমন্ত ভাগ্য দেখে অনেকেরই সেদিন মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ যেন কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল।

বাপ মারা গেলেন—আর তার সঙ্গে সঙ্গে অত ক্ষমতা, অত যে টাকা, সব যেন শয়তানে শুষে নিল। সুদিনে যারা বন্ধু ছিল, তারা ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়াল। গিয়াসের বিরুদ্ধে তারা চক্রান্ত করতে লাগল।

গিয়াস কেবল ভাবতে লাগলেন, নসিবের তখ্‌ত্‌কে আবার কি করে ফিরিয়ে আনা যায়!

দারিদ্র্য আর দুর্ভাগ্য তখন নিদারুণভাবে ঘিরে ধরল গিয়াসের পরিবারকে। অভাবের বিভীষিকা গিয়াসকে যখন প্রায় হতচেতন করে ফেলল—ঠিক সেই সময়ে গিয়াসের মনে আলোর রেখার মতো খেলে গেল একটি দেশের নাম।

সে দেশের নাম হিন্দুস্থান। লোকে বলে, সোনার দেশ—দুধ আর মধুর দেশ। কত ইরানী-তুরানী ও দেশে গিয়ে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ পেয়েছে—রাতারাতি ভাগ্য ফিরিয়েছে, তার ঠিক নেই। ধুলোমুঠি নাকি সেখানে সোনামুঠি হয়।

গিয়াস লাফিয়ে উঠলেন। এই তো তিনি পথ খুঁজে পেয়েছেন।

এই পথ চলে গেছে পূব দিকে—সোনার হিন্দুস্থানে।

নসিব ঠুকে গিয়াস যাত্রা করলেন। সঙ্গে স্ত্রী, দুই ছেলে, এক মেয়ে। মাল বইবার জন্য কয়েকটি খচ্চর। স্ত্রীকেও একটি খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে দেওয়া হল—স্ত্রী আসন্নপ্রসবা। স্বাভাবিক দুর্বলতায় তিনি রুগ্না।

প্রথম কয়েকদিনের যাত্রা ছিল বিপদ-বাধাহীন। তার পরেই গিয়াসের ভাগ্যদেবী আবার মুখ বাঁকালেন। নির্জন পথে রে-রে শব্দে একদল দস্যু এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল গিয়াসের পরিবারটির ওপর।

কুড়িয়ে পুঁছিয়ে যা কিছু নিয়ে আসা হয়েছিল. স্বদেশভূমি থেকে—একেবারে নিঃশেষ করে লুটে নিল দস্যুর দল। শুধু রক্ষা—প্রাণে কাউকে মারে নি, উপরন্তু একটি বেতো বুড়ো খচ্চরও তারা রেখে গেল।

গিয়াস কিন্তু ভেঙে পড়লেন না, ঐ বুড়ো খচ্চরটার ওপর স্ত্রীকে বসিয়ে তিনি আবার পুব দিকে যাত্রা করলেন···।

এইবার এল কান্দাহার—কান্দাহারের তপ্ত মরুভূমি।

স্ত্রী হঠাৎ সৃষ্টির ব্যথায় কাতর হয়ে পড়লেন।

চেতনা প্রায় আচ্ছন্ন করে জন্ম হল একটি মেয়ের—জন্ম হল একটি ইতিহাসের।

সে বছরটা ছিল ১৫৭৭ সাল—৯৮৪ আঃ হিজারত।

পৃথিবীর প্রথম স্পর্শে মেয়েটি কেঁদে উঠে জীবনকে অভিবাদন জানালো। তার মা, তার বাবা ঝুঁকে দেখতে লাগলেন তাঁদের নবজাত সন্তানটিকে—পূর্ণ চাঁদের লাবণ্য আর জ্যোৎস্নার মায়া মাখানো একবিন্দু সুষমা। দুনিয়ার মাটিতে এমন চোখ-ধাঁধানো রূপসী মেয়ের জন্ম হয় না।

এ মেয়ে আশমানের সূর্য।

বাপ-মা মেয়ের নাম রাখলেন মেহেরউন্নিসা—আমাদের ভাষায় নারীশ্রেষ্ঠা সবিতা।

কত গল্প-উপকথাই না গড়ে উঠেছে মেহেরউন্নিসার জন্ম নিয়ে। রবার্ট কাউন্টার এই ব্যাপারে বেশ খানিকটা অস্বাভাবিক বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নবজাত শিশুটিকে নিয়ে পথ চলতে গিয়ে গিয়াস-পত্নী এত কাতর হয়ে পড়লেন যে, তাঁরা আর এগোতে পারলেন না, ঠিক হল শিশুটিকে পথেই রেখে যাবেন—ভাগ্য তাকে নিয়ে যা হয় করবে। নইলে, খাবার নেই, জল নেই—তাঁরাই বা কি করবেন।

গিয়াস-পত্নী শেষবারের মতো মেয়েটিকে আদর করলেন, বুকে

চেপে ধরলেন—তার ডালিমের মতো গালে মায়ের চোখের জল ঝরে পড়ল।

কান্না চেপে বাপ সন্তানকে কোলে নিয়ে এগিয়ে গেলেন একটা গাছের দিকে, তলায় পাতা ঝরে পড়েছিল, তারই ওপর শুইয়ে দিলেন মেয়েকে। সদ্য ফোটা লিলিফুলের মতো শুভ্র সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে বাপের চোখে জল এল। সেদিকে আর না দেখে গিয়াস ফিরে গেলেন মুমূর্ষু স্ত্রীর কাছে।

আবার যাত্রা শুরু হল।

দুজনে কয়েক পা মাত্র পথ চলেছিলেন—মা আর্তনাদ করে উঠলেন, সন্তানকে ফিরিয়ে আনা হোক, নিজের হাতে তৈরি করা এ সন্তান-বিচ্ছেদ তিনি সইতে পারবেন না।

বাপের মনও আকুল হয়ে উঠল, তিনি ফিরে গেলেন সন্তানকে যেখানে শুইয়ে রেখে আসা হয়েছিল—সেখানে।

শিশুটির কাছে গিয়ে গিয়াস চমকে পিছিয়ে এলেন, শরীর মন আড়ষ্ট হয়ে উঠল—একটা বিষধর কালো সাপ শিশুটির চারদিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে, চক্রায়িত ফণা শিশুটির মুখের ওপর ধীরে ধীরে দুলছে। কিন্তু আশ্চর্য, গিয়াস কিছু করবার আগেই সাপ তার ফণা গুটিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল, শিশুটির গায়ে সাপের নিশ্বাসটুকু পর্যন্ত লাগল না।

সন্তানকে বুকে নিয়ে গিয়াস যখন ফিরে এলেন, তখন স্ত্রীর মুখে মৃত্যুর কালোছায়া নেমে এসেছে। সন্তানকে ফিরে পাবার আনন্দে মুখে একটু পাণ্ডুর হাসি ফুটে উঠল। প্রায় নিশ্চল-হয়ে-আসা হাত দিয়ে মা তাঁর সন্তানকে আদর করলেন, তারপর গিয়াসের দিকে তাকিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'এখানেই আমাকে কবর দিও গিয়াস, আমাদের হতভাগ্য সন্তানকে পথে ফেলে রেখে পশুর মুখের গ্রাস হতে দিও না···স্বর্গে আবার আমাদের দেখা হবে···'

গিয়াস-পত্নীর মৃত্যু হল।

এর পর গিয়াসের অবস্থা আরও অবর্ণনীয় করে এঁকেছেন কাউন্টার সাহেব।

খাবার নেই, পানীয় নেই, ক্ষিদেয় তেষ্টায় শিশুটি কেঁদে কেঁদে উঠতে লাগল। গিয়াস শিশুটির ঘামে-ভিজে-ওঠা জামাটির এক প্রান্ত ওর মুখে গুঁজে দিলেন।

শিশুটি খানিকটা শান্ত হয়ে তাই চুক চুক করে চুষতে লাগল।

আর গিয়াস?

কতক্ষণ যে তাঁর পেটে একফোঁটা জল একদানা খাবার পড়ে নি! তার ওপর সূর্যের তাপে ভেতরটা শুকিয়ে একেবারে খা-খা করছিল। মুখের মধ্যে জিভটা এত বেশী ফুলে গিয়েছিল যে, দুটো ঠোঁট পর্যন্ত এক করা যাচ্ছিল না।

গিয়াস সন্তানটিকে জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। তিল তিল করে মৃত্যু এগিয়ে আসতে লাগল। হঠাৎ জিভ ফেটে গিয়ে রক্তের ধারা বইল, ঠোঁট বেয়ে খানিকটা বাইরে গড়িয়ে এল, খানিকটা চলে গেল শুকনো গলার মধ্যে—জ্বলে-ওঠা পাকস্থলী রক্তধারায় কিছুটা স্নিগ্ধ হল—নিজের রক্ত পান করে অর্ধমৃত গিয়াস একটু সুস্থ হলেন। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুম ভাঙল গভীর রাতে, তারাভরা কালো আকাশের নিচে।

কাছেই পড়ে আছে স্ত্রীর মৃতদেহ, এখনও কবর দেওয়া হয় নি। গিয়াস নিজেকে টেনে তুললেন, বালি খুঁড়ে স্ত্রীর কোমল দেহটিকে শুইয়ে দিলেন, বালি দিয়ে ঢেকে দিলেন। চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে এল, শরীরটি আবার লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

কতক্ষণ ঐ চেতনাহীন ঘুমে গিয়াস আচ্ছন্ন ছিলেন কে জানে।

শরীরে হঠাৎ সজোরে নাড়া খেয়ে গিয়াস চোখ মেললেন। অবাক বিস্ময়ে দেখলেন তাঁর চারপাশে কয়েকটি অচেনা লোক দাঁড়িয়ে আছে, একজনের মুখ ঝুঁকে এসেছে তাঁর মুখের ওপরে—চোখের দৃষ্টিতে ব্যাকুল উৎকণ্ঠা।

গিয়াসকে চোখ মেলতে দেখে তিনি আশ্বস্ত হলেন, সবকিছু জিজ্ঞেস করলেন।

নিজের পরিচয় দিলেন।

নাম—মালিক মাস্থদ।

বৃত্তি—সওদাগরী।

গন্তব্যস্থান—লাহোর, হিন্দুস্থান।

হিন্দুস্থান! গিয়াসের মন লাফিয়ে উঠল। ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'আপনি হিন্দুস্থান যাবেন?'

'আপনি গেলেও সুখী হব!'—গিয়াসের আগ্রহে-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে মাস্থদ মৃদু হেসে উত্তর দিলেন।

'পথ চলার আগে সুস্থ হতে হবে···' মাস্থদ মৃতপ্রায় গিয়াসকে খাদ্য দিলেন, পানীয় দিলেন—প্রাণ দিলেন।

শিশুটিকে অতি যত্নে আর স্নেহে বিন্দু বিন্দু করে ছাগলের দুধ খাওয়ালেন, শিশুটিও বেঁচে উঠল। বেঁচে উঠল এই ইতিহাসের নায়িকা।

কাউণ্টার সাহেব অবিশ্যি গল্পের ধাঁচটা একটু বেশী এনে ফেলেছেন। তবে এটা ঠিক কথা, অন্ততঃ আইন-ই-আকবরীর মতে, সত্যিই গিয়াস ভাগ্যবিপর্যয়ে তাঁর দুই ছেলে আর এক মেয়ে এবং গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে তেহ্‌রান থেকে কান্দাহারের পথে ভারতবর্ষের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন।

কান্দাহারে মেহেরউন্নিসার জন্ম হল, দস্যুর অত্যাচারে আর দুর্দশায় যখন তিনি অসহায় হয়ে পড়েছিলেন তখন সওদাগর মালিক মাস্থদ-ই তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।

একই কাহিনী একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন কাফি খাঁ।

তিনি বলেছেন, নবজাত কন্যাকে পিতামাতা অভাবের তাড়নায় যে পথে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন, সেই পথেই আসছিলেন মালিক মাস্থদ।

ঐটুকুন শিশুর ভুবনমোহন রূপ দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। পরম মমতায় তিনি শিশুটিকে বুকে তুলে নিলেন, কিছুদূর গিয়েই দেখা পেলেন গিয়াস-পরিবারের।

গিয়াস-পত্নীকে তিনি শিশুটির ধাত্রী নিযুক্ত করলেন। তারপর তাঁরা এলেন হিন্দুস্থানে।

এল্‌ফিনস্টোন সাহেবের লেখাতেও ঐ একই গল্পের প্রতিধ্বনি।

মালিক মাসুদ গিয়াসবেগের দিকে তাকিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেই বুঝতে পেরেছিলেন, আপাতক্লিষ্ট এই পথিক প্রতিভাধর।

হিন্দুস্থানের পাকা জহুরী সম্রাট আকবর। তাঁর কাছে এ জহরকে নিয়ে যেতে হবে, এঁর যথার্থ মূল্য তিনিই দিতে পারবেন।

প্রথমে লাহোর, লাহোর থেকে আগ্রা। আগ্রায় এসে মাসুদ শুনলেন সম্রাট সেখানে নেই, সিক্রীতে বাস করছেন।

রাজ্যজয়ী আকবর সিক্রীর নাম দিয়েছিলেন ফতেপুর-সিক্রী।

পাহাড় জঙ্গলে ঢাকা একটা নগণ্য গ্রাম ছিল এই সিক্রী। তাকে আকবর এমনভাবে কৃত্রিম হ্রদ, প্রাচীর, মস্ত বড় বড় তোরণ, মসজিদ ও নানা ধাঁচের মহল দিয়ে সাজিয়েছিলেন যে, দেখে চমকে যেতে হয়। মনে হয় ময়দানবের নিজের হাতে তৈরি সব। সাজাবেন না! কত পয়মন্ত এই সিক্রী!

এখানেই তো জন্ম হয়েছিল তাঁর কত সাধের সেখুবাবার।

কত দামী লাল পাথরের তৈরি ফতেপুর সিক্রীর প্রাসাদ—বলিষ্ঠ সম্রাটের বলিষ্ঠ ভাস্কর্য! প্রচুর আলো আর খোলা হাওয়া নেচে-ঘুরে বেড়াত প্রাসাদের প্রতি আনাচে-কানাচে। এই প্রাচুর্যে-ভরা মন ও আলোর দৃষ্টি নিয়েই তো আকবর সাগ্রহ আমন্ত্রণ জানাতেন

দেশবিদেশের গুণিজনকে। যে-কোনো পণ্ডিতের মতোই এঁদের সঙ্গে আকবর আলোচনা তর্ক চালিয়ে যেতেন বহুক্ষণ ধরে।

আকবরের দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ, মন ছিল উদার। মালিক মাসুদের কাছে আকবরের মনের এই পরিচয়টি অজানা ছিল না। তাই তিনি গিয়াস বেগ আর তাঁর ছেলে আবুল হাসানকে নিয়ে ফতেপুর সিক্রীতে উপস্থিত হলেন।

মালিক মাসুদ সম্রাট আকবরের সামনে গিয়ে তাঁকে যথারীতি অভিবাদন জানিয়ে বললেন—'শাহান শাহ্, এবছর আপনার জন্য দুটি সজীব রত্ন উপহার এনেছি। বাদশাহ্ যদি কৃপা করে এঁদের আশ্রয় দেন, তাহলে দেখবেন ইরান-তুরান থেকে এ রত্ন আজ পর্যন্ত হিন্দুস্থানে আসে নি…'

'বটে!' আকবর আগ্রহ প্রকাশ করলেন "সজীব রত্ন" দেখার

মালিক মাসুদ ফিরে গিয়ে বাইরে অপেক্ষমান গিয়াস আর তাঁর ছেলেকে নিয়ে এলেন।

আকবর উজ্জ্বল চোখ দুটি উজ্জ্বলতর করে গিয়াস বেগকে দেখলেন, আবুল হাসানকে দেখলেন।

তিনি লোক চেনেন, তাই ভবিষ্যৎ ইতিমদ-উদ-দৌলা ও আসফ খাঁকে তিনি একবার দেখেই চিনতে পেরেছিলেন।

তেহ্রানের ভাগ্যতাড়িত গিয়াস হিন্দুস্থানে এসে ভাগ্যবান হলেন। আকবরের সমাদরে তিনি স্বর্গের সিঁড়ি খুঁজে পেলেন। প্রথমে তিন শ সৈন্যের সেনাপতি, তারপরে কাবুলের দেওয়ান, কিছু দিনের মধ্যে একহাজারী মন্সবদার, তারপর আরও উঁচুতে। আর আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে?

সে কাহিনী পরে…

গিয়াস বেগ ছিলেন একদিকে আকাশ-ছোঁয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অন্য-দিকে কবি-সাহিত্যিক। ব্যবহারে ছিলেন সদাশয়, বিনয়ী। ব্যক্তিগত

জীবনে ছিলেন কর্মঠ। অন্যের বিপদে ছিলেন বন্ধুর মতো সাহায্যকারী। তাঁকে নাকি জীবনে রাগ করতে দেখা যায় নি। তাই তাঁর বাড়িতে অন্যকে শায়েস্তা করার জন্য আমির-ওমরাহ্‌দের নিত্যব্যবহার্য চাবুক বা শৃঙ্খল দেখা যেত না।

শুধু একটি ত্রুটি—গিয়াস বেগ উঁচু আসনে বসেও কথায় কথায় বাঁ হাত পাততেন,—জীবনে এ লোভ ছাড়তে পারেন নি, সমানে ঘুষ নিয়েছেন, এবং অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে নিয়েছেন।

তবে যত বড় উচ্চপদস্থ হোন না কেন, গিয়াস বেগ ইতিহাসের পাতায় এখানেই থেমে যেতেন, যদি না কান্দাহারে মরুভূমির বুকে তাঁর সবিতা-কন্যার জন্ম হত।

কয়েকটি বছর কেটে গেল।

গিয়াস বেগ দুঃখের দিনে যে সন্তানটিকে পেয়েছিলেন সে এর মধ্যে বেশ বড় হয়ে উঠেছে। বাপ আর মা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন মেয়ের দিকে। পদ্মের মৃণালের মতো নমনীয়, অথচ দৃপ্ত, বাল্যের সৌকুমার্যের সঙ্গে লাবণ্যভরা ব্যক্তিত্ব। প্রতিটি কথায়, হাসির ঝিলিকে, চলাফেরায় কি যেন এক বিশেষত্ব।

মা আসমৎ বেগমের মনে কত কী আশার আল্পনা এঁকে যায়। তেহ্‌রানের ভাগ্যবিপর্যয়কে হিন্দুস্থানের পরম সৌভাগ্যের ভেতর দিয়েই তো ভুলতে হবে!

মেহেরউন্নিসা বড় হোন, রূপের ঢল নেমে আসুক তাঁর প্রতি অঙ্গে, বুদ্ধি আর চাতুর্য ঝলকে উঠুক তাঁর সমুদ্রের মতো গভীর, আকাশের মতো নীল দুটি পদ্মচোখে। ক্ষিতিব্যোম ভেদ করে তূর্যনিনাদে জেগে উঠুক তাঁর মনের অপার আকাঙ্ক্ষা।

মেহেরউন্নিসা বড় হোন—তারপর···।

১৫৮৫ খ্রীস্টাব্দে—কিশোর সেলিমের সঙ্গে বিয়ে হল অম্বর-রাজ

ভগবানদাসের মেয়ে মানবাইয়ের। আপন মামাতো বোন। মুঘল প্রাসাদে এসে মানবাইয়ের নামকরণ হয়েছিল শাহ্‌বেগম। শাহ্-বেগম স্বামীর স্নেহ শ্রদ্ধা দুই-ই পেয়েছিলেন।

শাহ্‌বেগমের গর্ভে সেলিম তাঁর প্রথম পুত্রের মুখ দেখলেন—আকবর দেখলেন তাঁর সেখুবাবার উত্তরাধিকারীকে—নাম হল খসরু। ইতিহাসের পাতায় যে ক'টি লাঞ্ছিত হতভাগ্য মহৎ জীবন দেখা যায়, খসরু তার মধ্যে একজন।

সেলিমের দ্বিতীয় ছেলের নাম পরভেজ, তাঁর মা ছিলেন সাহেব-ই-জামাল, খাজা হাসানের মেয়ে।

তৃতীয় ছেলের নাম খুরম, তাঁর মায়ের নাম জগৎগোঁসাই বা যোধাবাই। বাপ ছিলেন 'মোটারাজা' উদয়সিংহ। এই খুরমই পরে হয়েছিলেন শাহ্‌জাহান।

আর যে দুই ছেলে—জাহন্দর ও শাহ্‌রিয়র—।

এই দুজনের মায়ের উল্লেখ আইন-ই-আকবরীতে পাওয়া যায় না। শাহ্‌রিয়রের নাম এর পর অনেকবারই উল্লেখ করতে হবে,—মুঘল ইতিহাসে যে কজন অকর্মণ্য রাজপুত্রের নাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে শাহ্‌রিয়র একজন।

সেলিমের বেগমের সংখ্যা ছিল রাজোচিত, হারেমে মেয়েদের সংখ্যা উঠেছিল হাজারের কাছাকাছি।

সব কিছুতেই মোগলাই মহিমা।

সেলিম সুরার নেশায় পোক্ত হয়েছিলেন বেশ অল্প বয়স থেকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুরাপাত্র হাতে মানুষের ইহজীবনের যা কিছু কামনা আর উচ্ছলতা, তাতে মত্ত হয়ে থাকতেন। যেদিকে তাকাতেন দেখতেন পৃথিবী কত রঙিন!

রঙের নেশায় পুত্রকে মেতে উঠতে দেখে আকবরের মুখ কালো হয়ে গেল—মন বিষণ্ন হয়ে উঠল।

এই তাঁর উত্তরাধিকারী!

এত হিম্মৎ দিয়ে তৈরি করা তাঁর বিশাল হিন্দুস্থান-সাম্রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর!

আদরটা অবিশ্যি একটু বেশীই দিয়েছিলেন—কিন্তু অন্য দিকে সত্যিকারের মানুষ করে গড়ে তোলার দায়িত্বকেও তো তিনি কখনও অস্বীকার করেন নি! আর সেখুবাবার তো লেখাপড়া, যুদ্ধবিদ্যা, অস্ত্রচালনা—এদিক থেকে কোনো ত্রুটি নেই। দিব্বি বুদ্ধিমান ছেলে—যথেষ্ট যোগ্যতা আছে।

তবু কেমন যেন।

ছেলেবেলায় যে খামখেয়ালিপনা মনে হত নিছক ছেলেমানুষী, বড় হবার পর সেটা যে এমন বিষিয়ে উঠবে তা কে জানত!

আকবর চিন্তিত হয়ে উঠলেন। অনুজপ্রতিম অভিন্নহৃদয় মন্ত্রী-বন্ধু আবুল ফজলের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন।

সেলিমের খামখেয়ালিপনায় এবার আগুন লাগল। সেলিম দুচক্ষে দেখতে পারতেন না আবুল ফজলকে। সেলিমের দোষ-ত্রুটির ওপর লোকটির সজাগ-রুক্ষ দৃষ্টি গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিত···।

সেখ মুবারক আর তাঁর দুই ছেলে ফৈজী ও আবুল ফজল। সাহিত্য, কবিত্ব আর দার্শনিকতা—এই তিনের যোগফলে এঁদের পাণ্ডিত্য।

আকবর এদের তিনজনকে চোখে হারাতেন। আকবরের অনুসন্ধিৎসু মনের কত কৌতূহলই না এদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় পরিতৃপ্ত হয়েছে। বিশেষ করে ধর্মের মধ্যে মহাসত্য কী—এই নিয়ে যখন আকবরের মনে ঝড় উঠেছিল, তখন এঁদের সঙ্গে গভীর আলোচনায় তাঁর মন শান্ত হয়েছে, খুশি হয়েছে!

সে যুগের পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে সবচাইতে সচেতন ও সজাগ ছিলেন সম্রাট আকবর। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, হিন্দুস্থান শাসন করতে হলে ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতিকে পৃথক করে রাখলে চলবে না। সুতরাং রাজনৈতিক শক্তি-প্রতিষ্ঠার পিছনে ধর্মনৈতিক সমন্বয় একান্ত

প্রয়োজন। ধর্মীয় অনুসন্ধিৎসা আর রাজনৈতিক বাস্তববোধ—এই দুইয়ের তাগিদে আকবর ঘোষণা করেছিলেন—ঈশ্বর এক, তাঁর প্রতিনিধি স্বয়ং সম্রাট।

উলেমার নির্দিষ্ট ধর্মনীতিতে এই বিপ্লব ঘটানোর ব্যাপারে আবুল ফজলের অনেকখানি হাত ছিল। সেলিম নাকি এই জন্যই আবুল ফজলের ওপর চটেছিলেন।

আসলে আবুল ফজলও সেলিমকে খুব পছন্দ করতেন না। তাঁর চারিত্রিক শিথিলতা, পানে আসক্তি এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সব সময়ে অবহিত না থাকা—আবুল ফজলের তীব্র সমালোচনার বিষয় ছিল।

সেলিম সহ্য করেন নি—করেন নি বলেই যা করেছিলেন সেও এক জঘন্য ইতিহাস···।

সেলিম বড় হলেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেবে নিলেন তাঁর সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত সময় এসে গেছে—বাপ দুচোখ বুজুন আর না বুজুন।

কোনো কোনো কাহিনীকারের মতে আকবর ধর্মবিষয়ে পরিবর্তিত নীতি অবলম্বন করেছিলেন বলেই নাকি সেলিম বাবার ওপর অত চটে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেলিম ও পরে সম্রাট জাহাঙ্গীরের যে পরিচয় আমরা পাই, তাতে ধর্ম সম্বন্ধে সেলিমের গভীর অনুসন্ধিৎসা বা চিন্তা করা দূরে থাক, তাঁর কোনো মাথাব্যথাই ছিল না। যখন যুবরাজ ছিলেন তখন তো কিছু ভাবতেনই না, যখন সম্রাট হলেন, তখন খেয়াল তাঁকে যেদিকে চালিয়েছে, তিনি সেদিকে চলেছেন।

পিতার মতো সেলিম জেসুইট পাদ্রীদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়েছেন, তাঁদের প্রতি যথেষ্ট আনুকূল্যও দেখিয়েছেন। কিন্তু যীশু খ্রীস্টের সবকিছু মহিমাকে তিনি স্বীকার করেন নি।

আবার অন্যদিকে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধেও কোনো অন্ধ গোঁড়ামি তাঁর মধ্যে ছিল না।

আসলে আকবর শাহ্‌ জৈন-পারসী-খ্রীস্টান-হিন্দু পণ্ডিতদের সাদর আহ্বান জানিয়ে তাঁদের সঙ্গে ধর্মালোচনা চালিয়ে সে-যুগে যে অচিন্তনীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিলেন—সে আবহাওয়ায় মানুষ সেলিম স্বভাবতই উদার পটভূমিকায় বড় হয়ে উঠেছিলেন। তবে আকবরের মধ্যে যে চিন্তার গভীরতা ছিল, সেলিমের মধ্যে ততটা দেখা যায় নি। সুতরাং ধর্ম সম্বন্ধে উদার বা অনুদার কোনো নির্দিষ্ট মত তিনি বেছে নেন নি। তাই সম্রাট হিসেবে কখনও দেখি, তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ইসলাম ধর্মের জয়ঘোষণা করেছেন, মুসলমান মেয়েদের বিয়ে করে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য রাজৌরির হিন্দুদের শাস্তি দিচ্ছেন, মেবার ও কাঙড়া রাজ্যের হিন্দুমন্দির ভূমিসাৎ করার আদেশ দিচ্ছেন (অবশ্য যুদ্ধের সময়), আজমীরের বরাহদেবের মন্দির ধ্বংস করে মূর্তি পুকুরের জলে ডুবিয়ে দিচ্ছেন, পর্তুগীজদের গির্জে বন্ধ করছেন (এ-ও পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়)। আবার কখনও তিনি হিন্দুদের মন্দির নির্মাণে অনুমতি দিচ্ছেন, বিনা তীর্থকরে হিন্দুরা তীর্থস্থান দর্শন করছেন, জেস্যুইট পাদ্রীরা সরকারী বৃত্তি পাচ্ছেন, সম্রাট হিন্দুদের বসন্ত, রাখীবন্ধন এবং দসেরা উৎসবে যোগ দিচ্ছেন—এমন কি শিবরাত্রি উৎসবে রাত্রিবেলা তিনি নামী-গুণী যোগীপুরুষদের দর্শন করতেও যাচ্ছেন।

খ্রীস্টানদের খ্রীস্টমাস, ইস্টার ও অন্যান্য উৎসব পালনে জাহাঙ্গীরের কখনও কোনো অসমর্থন ছিল না। অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে কেউ যদি ইসলাম মতবাদ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য বা কোনো পরিবর্তন দেখাতেন তাহলে তাঁদের শাস্তিদানে জাহাঙ্গীর দেরি করতেন না।

সমসাময়িক ইংরেজ দূত স্যার টমাস রো-এর কথাই ঠিক—"He is content with all religion; only he loves none that changeth···"

আদরের আতিশয্যে সেলিম অপরিণত বুদ্ধি নিয়ে বড় হয়ে উঠলেন, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মদের মাত্রাও বাড়ল। শোনা যায় সেলিমের বয়স যখন তিরিশ পেরোয় নি তখনই নাকি তিনি চব্বিশ ঘণ্টায় কুড়ি পেগ করে ছু'-ছু'বার চোলাইকরা খাঁটি মদ গলায় ঢালতেন। দিনে চৌদ্দ পেগ, রাত্রিবেলায় ছ পেগ, হিন্দুস্থানের মাপে যার নাকি পরিমাণ ছিল ছ' সের!

শেষ পর্যন্ত রাজচিকিৎসক হাকিম হামাম একেবারে বলে বসলেন, শাহ্জাদা যদি মদের পরিমাণ না কমান, তা হলে ছ'মাসের মধ্যে তাঁকে কবরের আওতায় গিয়ে পড়তে হবে।

সেলিম একটু থমকে গেলেন।

মদের মাত্রা তো একটু কমালেনই, উপরন্তু খাঁটি মদের সঙ্গে আঙুরের রস মিশিয়ে মদের বিষটাকে বেশ কিছুটা নরম করবারও ব্যবস্থা হ'ল।

কিন্তু তবু···

নির্ভেজাল মোহিনী মদিরাকে যেন ভোলা যায় না। আঙুরের রস মেশানো মদে কেমন যেন শানায় না। অতএব 'খাঁটি' জিনিসের অভাব মেটানোর জন্য এল আফিম।

আফিম দেখতে বিদঘুটে কালো, কিন্তু একবার গিলে ফেললেই জগৎ আলো, আলোময় সব কিছু, আর সেই আলোয় পা ফেলে এগিয়ে এলেন অপরূপা মেয়ে মেহেরউন্নিসা।

গিয়াস-পত্নী আসমৎ বেগম ছিলেন চতুরা, বুদ্ধিমতী—রূপসীও বটে। তিনি মাঝে মাঝেই মুঘল হারেমে বেড়াতে যেতেন, সঙ্গে থাকতেন মেহেরউন্নিসা।

মেহেরউন্নিসা যে পথ দিয়ে যেতেন, সে পথে পদ্মফুল ফুটত কিনা জানি না, তবে মেহেরউন্নিসার বর্ণনাতীত দৈহিক ঐশ্বর্যে অনেকের মনেই বিস্ময়ের দোলা লাগত।

মায়ের হাত ধরে তিনি মুঘল হারেমে যেতেন, আর এই আসা

যাওয়ার মাঝে হঠাৎ একদিন মেহেরউন্নিসা থমকে দাঁড়ালেন, চোখ তুলে তাকালেন—

কে সামনে দাঁড়িয়ে ?

সেলিম ?

যুবরাজ ?

তামাম হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ-সম্রাট ? বয়সে নবীন, রূপবান, বলিষ্ঠ, বড় সুন্দর দুটি চোখে গোলাপী নেশা।

মেহেরউন্নিসার পদ্ম-আঁখি দুটি টলটল করে উঠল—

সেলিমের গোলাপী চোখেও জ্বলে উঠল বিজলীর রোশনাই।

সত্যিই কি তাই ?

পরে দেখব, সেলিম আগে জাহাঙ্গীর হোন, সিংহাসনে বসুন···

তার পর।

ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষ দশক।

আকবর দক্ষিণ ভারতে মুঘলশক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য সমর-অভিযান পাঠিয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতে তখন আধিপত্য স্থাপন করা মানে আহ্‌মদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও খান্দেশের সুলতানী শক্তিগুলি নষ্ট করা, বিশেষ করে দরকার ছিল খান্দেশের অসিরগড় জয় করা, কারণ অসিরগড়ের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক—দুদিক থেকেই গুরুত্ব ছিল খুব বেশী।

আকবর প্রথমে মুরাদ আর কয়েকজন নামী সেনাপতিদের দাক্ষিণাত্যে পাঠালেন।

১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি নিজে গেলেন খান্দেশ জয় করতে। খান্দেশের রাজধানী বুরাহানপুর, তারপর অসিরগড়—পরপর আকবরের হাতে এসে গেল—অবিশ্যি অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, অনেক

কৌশল করে। যাই হোক আকবরের তখন দক্ষিণ ভারতে দেরি করার সময় ছিল না। কারণ ওদিকে, অসিরগড় জয় করার ফাঁকে, উত্তর ভারতে বড় ছেলে সেলিম আবার এক কাণ্ড করে বসে আছেন।

সেলিমের ওপর ছিল—আজমীরের শাসন-দায়িত্ব। উপরন্তু তাঁকে পাঠানো হয়েছিল মেবার রাজ্য জয় করার জন্য।

সেলিম প্রথমটায় সাজ সাজ রব করলেন বটে, কিন্তু যেই দেখলেন তাঁর ধারে-কাছে আকবর নেই, তিনি গেছেন দাক্ষিণাত্যে—ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুক ঠুকে বলে উঠলেন, 'আমি বাপ জানি না, যুদ্ধ জানি না, আমি কারও হুকুমের চাকর নই—আমি এখন স্বাধীন, আমি যা খুশী তাই করব।'

মেবার জয় চুলোয় যাক, সেলিম গিয়ে প্রথম ঢুঁ মারলেন পাঞ্জাবে। সেখানে বিশেষ সুবিধে হল না। চলে এলেন আগ্রায়। অভিলাষ ছিল সেখানে মজুত-করা অগুণতি ধনরাশির বেশ খানিকটা হাতিয়ে নেওয়া—কাজে লাগবে।

কিন্তু সেখানেও ব্যর্থ হলেন।

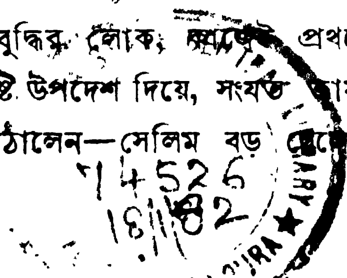
যমুনা নদী বেয়ে এবার চলে এলেন সোজা এলাহাবাদ। সেখানে এসেই সিংহাসনে বসে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'আমিই রাজা।'

বিহারের খানিকটা অংশ নিজের অধিকারে নিয়ে এলেন, সেখানকার তোষাখানা থেকে ত্রিশলক্ষের মতো টাকা সরিয়ে ফেললেন, শাসন করার জন্য সেখানে একজন গভর্নর রেখে দিলেন।

এলাহাবাদে রাজা সেলিম ইচ্ছেমতো নিজের পেয়ারের লোকদের খেলাত দিতে লাগলেন, জায়গীর দিলেন, ফরমান মঞ্জুর করলেন।

এককথায় একেবারে মথুরার রাজা বনলেন।

আকবর স্থিরবুদ্ধির লোক, [illegible] প্রথমে তিনি মাথা গরম করলেন না। মিষ্টি উপদেশ দিয়ে, সংযত ভাষায় তিনি সেলিমকে একখানা চিঠি পাঠালেন—সেলিম বড় ছেলে, যুবরাজ, যার ওপর



কিনা ভবিষ্যতের এতবড় দায়িত্ব—তার কি এসব ছেলেমানুষী করা মানায়, না উচিত!

চিঠিখানা পাঠালেন ছেলের আবাল্যবন্ধু খাজা মহম্মদ সরিফের হাতে দিয়ে। তাকে বলে দিলেন, সেও যেন বুঝিয়ে সুঝিয়ে সেলিমকে ঠাণ্ডা করে।

চিঠিখানা পেয়ে সেলিমের চোখে জল এল, অনুতাপে মনটা পুড়ে গেল। অমন বাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো!

পাপ, পাপ—মহাপাপ।

চোখের জলে সেলিমের দু'গাল ভিজে গেল।

সেলিমের ইয়ার-বন্ধুরা দেখল, মহাবিপদ—বেশতো হচ্ছিল খাওয়া-দাওয়া ফুর্তি করা, নিত্যি নোতুন খেলাত পাওয়া! তা নয় মাঝখান থেকে যত সব উড়ো বিপদ।

সেলিমের চোখে জল দেখে বন্ধুরা বললো, 'করছ কি ইয়ার! রাজার ছেলে বাপের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছ—বেশ করেছ, কামাল কিয়া। এর মধ্যে আবার চোখের জল ফেলাফেলির কি আছে?'

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে কোথায় বা অনুতাপ, কোথায় বা কি! সেলিম আবার যে-কে সেই।

শুধু তাই নয়, খাজা মহম্মদ সরিফও সেলিমের দলে ভিড়ে গেল, সে হল সেলিমের প্রধানমন্ত্রী। ওসব ছেড়ে আকবরের কাছে ফিরে আসতে তার বয়ে গেছে।

আকবর দেখলেন, মহাবিপদ, যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ। যাহোক একটা কিছু করা দরকার।

১৬০১ খ্রীস্টাব্দে তিনি ফিরে এলেন আগ্রায়। এখানে এসে শুনলেন, সেলিম হাজার ত্রিশেক সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসছেন আগ্রার দিকে, মুখে বলছেন, বাবাকে 'সেলাম' দেবো।

অভিনয় করে আকবরকে ভোলানো যায় না।

আকবর এক হুমকি দিলেন ছেলেকে—'বাপের কাছে আসতে

চাও তো অত লোকলস্কর কেন? মাত্র কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে আসবে তো এস, নয়তো পত্রপাঠ বিদেয় হও—নইলে—'

নইলে—কি হবে সেকথা সেলিম বুঝতে পেরে থেমে গেলেন, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন,—বাবাকে অনুনয় করে জানালেন, এবার থেকে তিনি বিশ্বস্ত থাকবেন, আর কোনো গোলমাল করবেন না।

ছেলের এই বিনীত মনোভাবে 'আকবর তো মহাখুশি, খুশি হয়েই তাঁকে উড়িষ্যা ও বাংলাদেশের শাসনকর্তা করে দিলেন।

সেলিম হাসিমুখে এলাহাবাদে ফিরে গেলেন, কিন্তু সেখানকার মাটিতে পা দেওয়া মাত্রই আবার কাঁধে সেই শয়তান ভর করল—সেলিম আবার রাজা হয়ে বসলেন, যা খুশি তাই করতে লাগলেন—এমন কি পর্তুগীজের কাছে সাহায্য চাইলেন, যাতে বাপের বিরুদ্ধে বেশ শক্তসমর্থ হয়ে দাঁড়াতে পারেন।

বিরক্ত হয়ে এবার আকবর খবর পাঠালেন আবুল ফজলের কাছে, তাঁর সঙ্গে একবার পরামর্শ না করে আকবর আর স্থির হতে পারছেন না।

আবুল ফজল তখন দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধের কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

যতই ব্যস্ত থাকুন, আকবর তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন শুনে আর তিনি চুপ করে থাকতে পারলেন না। দাক্ষিণাত্যের ভার নিজের ছেলের ওপর দিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি আগ্রার দিকে অগ্রসর হলেন, সঙ্গে মাত্র কয়েকজন অনুচর।

খবরটি যথারীতি পৌঁছে গেল সেলিমের কানে, রাগে সেলিমের মুখখানা টকটকে লাল হয়ে উঠল—আবার সেই লোকটা যাচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে বাপের কান ভারী করবার জন্য! লোকটা যে কী মন্ত্রে বাপকে জাদু করে রেখেছে সেলিম বুঝতে পারেন না। তিনি যাকে এত ঘৃণা করেন, বাপ তাকে এত ভালবাসেন কি করে!

সেলিম অস্থির হয়ে উঠলেন। যেমন করেই হোক, যাতে আবুল ফজল কিছুতেই আকবরের কাছে না যেতে পারে তারই ব্যবস্থা

করতে হবে। সেলিমের বদ্ধমূল ধারণা তাঁর মুঘল সিংহাসনে ওঠার পথটি আবুল ফজল কাঁটা দিয়ে বুজিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। এক্ষেত্রে আবুল ফজলকে কিছুতেই আকবরের কাছে যেতে দেওয়া যায় না—অতএব……!

অতএব সেলিম ডেকে পাঠালেন বুন্দেলা সর্দার রাজা বীরসিংহদেওকে—তাকে চুপি চুপি কি সব বললেন, বীরসিংহ মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাল, তরোয়ালের হাতলটা একবার মুঠিয়ে ধরল—

'ভালোয় ভালোয় কাজ মিটলে তোমাকে খুশি করে দেবো—' চাপা গর্জন করে সেলিম বললেন—

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার কাজে কোনো গাফিলতি হবে না'—

বুন্দেলা সর্দার মনের উল্লাস আর চেপে রাখতে পারছিল না।

আবুল ফজল যখন আগ্রার পথে উজ্জয়িনীতে এসে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁকে কয়েকজন এসে সাবধান করল, তিনি যেন ঐ পথ ধরে আর না এগোন। পথে নারোয়ারে সেলিমের লোক গা ঢাকা দিয়ে আছে, তাদের হাতে মারাত্মক অস্ত্র।

আবুল ফজল উত্তর দিলেন, যে পথ ধরে চলেছেন সে পথে তিনি যাবেনই। পথের চোর ডাকাতের সাধ্যি নেই তাঁকে আটকায়।

আবুল ফজল নারোয়ারের দিকে এগিয়ে চললেন।

১৬০২ খ্রীস্টাব্দের ১২ই আগস্ট।

আবুল ফজল নারোয়ার থেকে আর মাত্র ক্রোশ ছয়েক দূরে, ঠিক সেই সময় দেখা গেল, অস্ত্র হাতে একদল সৈন্য। বীরসিংহের লোক।

সঙ্গীরা আবুল ফজলকে বিনীত অনুরোধ জানাল ফিরে যেতে—অন্তত: কয়েক মাইল দূরে অন্ত্রী বলে যে জায়গায় রায়রায়ান ও সুরজ নামে স্বপক্ষীয় দুজন সেনাপতি সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করছেন—সে জায়গায় একটু আশ্রয় নিতে।

আবুল ফজলের এ প্রস্তাবেও মন সরল না। পিছু হঠতে তাঁর মর্যাদায় ঘা লাগল—তিনি এগিয়ে চললেন।

তারপর যা ঘটবার ঘটল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরসিংহের দল এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আবুল ফজলের ওপর। আবুল ফজল যতক্ষণ পারলেন, সাহস আর বীরত্বের সঙ্গে অস্ত্র চালিয়ে গেলেন।

কিন্তু কতক্ষণ!

শত্রুরা তাঁকে ঘিরে ফেলল, বর্শার আঘাতে তাঁর দেহ এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল। প্রাণহীন আবুল ফজল লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

এতেও বুন্দেলা সর্দারের পৈশাচিক তৃপ্তির অবসান হল না। সেলিমের কাছ থেকে আরও কিছু উপরি বাহবার জন্য বীরসিংহ আবুল ফজলের দেহ থেকে মাথাটি ছিন্ন করে সেলিমকে ভেট পাঠালেন।

সেলিম ছিন্ন মুণ্ডটা দেখেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন—আইন-ই আকবরীর বর্ণনায়—"into an unworthy place"—কোন্ আঁস্তাকুড়ে কে জানে! সেখানে নাকি অনেক দিন কাটামুণ্ডটি পড়ে ছিল।

সেলিমের রাগের এই হল নমুনা।

তবে অন্যদিকে তিনি বীরসিংহকে ভোলেন নি।

তিনি যখন সম্রাট জাহাঙ্গীর হলেন, তখন তিনি বীরসিংহকে তিনহাজারী সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর দরবারে বীরসিংহ আজীবন অন্যতম প্রিয়পাত্ররূপে বিরাজ করেছেন।

আবুল ফজলের এই হত্যাকাহিনী রাজধানীতেও পৌছল। কিন্তু সম্রাটের কানে এই নিদারুণ সংবাদ কে তুলবে! তবে একটা কাজ করা যেতে পারে। তৈমুর বংশের তো নিয়ম ছিল—রাজাকে তাঁর কোনো পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দিতে হলে মৃত রাজপুত্রের 'ভকিল' হাতে একখানা নীল রুমাল বেঁধে উপবিষ্ট রাজার সামনে গিয়ে

নীরবে দাঁড়াতেন। 'ভকিল'কে মুখে আর কিছু বলতে হত না, রাজা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে ফেলতেন—যে-ছেলের 'ভকিল' হাতে রুমাল বেঁধেছেন—সে ছেলের মৃত্যু হয়েছে······

আবুল ফজলের মৃত্যুসংবাদও ঠিক সেই নিয়মেই আকবরের কাছে পেশ করা হবে ঠিক হল।

আবুল ফজলের ভকিল যথারীতি হাতে নীল রুমাল বাঁধলেন, তারপর চোখের জল চেপে মাথা নীচু করে নীরবে গিয়ে দাঁড়ালেন সম্রাট আকবরের সামনে।

সভাস্থল চুপ।

কোথাও এতটুকু নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল না।

মুহূর্তের জন্য বোধ করি সবাই নিশ্বাস বন্ধ করেই রেখেছিল।

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল আকবরেরও। প্রথমটা বুঝি বা বুঝতে পারেন নি, তারপরেই হাহাকার করে উঠলেন—সাতরাজ্যের ধন এক মানিক আবুল ফজল, তাঁকে এমন করে মৃত্যুর আঘাত দেওয়া!

আকবর ক'দিন আর ঘর থেকে বেরুলেন না।

আকবর প্রথমে বুঝতে পারেন নি তাঁর আদরের সেখুবাবাই কাণ্ডটি করিয়েছেন। সব কিছু ঘটনা শুনে আকবর বলেছিলেন—'সেলিম যদি সম্রাট হতে চেয়েছিল, তবে আবুল ফজলকে না মেরে আমাকে তো মারতে পারত···!'

বীরসিংহকে চরম শাস্তি দেবার জন্য তিনি লোক পাঠালেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত, অনেক বার ধরা পড়তে গিয়েও, বীরসিংহ ধরা পড়েন নি, কোনোরকমে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলেন।

সেলিমও শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেতেন না; নেহাতই উত্তরাধিকারীর সমস্যা—তাই।

মুরাদ মদ খেতে খেতে আগেই মারা গেছেন!

দানিয়েলের অবস্থা ঐ একই কারণে কাহিল হয়ে পড়েছে। তিনিও আর বেশিদিন নয়।

বেগম সাহেবারা সম্রাটকে বিনীত ও সকাতর অনুরোধ জানালেন, যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে, সেলিমকে এখন ক্ষমা-ঘেন্না করে নেওয়াই ভাল। উত্তরাধিকারী হিসেবে ও ছেলেই তো একমাত্র সম্বল।

জাহাঙ্গীরের সৎমা ছিলেন সলিমা বেগম। অন্তঃপুরের অত্যন্ত প্রভাবশালিনী মহিলা, অতি বুদ্ধিমতী ও ধর্মশীলা।

এলাহাবাদে গিয়ে সেলিমকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে আগ্রায় নিয়ে আসবেন বলে তিনি আকবরের কাছে অনুমতি ভিক্ষা করলেন।

আকবর অনুমতি দিলেন।

সলিমা বেগম বুকভরা আশা নিয়ে এলাহাবাদে উপস্থিত হলেন। নিজের সন্তান না হলেও খেয়ালী সেলিমকে তিনি বড় ভালবাসতেন।

দেখা হলে সেলিম তাঁকে নত হয়ে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানালেন। সলিমা বেগম স্থির শান্ত দৃষ্টিতে সেলিমের মুখের দিকে খানিকটা তাকিয়ে রইলেন। সতেজ সুন্দর চেহারা, কিন্তু হলে হবে কি—মুখখানা একেবারে একগুঁয়েমিতে ভরা।

'বাড়ি চল, তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি—' সলিমা বেগমের শান্ত দৃষ্টির সামনে সেলিম যেন একটু কুঁকড়ে গেলেন। তবু ঘাড় বেঁকিয়ে রইলেন।

'অসম্ভব, আমি এখন কিছুতেই আগ্রায় ফিরব না—'

'বৃদ্ধ পিতার আদেশ-অনুরোধ রক্ষা না করার মানে কর্তব্যের হানি হওয়া, যে-কোনো ভাবী সম্রাটের পক্ষে এটা নৈতিক অপরাধ…'

সলিমা বেগমই জয়ী হলেন। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তিনি সেলিমকে নিয়ে এলেন আগ্রায়। সেখানে প্রথম দেখা হল ঠাকুমা মরিয়ম মকানীর সঙ্গে। তিনিও সেলিমকে কম বোঝালেন না।

সেলিম আকবরের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলেন, চোখের জল ফেললেন। সম্রাট-পিতাকে অনেক হাতী আর কয়েক হাজার সোনার

মোহর উপহার দিলেন। আকবর খুশি হলেন, সেলিমকে ক্ষমা করে তাঁকে নিজের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করলেন।

এর পরেই আকবর সেলিমকে আবার পাঠালেন মেবার অভিযানে। সেলিম ফতেপুর সিক্রী পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে পিতার কাছে এলাহাবাদ ফিরে যাবার অনুমতি চাইলেন। আকবর কোনো আপত্তি করলেন না।

সেলিম এলাহাবাদে উপস্থিত হলেন।

এলাহাবাদের মাটিতে বোধহয় কোনো দোষ ছিল,—যাঁহাতক ওখানে যাওয়া, সেলিমের মাথায় আবার দুষ্টবুদ্ধি চাপল—'আমি রাজা, আমিই সব—আমি কাউকে মানি না—'

এই খবর পেয়ে আকবর তো মহা বিরক্ত। কাঁহাতক আর ছেলের এই বেলেল্লাপনা সহ্য করা যায়। এদিকে নিজের শরীরও ভেঙে পড়েছে, মন ততোধিক খারাপ। তার চাইতে—আকবর স্থির করলেন—খসরুকে উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করা যাক।

সতের বছরের ছেলে খসরু, আকবরের আদরের নাতি। আকবরের এই মনোভাবে উল্লাসে নৃত্য করে উঠলেন মানসিংহ। তাঁরই ভাগনে খসরু। ভাগনে সম্রাট হলে মামার তো পোয়াবারো!

ওদিকে সেলিমের কানে একথা যেতে তাঁর তো মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল।

এলাহাবাদে তো দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে রাজা সেজে বসে আছেন, ওদিকে আগ্রার আসল সিংহাসন তো যাচ্ছে খসরুর হাতে। হোক সে নিজের ছেলে, সিংহাসনে বসতে গেলে কে কার বাপ, কে কার ছেলে—অত খোঁজ রাখলে চলে না।

বিপদ বুঝে সেলিম ছুটে এলেন আগ্রায়। খোলা দরবারে পিতার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

আকবর বেশ শান্ত ধীরভাবে পুত্রকে অভ্যর্থনা জানালেন, তাঁকে নিয়ে গেলেন অন্তঃপুরে, বাপ-ছেলে মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

আকবর সোজা তীব্রদৃষ্টিতে একবার সেলিমের দিকে তাকালেন, তারপর—বলতে গেলে একেবারে আচম্‌কা—অতবড় ছেলের গালে ঠাস্‌ ঠাস্‌ করে চড় মারলেন।

কথায় আছে আকবর নাকি তরোয়ালের এক কোপে সিংহের ধড় থেকে মাথা আলাদা করে নিতে পারতেন।

সেই হাতের চড়! সেলিমের তো মাথা ঘুরে গেল—তিনি চোখে হলদে মাছি দেখতে লাগলেন।

'আর এমন কাজ করবে? বাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে?'—

আকবর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তীব্র ভাষায় সেলিমকে ধমকাতে লাগলেন।

আর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, যা হাতের চড়! মাথার খুপরি নড়ে উঠেছে।

'মনে থাকবে?' আকবরের জলদ-গম্ভীর স্বরে সেলিম ভয়ে এতটুকু হয়ে গেলেন—মনে আবার থাকবে না!

আকবর এরপর সেলিমকে টেনে নিয়ে গেলেন একেবারে গোসলখানায়। একজন ডাক্তার, একজন নাপিত আর একটি চাকরের জিম্মায় সেলিম দশদিন একটানা ঐ ঘরে বন্দী হয়ে থাকলেন।

শুধু বন্দী করে রাখা?

আকবর ছেলের মদ বন্ধ করে দেন নি?

এক কাপ তো দূরের কথা, এক ফোঁটাও না—এমন কি এতটুকু আফিম পর্যন্ত না।

সেলিমের দুচোখ ফেটে জল এসেছিল। ছেলের মৌতাত এমন করে নষ্ট করে দেওয়া! দশদিন ধরে একেবারে নিরম্বু একাদশী!

দশ দিন পরে সেলিমকে যখন ঘরের বার করে আনা হল, তখন ছেলের মুখে বিনীত নরমভাব দেখে আকবর খুশি হলেন। আবার সেখুবাবাকে আদরে বুকে টেনে নিলেন। তাঁর একটা মাত্র ছেলে, বেঁচে আছে, এই ঢের—কারণ এর মধ্যে দানিয়ালও তো মারা গেছেন!

সেলিমের নতি স্বীকারটা আকবরের বৃদ্ধ বয়সে মস্ত সান্ত্বনার কাজ করেছিল।

কিন্তু অন্য দিকে অশান্তি আর শোকে আকবরের শেষজীবন পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিল।

চোখের সামনে মারা গেল দুই ছেলে, আর বীরবল, ভগবান দাস, টোডরমল, সেখ মুবারক, তাঁর ছেলে ফৈজী। ওদিকে আবুল ফজলের ঐ নিদারুণ হত্যা।

আকবরকে দুঃখ দেবার জন্যই যেন কয়েক বছরের আড়াআড়িতে তাঁর সব কজন প্রিয়পাত্র চলে গেলেন। ঠিক এই সময় মরিয়ম মকানীও শেষ নিশ্বাস ফেললেন।

উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে আকবর যেটুকু নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, তাও আর বেশি দিন টিকল না।

সিংহাসন নিয়ে সেলিম আর খসরুর মধ্যে কুৎসিত বিরোধ ঘনিয়ে উঠল।

একদিকে সেলিমের দল—আকবরের সমর্থনটাও অবিশ্যি এদিকে, অন্যদিকে খসরুর দল, পেছনে রয়েছেন মামা মানসিংহ, আর শ্বশুর আজিজ কোকা।

অসুস্থ আকবর—শুধু শরীরটাই দুর্বল নয়, মনের জোরও কত কমে গেছে। এর ওপর ছেলে-নাতির এই লড়াই বুকের ওপর যেন দশ মণ পাথর চাপিয়ে দিল। এত বড় সাম্রাজ্য, এত যত্নে গড়া এত স্বপ্ন, এত আশা—সব কিছুই ছাই হয়ে যাবে!

শাহানশাহ্ আকবরের চোখ দুটি ছলছল করে উঠল…।

হঠাৎ আকবর সোজা হয়ে বসলেন। এক কাজ করলে তো হয়! দৈবের কি বিধান দেখা যাক না! হাতীর লড়াই লাগিয়ে দেওয়া যাক না কেন! একটা সেলিমের হাতী, আর একটা খসরুর। যার

হাতী জিতবে ভাগ্যের জয়ও তার, সিংহাসনে তাকেই বসানো হবে। দেখাই যাক না।

আকবর হাতীর লড়াইয়ের হুকুম দিলেন।

আজকের শীতের দুপুরে ইডেন উদ্যানের মতোই আকর্ষণ ছিল মুঘল যুগে হাতীর লড়াইয়ের মাঠ।

দুর্গে একটা ঝরোখার নিচে যমুনা নদীর ধারে দুই হাতীর শক্তির পরীক্ষা হত।

দুদিকের দুটো হাতীর মাঝখানে থাকত মাটির দেওয়াল—দুই হাতীর ওপর দুজন মাহুত। তাদের মুখে বিষণ্ণ ছায়া। তারা প্রিয়জনের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে এসেছে, আদর করে এসেছে বাচ্চাদের—তাদের বাবা আর নাও ফিরতে পারে, না ফেরার সম্ভাবনাই বেশী। মত্ত হাতীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মোচার খোলার মতো তারা ছিটকে পড়বে মাটিতে, দেহের প্রতি কোষে রক্ত গড়িয়ে আসবে, চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে আসবার আগে তাদের কানে ভেসে আসবে জনতার উত্তেজিত উল্লাস…

আকবর ঝরোখায় এসে বসলেন, পাশে সেলিমের তৃতীয় ছেলে খুররম—ভবিষ্যৎ শাহ্‌জাহান।

সেলিমের হাতী গিরনবর এসে দাঁড়িয়েছে। ওদিকে দাঁড়িয়েছে অপূর্ব, খসরুর হাতী। রিজার্ভে দাঁড়িয়ে আছে রণথম্ভন—সরকারী হাতী। দুজনের মধ্যে যে হাতী কাবু হয়ে পড়বে, তাকে সাহায্য করাই হল এর কাজ। রণথম্ভন ছিল 'স্ট্যাণ্ডবাই'।

সঙ্কেত পেয়েই হাতী দুটো পরস্পরকে চার্জ করল, দুজন দুজনের ওপর হুড়মুড় করে পড়ল, মাঝখানের মাটির দেওয়াল ভেঙে পড়ল। হাতীর লড়াইয়ে মাটি কাঁপতে লাগল।

উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠলেন দুদিকে দুই ঘোড়ার পিঠে বসে-থাকা দুটি দর্শক—সেলিম আর খসরু, বাপ আর ছেলে। হাতীর লড়াই নয়, দুজনের ভাগ্যের লড়াই।

হঠাৎ সেলিম উল্লাসে চীৎকার করে উঠলেন। তাঁর গিরনবর স্লেট-কালো বিশাল শরীরটি দিয়ে চেপে ধরেছে অপূর্বকে। অপূর্ব প্রাণপণ চেষ্টা করেও গিরনবরের ধাক্কা ফেরানো দূরের কথা,—সামলাতেই পারছে না, নেতিয়ে পড়ছে।

রণথম্ভন তাড়াতাড়ি ছুটে গেল অপূর্বকে সাহায্য করতে। কিন্তু সেলিম আর তাঁর দলবল চীৎকার করে উঠলেন—'না, কিছুতেই না, কোনো সাহায্য নয়—' অপূর্বর মাহুতকে তাঁরা পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগলেন, মুখ খারাপ করে গালাগালি দিতে লাগলেন। তবে এত চেঁচামেচির দরকার ছিল না। গিরনবরের ধাক্কায় রণথম্ভনও পিছিয়ে এল।

খসরু ছুটে গেল ঠাকুর্দার কাছে—একি ব্যবহার বাপের আর আর তাঁর ইয়ার-বক্সীদের!

আকবর খুররমকে দিয়ে তাড়াতাড়ি খবর পাঠালেন সেলিমের কাছে—'বন্ধুদের একটু সামলে চলতে বল। যাবতীয় হাতী তোমার এক্তিয়ারেই যাবে।'

গিরনবরের বিক্রমে অপূর্ব পালিয়ে গিয়েছিল, রণথম্ভনকেও ঠেলে ফেলে দিয়েছিল যমুনার জলে। তবু গিরনবরের রাগ যায় না। অতি কষ্টে অনেক কৌশল করে শেষ পর্যন্ত গিরনবরের কবল থেকে রণথম্ভনকে উদ্ধার করা হল।

আকবরের কাছে সেদিন নিশ্চয়ই দৈবের বিধান স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অত খোলাখুলিভাবে ছেলে-নাতির ঝগড়া যেন মাথায় আগুন ধরিয়ে দিল।

তৈমুরলঙের বংশের একি হাল! লোকে বলবে কি?

ভেবে ভেবে সেই রাতেই শরীর কাঁপিয়ে জ্বর এসে গেল আকবরের। তার ওপর দেখা দিল দুরন্ত রোগ আমাশয়।

হাকিম আলি গিলানি সব রকম চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। মৃত্যুর কালো ছায়া আস্তে আস্তে ঢেকে ফেলতে লাগল সম্রাট

আকবরের অতবড় শক্তিধর দেহটিকে, মুখখানা শুকিয়ে পাণ্ডুর হয়ে গেল।

কিন্তু তাতেই কি নিস্তার আছে!

মুমূর্ষু শয্যাকে ঘিরে ষড়যন্ত্রের বিষনিশ্বাস বয়ে যেতে লাগল। একদিকে আজিজ কোকা আর মানসিংহ।

সম্রাটের শেষ নিশ্বাসটুকু শুধু পড়বার অপেক্ষা—তারপরে সিংহাসনে বসবেন খসরু।

অন্যদিকে সেলিম, বাপের সিংহাসনে ন্যায়ত তাঁরই অধিকার।

শৃগাল-চতুর আজিজ কোকা ইতিমধ্যে গোটা প্রাসাদে প্রত্যেকটি পদে নিজের লোক রেখে দিয়েছেন। চারিদিকে একেবারে আটঘাট বাঁধা। মৃত্যুপথযাত্রী পিতাকে দেখবার জন্য সেলিম যে মুহূর্তে প্রাসাদে পা দেবেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে একেবারে পেড়ে ফেলা হবে। বন্দীঘরে আটকানো হবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে অন্যদিকে সব ফর্সা হয়ে গিয়েছিল।

সেলিম পিতাকে দেখবার জন্য নৌকো থেকে নামতে যাবেন, ঠিক এমনি সময়ে একজন এসে খবর দিল—'খবরদার, এ মাটিতে পা দিয়েছেন কি মরেছেন, সব ওৎ পেতে বসে আছে—দেখা মাত্র ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে—'

কি সর্বনাশ! সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর মুখ সাঁ করে ঘুরে গেল, পত্রপাঠ নিজের বাড়ী ফিরে এসে সেলিম বাঁচলেন।

এমন একটা লাগসই প্ল্যান বানচাল হতে দেখে মানসিংহ আর আজিজ কোকা গালে হাত দিয়ে খানিকটা বসে রইলেন, তারপর আবার উঠে-পড়ে লাগলেন।

এবার আর রাখঢাক গুড়গুড় নেই, একেবারে খেলামেলা ভাবে আমির-ওমরাহ্‌দের ডেকে তাঁরা বোঝাতে লাগলেন—সেলিমকে বাদ দিয়ে খসরুকে সিংহাসনে বসানোই সব দিক থেকে মঙ্গল।

খসরুর দিকে মাথা হেলানোর লোক বড় কম ছিল না। কারণ

চেহারার মতোই খসরুর ব্যবহার ছিল স্মিত, জীবন ছিল সংযত। কিন্তু তবু এই যুক্তিতে সকলের মন সায় দিল না, বিশেষ করে মুঘল বংশেরই একজন, নাম তাঁর সৈয়দ খান বারা, সেলিমকে বাদ দিয়ে খসরুকে সিংহাসনে বসানোর প্রস্তাবকে তীব্র ভাষায় নিন্দে করলেন, বললেন, এইভাবে তুর্কী-চাক্‌তাই বংশের আইন রীতিনীতিকে জলাঞ্জলি দেবার চেষ্টা হচ্ছে।

তর্কের ঝড় বয়ে গেল।

মানসিংহ ও আজিজ কোকা যা ভেবেছিলেন, তার কিছুই হল না। তাঁরা দেখলেন খসরুকে সবাই পছন্দ করলে কি হবে, রাজা করবার বেলা সকলের মন ঠিক সেই সেলিমের পক্ষেই ঝুঁকেছে···।

সেলিমের সিংহাসন প্রাপ্তির রাস্তা প্রায় পরিষ্কার। তবু একদিন তাঁর কাছে গোপনে খবর গেল—খসরুর অভিষেক হয়ে গেছে, আর আগ্রা ফোর্টের যত কামান সব ক'টির মুখ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে সেলিমের বাড়ির দিকে—সেলিমের ছিটকে উড়ে যেতে আর বেশী সময় নেই।

সেলিম তো ভয়ে তখুনি এলাহাবাদ যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু তার পরেই খবর এল, কোন ভয় নেই, বিরোধী দলের সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে, সেলিমই রাজা হচ্ছেন।

মিথ্যে খবর নয়।

আনন্দোৎফুল্ল চোখে সেলিম দেখলেন, একে একে কত লোক এসে তাঁর পাশে দাঁড়াল, এমন কি শত্রুপক্ষের লোকেরাও দলে দলে এসে সেলিমকে তাদের আনুগত্য জানাল। প্রতিদানে সেলিম তাদের পূর্ব ব্যবহারকে ক্ষমা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। আজিজ কোকাকে তিনি সাদরে অভিনন্দন জানালেন।

আর মানসিংহ!

তিনি কিছুক্ষণ কিসের আশায় যেন অপেক্ষা করে তারপর খসরুকে সঙ্গে নিয়ে বাংলার পথে পা বাড়াবার যোগাড় করলেন।

১৭ই অক্টোবর, ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দ।

সেলিম নিরাপত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে আগ্রা ফোর্টে ঢুকলেন।

আকবরের জীবন-দীপ তখন নিভে আসছে। জোরে জোরে নিশ্বাস টেনে তিনি কোনরকমে নিজেকে এই পৃথিবীর মায়ায় আটকে রাখছিলেন।

সেলিম মাথা নীচু করে নীরবে মুমূর্ষু পিতার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আকবরের প্রায়-নিমীলিত দুটি চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি যেন এতক্ষণ এই খেয়ালী একগুঁয়ে ছেলেটিকেই খুঁজছিলেন। পার্শ্বচর কর্মচারীদের ইঙ্গিত করলেন, তাঁরা তাড়াতাড়ি উঠে রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন সেলিমের মাথায়, গায়ে পরিয়ে দিলেন রাজপরিচ্ছদ, কোমর বন্ধনীতে দিলেন রাজ-তরবারি।

আকবর আশীর্বাদ করলেন মুঘল সাম্রাজ্যের সম্রাটকে—তাঁর অতি স্নেহের সেখুবাবাকে।

দু-ফোঁটা জল জমে উঠল দু-চোখের কোণে।

পরম ক্লান্তিতে আকবরের চোখ দুটি বুজে এল।

উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বভরা এক মহাযুগের অবসান হল।

ঠিক এক সপ্তাহ পরে—২৪শে অক্টোবর। সম্পদ আর সম্ভ্রমের মাঝখানে সেলিম নিজের হাতে রাজমুকুট মাথায় তুলে নিলেন। মুকুটে গেঁথে-রাখা হীরেমানিক থেকে আলো ছিটকে পড়ল। নোতুন সম্রাটের শুভ কামনায় উদাত্ত কণ্ঠে প্রার্থনা স্তব শুরু হল, দামামা বেজে উঠল, মুঠি মুঠি সোনা রূপোর টাকা বিলানো হল, বন্দীরা মুক্তি পেল, সকলের অপরাধ ক্ষমা করা হল।

সেলিম হলেন নুর উদ্দিন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর পাদশাহ্ গাজি।

সাম্রাজ্যের সীমানা—হিন্দুকুশ থেকে ব্রহ্মপুত্র, হিমালয় থেকে নর্মদা, নর্মদার দক্ষিণে আবার কিছুটা—আহ্‌মদ নগর, খান্দেশ, বেরার, অসিরগড়—স্বর্গীয় সম্রাটের বাহুবলের পরিচয়।

রাজত্বকাল—১৬০৫ থেকে ১৬২৭ খ্রীস্টাব্দ।

ভাবপ্রবণ জাহাঙ্গীর, কবি-শিল্পী জাহাঙ্গীর, উঁচু প্রাসাদ থেকে যমুনা নদীর বুকে দুলে দুলে বয়ে-যাওয়া ঢেউ-এর দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, এত বড় সাম্রাজ্য, পরলোকগত মহান পিতার আদর্শে খুব ভালো করে শাসন করতে হবে, সবাইকে ভালোবাসতে হবে, অনাচার বন্ধ করতে হবে, প্রজাদের তুচ্ছতম দুঃখও দূর করতে হবে, ন্যায়ের বিধানে আইনের সামান্যতম ত্রুটিও দূর করতে হবে—

জাহাঙ্গীর ভাবে উদ্বেল হয়ে উঠলেন।

জাহাঙ্গীর ভালো ভালো নীতিকথা ঘোষণা করলেন—শাসন-ব্যবস্থায় কোন অনাচার থাকবে না, প্রজাদের সম্পত্তির নিরাপত্তা থাকবে, কোন অপরাধীকে অঙ্গহানি করে শাস্তি দেওয়া হবে না, হাসপাতাল তৈরি হবে, নির্দিষ্ট দিনে পশুহত্যা বন্ধ থাকবে—আরও কত কি।

সবার ওপরে একটা ঘোষণা ছিল—মদ বা অন্য কোন নেশার জিনিস বিক্রি করা চলবে না।

জাহাঙ্গীর সত্যিই ভাবপ্রবণ ছিলেন।

শুধু ঘোষণাই নয়, আগ্রার দুর্গ থেকে যমুনা নদী পর্যন্ত ত্রিশ গজ লম্বা একটা 'ন্যায়শৃঙ্খল' (Chain of Justice) টাঙিয়ে দেওয়া হল। গোটা শেকলটাই নাকি সোনা দিয়ে তৈরি ছিল। আর তাতে ছিল ষাটটি ঘণ্টা।

জাহাঙ্গীর ঘোষণা করলেন, যে-কোন প্রজা ঐ ঘণ্টা বাজিয়ে নির্ভয়ে সম্রাটের কাছে অভিযোগ জানিয়ে বিচার প্রার্থনা করতে পারবে।

একবার নাকি যমুনা নদীর ধারে একটা গাধা চরে বেড়াচ্ছিল, মুখ ঠেকিয়েই হোক, বা গা লাগিয়েই হোক, শেকল নড়ে উঠে ঘণ্টা বেজে উঠেছিল।

ব্যস আর যায় কোথায়!

'ন্যায়-শৃঙ্খলের' ঘণ্টা একবার যখন বেজেছে, তখন যার ছোঁয়া লেগেই হোক—তার দুঃখটা কি, একবার জানতেই হবে।

লম্বকর্ণ গাধাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করা যাবে না। অতএব তার 'দুঃখের' খোঁজ নেওয়া হল।

গাধা হলে কি হবে, তার যে এক বিরাট অভিযোগ রয়েছে!

এই ন্যায়শৃঙ্খল না টাঙালে কি কেউ জানতে পারত?

খোঁজ নেওয়া গেল, ঐ গাধাটির মালিক মানুষ হিসাবে মোটেই ভালো নয়। তার হাতের মুঠি একবার বন্ধ হলে সহজে খুলতে চায় না, একেবারে হাড়কিপ্টে। ফলে গাধাটির বিশেষ দেখাশোনা হয় না। এ কি কম অভিযোগ! তাই গাধা ন্যায়বিচারের জন্য ঘণ্টা বাজিয়েছে।

মালিককে ডেকে এনে খুব ধমক দেওয়া হয়েছিল, খবরদার, আর যেন গাধাটিকে অভিযোগ করতে না হয়।

'ন্যায়শৃঙ্খলের' অবাস্তবতা প্রমাণ করার জন্যেই এই কৌতুকটির সৃষ্টি।

অভিষেক হয়ে গেল। রাজ্যের শাসনভারের দায়িত্ব জাহাঙ্গীর কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। কেউ উজীর, কেউ দেওয়ান, কেউ বা মীর বকসি। আরও অন্য লোভনীয় পদ তো ছিলই।

আর একজন ছিলেন, অভিষেকের পরেই তাঁর উপাধি হয়েছিল ইতিমদ-উদ-দৌলা (Mastership of the Imperial household) রাজবাড়ির সকল দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। তেহরানের একদা ভাগ্যলাঞ্ছিত গিয়াস বেগ—ভাবী নূরজাহানের পিতা।

আরও দুজনের নাম করা দরকার—একজন মহাবৎ। নাম নয়, উপাধি—আসল নাম, জমানা বেগ, সামান্য অবস্থা থেকে যিনি এই সময় পনের শ' সৈন্যের অধিনায়ক পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

আর একজন—কুতুব-উদ-দীন খান কোকা। জাহাঙ্গীরের দুধ-ভাই, সেলিম চিস্তির দৌহিত্র। জন্মের দ্বিতীয় দিন থেকেই জাহাঙ্গীর কুতুব-উদ-দীন কোকার মায়ের কাছে মানুষ—তাঁরই বুকের মধু পান করে জাহাঙ্গীর এত বড়ো।

জাহাঙ্গীর এই কুতুব-উদ-দীনকেও পাঁচহাজারী মন্‌সবদার করে দিয়েছিলেন এবং কিছু পরে বাংলার সুবাদার করে পাঠিয়েছিলেন।

বাংলায় তখন ছিলেন মানসিংহ, জাহাঙ্গীরের ভাষায় 'বুড়ো-নেকড়ে'। এই মানসিংহই ছিলেন খসরুর মামা—ভাগনেকে সিংহাসনে বসানোর জন্য যে-মামার মাথা ঘামানোর আর শেষ ছিল না। জাহাঙ্গীর কিন্তু এঁকেও ক্ষমা করেছিলেন। শুধু কি তাই! মানসিংহের ছেলে মহাসিংহকেও দু'হাজারী সেনাপতি করে দিয়েছিলেন।

সব ঠিকঠাক করতে না করতে এসে গেল মুঘলযুগের বিখ্যাত পরব 'নওরোজ' বা নববর্ষ উৎসব।

সেটা ছিল মার্চ মাস ১৬০৬ খ্রীস্টাব্দ। প্রতি বছর উনিশ দিন ধরে চলত নওরোজের উৎসব। দেওয়ান-ই-আমে টাঙিয়ে দেওয়া হত ষাট হাত লম্বা পঁয়তাল্লিশ হাত চওড়া এক ঝকঝকে চাঁদোয়া। তার নিচে থাকত সিংহাসন, সম্ভ্রান্তদের ব‌সবার আসন।

ভেলভেট, রেশম আর জরি, মণিমুক্তা আর হীরে, সোনা আর রূপো, নাচ আর গান, হাসি আর উল্লাস, যৌবন আর উচ্ছ্বাস, রক্তিম পানীয় আর রক্তবিম্বাধরৌষ্ঠী—এই সব কিছু নিয়ে ছিল নববর্ষের উৎসব। এই উৎসবের সেণ্টার অব ..ভিটি ছিল ফ্যান্সি বাজার, যার নাম ছিল মীনাবাজার। আমীর ওমরাহ্‌দের বাড়ির মেয়ে-বৌরা আমন্ত্রিত হত। তারা এসে সারি সারি দোকান খুলে বসত, বেসাতি সাজাত। রকমারি সুন্দর জিনিস। রূপসীদের স্পর্শে আরও সুন্দর।

ক্রেতাদের মধ্যে একজন প্রধান—তিনি সম্রাট।

ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি হেসে সম্রাট জিনিসের দর জিজ্ঞেস করতেন। স্বচ্ছ ওড়নাখানা মুখের ওপর টেনে দেওয়ার ভঙ্গি করে দোকানী কটাক্ষ করত—দোকানের সবকটি জিনিসের হঠাৎ দর বেড়ে গেছে, এখন সম্রাটের অভিরুচি।

খুব চিন্তিতভাবে সম্রাট মাথা নাড়তেন। এ তো কেনা চলবে না। এতো দাম বাড়লে কি তাঁর মতো লোক কোন জিনিস কিনতে পারে···?

কোমলাঙ্গীদের সঙ্গে দরদস্তুর করতেও সুখ।

চারিদিকে সুন্দরীর মেলা, চারদিকে ফুল। ফোয়ারা থেকে উৎসারিত সুরভি জল—সব কিছু মিলিয়ে যেন একখানা স্বপ্ন।

এই স্বপ্নই মূর্ত হয়ে এগিয়ে এসেছিল। জাহাঙ্গীর মুখের ভাষা ভুলে গিয়েছিলেন। তাকিয়ে দেখেছিলেন—তাঁর সামনে একটি আলোর মূর্তি···

সেদিনও ছিল উৎসবের রাত—নওরোজ, বছরের প্রথম দিন।

উৎসব শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু তার রেশ আছে, সুরও আছে। সেই সুরে বিভোর হয়েছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর।

হঠাৎ খবর এল, খসরু ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেছেন পাঞ্জাবের দিকে, সঙ্গে তাঁর সাড়ে তিন শ' অশ্বারোহী। পথে যোগ দিয়েছেন হুসেন বেগ বাদাখ্সী, তাঁরও সঙ্গে তিন শ' অতি-সাহসী অশ্বারোহী। এদিক-সেদিক থেকে আরও প্রচুর লোক যোগ দিচ্ছে শাহ্জাদার দলে।

শুধু এইটুকু খবরই নয়, লাহোরের দেওয়ান আবদুর রহিম—তিনিও ঐ খসরুকে কর্তা বলে স্বীকার করেছেন। অথচ হুসেন বেগ

বাদাখ্সী আর আবদুর রহিম, দুজনেই আসছিলেন আগ্রার দিকে। সম্রাট তাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আর তাঁরা কিনা সব ভুলে উল্টো পথে চলতে শুরু করলেন! খসরুর যাত্রাপথের ঝড়ো হাওয়া তাঁরা একেবারে অ্যাবাউট টার্ন।

ওরা কেউ একবার চিন্তা করল না ঘাড়ের ওপর মাথাটা যেমন ভাবে বসানো আছে—তেমনভাবেই চিরকাল থাকবে কিনা!

জাহাঙ্গীর দুহাতের মুঠি পাকাতে পাকাতে পায়চারি করতে লাগলেন। কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করছে, সমস্ত মাথাটা যেন কেমন বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে। সৈন্য সাজাতে হুকুম দিয়েছেন, এখন শুধু পা বাড়ালেই হয়।

বান্দা, বাঁদী আর খোজা প্রহরীরা ভয়ে সিঁটকে আছে, মাঝে মাঝে নিজেদের গায়ে চিমটি কেটে দেখছে এখনও তারা বেঁচে আছে কি না।

ভয় হবে না! ছেলের এই ব্যবহারে সম্রাটের মাথায় এমন আগুন জ্বলে উঠেছে যে, সম্রাট আজ সকাল থেকে 'কালো মানিকে'র মুখ পর্যন্ত দেখেন নি—অমন মৌতাতের আফিম খান নি!

আর কি বেইমান ছেলে! ঘোড়া ডিঙিয়ে কিনা ঘাস খেতে চায়? বাপের আগেই সিংহাসনে বসবে—আবদার আর ধরে না!

অথচ জাহাঙ্গীর! তিনি যখন সিংহাসনে বসলেন, তখন ঐ বিগড়ানো ছেলেকে আর তার 'বুড়ো নেকড়ে' মামাকে তিনি ক্ষমা করেন নি? মামা-ভাগ্নে তো নৌকা করে বাঙলাদেশে, বলতে গেলে, পালাচ্ছিলেন। তিনি তাদের আদর করে ডেকে ফেরান নি?

আবার ছেলের হাতে একলাখ টাকাও তো গুঁজে দিয়েছিলেন আগ্রাতেই একটা বিরাট পুরনো বাড়িকে একেবারে নোতুন করে ঢেলে সাজিয়ে সুন্দর করে গুছিয়ে সেখানে নিজের মনে থাকবার জন্য!

ছেলের তর সইল না। ঐ যে ক'দিন আগ্রা প্রাসাদে ছিল—

সামান্য একটু-আধটু নজর রাখা হয়েছিল, আট্‌কা-আট্‌কি, ধরাবাঁধায় একটু ঢিলেমি এসেছিল—সেই সুযোগে দাদুভাইয়ের সমাধি দেখার নাম করে একেবারে হাওয়া!

আর ওর দলের লোকগুলোরও বুদ্ধির বলিহারি—ছেলের আমার সুন্দর চেহারা আর মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনেই সব একেবারে বোকা-বুদ্ধু বনে গেছে! আরে বাবা, কেবল লাল চেহারা আর মিষ্টি কথা বললেই সম্রাট হওয়া যায় না, বাদশাহী-তখ্‌তে বসতে গেলে তাগদ চাই, তাগদ···!

জাহাঙ্গীর তরোয়াল দিয়ে ঢ্যাঁই করে মারলেন পাথরের দেওয়ালে—গোটা মহলটা গুম গুম করে উঠল।

ওদিকে খসরু এগিয়ে যাচ্ছেন, সঙ্গে হুসেন বেগ, আবদুর রহিম আর দলবল।

খসরু দেখা করলেন শিখগুরু অর্জুনের সঙ্গে, তাঁর কাছে সাহায্য চাইলেন। কিছু টাকা চাই, টাকা না হলে মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অসম্ভব।

অর্জুন সস্নেহে হাসলেন। শাহানশাহ্‌ আকবরের নাতিকে সাহায্য করার মতো টাকার থলে তো তাঁর নেই। তবুও গরীবের খুদকুঁড়ো থেকে খসরুর হাতে তুলে দিলেন সামান্য পাঁচ হাজার টাকা।

খসরু কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধা জানিয়ে এগিয়ে গেলেন পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরের দিকে। লাহোর দখল করে গোটা পাঞ্জাবটা একবার অধিকারে নিয়ে আসতে পারলে অনেকখানি বাঁচোয়া।

কিন্তু প্ল্যান করলেই তো হয় না। লাহোর দখল করতে এসে খসরু দেখলেন—অসম্ভব। সুবাদার দিলওয়ার খান আগের থেকেই বিপদ আঁচ করে যথেষ্ট প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। সাধ্য কি তাঁর দক্ষ সেনাবাহিনী আর কামানের সামনে খসরু দাঁড়াতে পারেন! খসরু শত্রুপক্ষকে একটা আঘাত হানলে সেটা দশটা হয়ে ফিরে আসছে খসরুর গায়ে।

কোন আশা নেই জেনেও খসরু সেখানে ন'টা মূল্যবান দিন বৃথা নষ্ট করলেন।

ঠিক সেই সময়ে খবর এল সম্রাটের সৈন্য এগিয়ে আসছে, লাহোরে পৌঁছতে বেশি দেরি হবে না। সৈন্যবাহিনীতে রয়েছেন সম্রাট স্বয়ং, আর বাছাইকরা সব সেনাপতি—সেখ ফরিদ, সরিফ খাঁ আর মহাবৎ খাঁ।

সেখ ফরিদ একটু আগে আগে আসছিলেন!

খবর পেয়ে খসরু নিজের বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারলেন, তবু মরীয়া হয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরি হলেন—সঙ্গে দশ হাজার সৈন্য।

জাহাঙ্গীর কিন্তু প্রথমে ছেলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান নি—হাজার হোক ছেলে, বয়সের দোষে একটু ছেলেমানুষী করছে। দেখাই যাক লোক পাঠিয়ে, ছেলে ভালো কথায় বাপের কাছে মাথা নীচু করে কি না।

কিন্তু অসম্ভব, কোন কথাতেই ছেলেটা ঘাড় পাতল না।

বেয়াড়া ছেলে তাহলে যুদ্ধ না করে ছাড়বে না দেখছি—বেয়কুফ কোথাকার!

সম্রাটের চোখ দুটি আবার লাল হয়ে উঠল।

যুদ্ধটা হয়েছিল ভৈরোয়াল বলে একটা জায়গায়। সম্রাটের পক্ষে ছিল বহু যুদ্ধে অভিজ্ঞ সেনানায়কদের নেতৃত্বে শিক্ষিত দুর্ধর্ষ সৈন্যদল, অন্য দিকে ছিল খসরুর অনভিজ্ঞ, যুদ্ধবিজ্ঞানে অজ্ঞ, বিশৃঙ্খল সেনা-বাহিনী—সেনাবাহিনী না বলে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বললে ঠিক হয়। খসরুকে ভালোবেসে দলে দলে লোক এসেছিল—কিন্তু ভালোবাসাটা মনের ব্যাপার, যুদ্ধটা হাতিয়ারের। অতএব ফল যা হবার হল।

এর ওপর আবার ভগবানের মার।

যুদ্ধের ঠিক আগের দিন রাত্রে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। এত বৃষ্টি যে, খসরুর দলবল পাশের একটা গ্রামে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। সুতরাং

তার পর দিন আশ্রয়ার্থীরা যুদ্ধ করার জন্য যে-পথ দিয়ে গিয়েছিল,—সে পথে যখন ফিরে আসতে লাগল, তখন সকলেই বুঝল পায়ের নিচে মাটি আর মাটি নেই, আছে শুধু আছড়ে ফেলবার ফাঁদ—রাস্তাঘাটে এত কাদা হয়েছিল, এত পা হড়কে যাচ্ছিল।

পা হড়কালো যুদ্ধেও।

সম্রাটের সেনাবাহিনীর কাছে খসরুর দল একেবারে কচুকাটা হয়ে গেল।

খসরু কোনরকমে আবদুর রহিম, হুসেন বেগ আর সামান্য কিছু লোকজন নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালালেন। পালাবার পথে তর্ক হতে লাগল, এবার কোন দিকে যাওয়া উচিত।

একপক্ষ বলল, আর কোথাও নয়—সোজা আগ্রা, আগ্রা দখল করতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি সেখানেও ব্যর্থ হতে হয়, তাহলে একেবারে মানসিংহের আশ্রয়ে গিয়ে ওঠা।

এই পরিকল্পনায় আর যাই থাক, বাস্তবতা ছিল না।

হুসেন বেগ এক ফুৎকারে সব উড়িয়ে দিলেন। তিনি বললেন, ওদিকে নয়, বরং উল্টোদিকে যেতে হবে—যেতে হবে কাবুলে, যেখান থেকে বাবর-হুমায়ুন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন। উপরন্তু ওখানে তিনি সৈন্য অর্থ সবই যোগাড় করে দেবেন বলে কথা দিলেন।

ওখান থেকেই সম্রাটের বিরুদ্ধে আবার কপাল ঠোকা যাবে।

হুসেন বেগের প্রস্তাবটা প্রায় সকলেরই বেশ মনে ধরল।

মনে তো ধরল, কিন্তু কাবুলে যাওয়া কি সোজা কথা!

জাহাঙ্গীরের সেনাপতিরা চারিদিকে খর দৃষ্টি রেখেছেন। স্থানীয় জমিদার-জায়গীরদারদের সজাগ করে দেওয়া হয়েছে। নদীর ঘাটে, নৌকোয় তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়েছে—খবরদার, শত্রুপক্ষের একটা মাছিও যেন গলে না যেতে পারে।

এদিকে রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে খসরু, হুসেন বেগ আর

আবদুর রহিম উপস্থিত হলেন চন্দ্রভাগার তীরে শাহপুরে, সঙ্গে মাত্র কয়েকটি লোক।

কিন্তু হা হতোঽস্মি, না একটা নৌকো, না কিছু। ছুটতে ছুটতে আরও একটু এগিয়ে গেলেন।

এবার দেখলেন নদীর ধারে নৌকো আছে; একটাতে রয়েছে খড়ের রাশ, আর জ্বালানী কাঠ, অন্যটা একেবারে খালি। এমন কি একটা মাঝি পর্যন্ত নেই।

হুসেন বেগ খড়ের নৌকোর মাঝিদের খালি নৌকোটিতে এসে তাঁদের একটু নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন—মাঝিরা রাজী হল না। কাকুতিমিনতি ভয় লোভ—কোন কিছুতেই মাঝি দুটি টলল না।

ইতিমধ্যে চারিদিকে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে উঠেছে। তারই মধ্যে একজন ঘোড়সওয়ার এসে হাজির হল—সম্রাটের লোক।

খসরু তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে তাড়াতাড়ি খালি নৌকোটিতে গিয়ে উঠলেন, নদীর বুকে তাঁরা নিজের হাতে নৌকো বাইতে বাইতে চললেন।

কত দূর তাঁরা এগিয়েছিলেন তাঁদের নিজেদেরই খেয়াল ছিল না। সবে ভোর হয়ে আসছে, হঠাৎ নৌকো আটকে গেল। সবাই ভয়ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে দেখলেন—আর উপায় নেই নৌকো চড়ায় আটকে গেছে।

ওদিকে নদীর দুধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সম্রাটের সৈন্য। ভোরের আলো আরও স্পষ্ট করে ফুটে বেরোবার পর বেশ কিছু সৈন্য নৌকোয় আর হাতীর পিঠে চেপে নদীর জলে নেমে পড়ল।

তারপর যা হবার হল।

খসরু আর তাঁর সঙ্গীরা বিনা বাক্যব্যয়ে ধরা দিলেন।

জাহাঙ্গীর তখন লাহোরে। সেখানে বসেই তিনি খবর পেলেন, তাঁর ছেলে আর ছেলের বন্ধুরা ধরা পড়েছে।

'লড়াই ফতে করাটা ফুলের পাপড়ি শোঁকা নয়—হতভাগাটার সে বুদ্ধি নেই—গেছেন আমাকে চোখ রাঙাতে'।

জাহাঙ্গীরের নিজের মুখখানাও রাঙা টকটকে হয়ে উঠল।

শরিফ খাঁকে ডেকে হুকুম দিলেন—'যাও, নিয়ে এস হতভাগা তিনটেকে, হাজির কর দরবারে—'

শুধু রাগে নয়, গভীর দুঃখেও জাহাঙ্গীরের চোখে জল এল।

বাপকে এমন করে দুঃখ দেওয়া!

সিংহাসনে বসে বোধহয় জাহাঙ্গীর সেলিমকে একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন—যে-সেলিম অমন বাপ আকবরকে শেষ জীবন পর্যন্ত স্নেহাই দেন নি, মৃত্যুশয্যাতে শুয়েও যিনি চারিদিকে শুধু ষড়যন্ত্রের বিভীষিকা দেখেছিলেন।

শরিফ খাঁ বন্দী তিনজনকে নিয়ে এলেন। জাহাঙ্গীর রাজোচিত গাম্ভীর্যে এক দরবার ডাকলেন—দরবারে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী উজীর সেনাপতি বসেছিলেন, মাঝখানে সিংহাসনের ওপর বসেছিলেন জাহাঙ্গীর—গম্ভীর থমথমে মুখ, গোটা দরবার ঘরটাই থমকে আছে। কারও মুখে কথা নেই। নিশ্বাস আটকে সব বসে আছে। এক্ষুণি বন্দী তিন জনকে নিয়ে আসা হবে। তাঁদের অদৃষ্টে কি শাস্তি লেখা আছে কে জানে!

নিয়ে আসা হল শাহ্‌জাদা খসরুকে, হাতে হাতকড়া, নড়াচড়ার শক্তিও শেকল দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

বেচারী খসরু! কতটুকুই বা তাঁর বয়েস। প্রাণে এখনও, বলতে গেলে, সত্যিকারের বল-ভরসা আসে নি। বাপের রক্তচক্ষুর সামনে এসে ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছেন, চোখের জলে মুখ ভেসে যাচ্ছে।

খসরুর ডান দিকে হুসেন বেগ, বাঁ দিকে আবদুব রহিম। তাঁদেরও শেকল দিয়ে বেঁধে ঐ একই অবস্থা।

জাহাঙ্গীর ছেলেকে একেবারে বিঁধে বিঁধে বকলেন—লজ্জা করে না, কুপুত্রের মতো ব্যবহার করা! বিশ্বাসঘাতক বেইমান!—

হুসেন বেগ কি যেন পরিষ্কার করে বোঝাবার চেষ্টা করতে গেলেন জাহাঙ্গীরের প্রচণ্ড ধমকে একেবারে চুপ।

জাহাঙ্গীর বজ্রকণ্ঠে আদেশ দিলেন, খসরুকে নিয়ে যাওয়া হোক বন্দীঘরে, তারপর দেখা যাবে···।

এবার জাহাঙ্গীর তাকালেন হুসেন বেগ আর আবদুর রহিমে দিকে। জাহাঙ্গীরের মুখে মৃদু হিংস্র কৌতুকের হাসি খেলে গেল। তিনি দুজনের শাস্তির বিধান দিলেন।

সে শাস্তি অভিনব, অভাবনীয়।

একটা মৃত ষাঁড়ের গোটা কাঁচা চামড়া খুলে নিয়ে তার মধ্যে হুসেন বেগকে ঢুকিয়ে চারদিক বেশ ভাল করে সেলাই করে দেওয়া হল। আর আবদুর রহিমকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল এটা গাধার খোলসের মধ্যে। তারপর তাঁদের উঠিয়ে দেওয়া হল দুটো গাধার পিঠে, তাও ঠিকভাবে নয়—লেজের দিকে মুখ ক'রে। সেই অব শোভাযাত্রা করে দুজনকে লাহোরের রাস্তায় ঘোরানো হল।

চারদিকে সেলাইকরা মৃত জন্তুর কাঁচা চামড়ার মধ্যে হুসেন বেগ আর আবদুর রহিম শুধু বলেছিলেন—একটু বাতাস, এ হাওয়া—বুকটা যে পাথরের মতো ভারী হয়ে উঠেছে।

প্রায় ঘণ্টাবারো যুঝে লেন হুসেন বেগ—একটু বাতাস, খোল আকাশের একমুঠি হাওয়া।

পশুর দেহের মধ্যে একটি আস্ত মানুষের জ্যান্ত কবর হল। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে হুসেন বেগ মারা গেলেন বারো ঘণ্টার মধ্যে।

আবদুর রহিম ভুগেছিলেন চব্বিশ ঘণ্টা। হাঁপাচ্ছিলেন তিনিও। কিন্তু তাঁর ভাগ্যক্রমে কয়েকজন বন্ধুর গোপন চেষ্টায় তাঁর নিশ্ছিদ্র কষ্টে একটু ফাঁক ছিল—ফলে আবদুর রহিম মারা যান নি। উপরন্তু ঐ বন্ধুদেরই চেষ্টায় সম্রাট আবদুর রহিমকে ক্ষমা করেছিলেন, তাঁকে আবার পুর্ব মর্ষাদায় বহাল করেছিলেন;

এর দিন কয়েক পরে সম্রাটের আদেশে একটা দীর্ঘ রাস্তার

দুপাশে সাত শ' শূলদণ্ড পুঁতে দেওয়া হল। তাতে বিদ্ধ করা হল খসরুর সাত শ' বিদ্রোহী অনুচরকে।

মরণাতীত যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বিদ্রোহীরা সেদিন শুধু মরণকেই ডেকেছিল—মরণ, একটু তাড়াতাড়ি।

মরণ এসে তাদের চেতনাকে নিকষ গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে দিক—

মরণ, তাড়াতাড়ি, আরও তাড়াতাড়ি।

সাত শ' লোকের রক্তাক্ত যন্ত্রণায় সেদিন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল মানুষের ইতিহাস, সাম্রাজ্য ও সভ্যতার কাহিনী।

কিন্তু কিছুই হয় নি।

তাইতো মজাটা কেমন হয় দেখার জন্য জাহাঙ্গীর খসরুকে হাতীর পিঠে চাপিয়ে সেই রক্তমাখা রাস্তায় একটু বেড়িয়ে আনার হুকুম দিলেন।

দুপাশে পৈশাচিক শাস্তির নমুনা দেখে স্তব্ধ ব্যথায় মুহ্যমান হয়েছিলেন খসরু।

এর ওপর আবার সম্রাটের শ্লেষবাক্য—'এই দেখ তোমার অত্যন্ত অনুগত সঙ্গীর দল। এদের আনুগত্যে তোমার জীবন ধন্য হোক, হোক।'

কথা নয়, বর্শার ফলা।

চোখের জল বাগ মানে নি।

—খসরু কয়েকদিন শুধু কেঁদেছিলেন। ম্লান কালো বিষণ্ণতার ছায়ায় ঢেকে গিয়েছিল তাঁর অতি সুন্দর সুকুমার মুখখানা—এমুখে আর কখনও আগের ঔজ্জ্বল্য ফিরে আসে নি।

এবার শিখগুরু অর্জুনের পালা। পাণ্ডিত্য, আধ্যাত্মিকতা, চিন্তার গভীরতায় অর্জুনের চরিত্র ছিল সর্বজনশ্রদ্ধেয়।

কিন্তু কি সাহসে তিনি বাপের বিদ্রোহী ছেলেকে টাকা দিয়ে সাহায্য করলেন? হতে পারে সামান্য টাকা। তবু এ দোষের ক্ষমা নেই।

জাহাঙ্গীর অর্জুনের কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করলেন। শিখগুরু অর্জুন মাথা নোয়ান নি। তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, মহান আকবরের কথা স্মরণ করেই খসরুকে তিনি টাকা দিয়েছেন। তিনি খসরুর যাত্রাপথকেই শুধু সুগম করতে চেয়েছিলেন—পিতার বিদ্রোহী হিসেবে তো তাকে তিনি টাকা দেন নি।

শোনা যায় জাহাঙ্গীর অর্জুনের কাছ থেকে জরিমানা হিসেবে দুলক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন।

জরিমানা দেওয়ার কথায় অর্জুনের মন গর্জে উঠেছিল—'আমার কাছে যে টাকা আছে, সবই গরীব দুঃখী অসহায়ের জন্য। আমার কাছে জরিমানা হিসেবে টাকা দাবি করলে একটা কড়িও দেবো না।'

শুধু জরিমানা নয়, জাহাঙ্গীর নাকি অর্জুন রচিত 'গ্রন্থসাহেবে'র কিছু অংশ পাল্টাতে বলেছিলেন। বলা বাহুল্য অর্জুন সম্রাটের প্রস্তাবকে একেবারে অগ্রাহ্য করেছিলেন। তার পরে যা পরিণতি ঘটবার ঘটল। বন্দীশালায় অর্জুনের দেহের ওপর কয়েকদিন ধরে চলল অকথ্য অত্যাচার, তারপর হল মৃত্যুদণ্ড! অতবড় একটা প্রাণ এইভাবে শেষ হয়ে গেল।

শিখ সম্প্রদায়। এই আঘাতে মুহ্যমান হয়ে পড়ল, ক্ষুব্ধ হল একটা বিশিষ্ট সংহত সম্প্রদায়। এর পরিণতি খুব ভাল হয় নি।

জাহাঙ্গীরের প্রচণ্ড রাগের এমনই নমুনা ১৬০৫ থেকে ১৬২৭-এর ইতিহাসে বেশ কয়েকবার দেখা গেছে।

শুধু ১৬০৫ থেকে ১৬২৭ কেন—তার আগে জাহাঙ্গীর যখন সেলিম ছিলেন—তখনও দেখা গেছে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত এক খোজা প্রহরী ও অপর দুজন কর্মচারীকে যে শাস্তি দিয়েছিলেন তাও কত পৈশাচিক, কত ভয়াল। তিন জনকে তিন রকম শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। একজনকে পিটিয়ে পিটিয়ে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখান হয়েছিল, একজনকে পুরুষত্বহীন করে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছিল, আর একজনের জীবিতাবস্থায় গা থেকে চামড়া তুলে নেওয়া হয়েছিল।

সেলিম এই দৃশ্য নিজের চোখে দেখেছিলেন, শুধু তাই নয়—উপভোগ করেছিলেন।

আকবর এ খবর শুনে শিউরে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, তিনি একটা মৃত ছাগলের দেহ থেকে চামড়া ছিঁড়ে নেওয়া দেখতে পারেন না, তাঁর ছেলে কি করে সেই শাস্তি একজন জীবিত মানুষের ওপর প্রয়োগ করতে পারে!

অথচ এই সেলিমই সম্রাট হয়ে পরে বলেছিলেন 'শুধু একটু মদ আর মাংস—আর আমি কিছু চাই না, রাজ্য নয়, শাসন নয়…'

যখন তিনি একথা বলেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন যন্ত্র, তাঁর আড়ালে ছিলেন যন্ত্রী—বিরাট ব্যক্তিত্বেভরা এক মোহিনী মায়া। রাজ্যের সব কিছু ছিল তাঁর আজ্ঞাধীন। জাহাঙ্গীর শুধু মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মতো তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

ইতিমধ্যে অন্য আর এক বিপদ দেখা গেল—বিপদটা এল কান্দাহার থেকে।

গোটা মধ্যযুগে কান্দাহারের গুরুত্ব ছিল সব চাইতে বেশি। মধ্য এশিয়া, তুর্কী, পারস্য ও ভারতবর্ষ—এদের বিরাট ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেনের কেন্দ্র ছিল এই কান্দাহার। বাণিজ্যিক গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গিয়েছিল সামরিক গুরুত্ব। একদিকে পারস্য, অন্যদিকে ভারতবর্ষ—এই দু'দেশেরই সীমান্ত-নীতির লক্ষ্য ছিল এই কান্দাহার। সুতরাং এর ভৌগোলিক অবস্থানও লক্ষণীয়।

১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে কান্দাহার এল আকবরের হাতে। ১৫৯৫ থেকে ১৬০৫ পর্যন্ত কান্দাহার মুঘলদের হাতেই ছিল। কিন্তু আকবরের মৃত্যু আর তার অল্প কিছু দিনের মধ্যে খসরুর বিদ্রোহ এক পরম সুযোগ এনে দিলে পারস্য সম্রাট শাহ্ আব্বাসের কাছে। বলতে

গেলে কান্দাহার হারানোর পর দিন থেকেই তিনি এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। কারণ তিনি জানতেন কান্দাহার হাতে না থাকা মানে রাজ্যের একটি পাশ ভেঙে থাকা—আর ঐ ভাঙা দরজা দিয়ে রাজ্যের বিপদ ঢুকতে বেশি দেরি লাগবে না। তাই আকবরের মৃত্যু আর খসরুর ঐ ব্যাপারটায় শাহ্ আব্বাস উল্লাসে একেবারে তড়বড়িয়ে উঠলেন। তিনি নিজে অবিশ্যি তখন তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। তবু কয়েকজন সেনাপতি, গভর্নরদের ইঙ্গিত করলেন, কান্দাহার উদ্ধারের এই সুযোগ।

ওদিকে কান্দাহারের দুর্গাধ্যক্ষ শাহ্‌বেগ খাঁ কিন্তু আগের থেকেই সব টের পেয়েছিলেন, ফলে আটঘাট বেঁধে বসে ছিলেন। পারসী সেনাবাহিনী কান্দাহারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বটে, কিন্তু সাধ্য কি শাহ্‌বেগকে দমিয়ে দুর্গ জয় করে!

এর ওপর যখন খবর এল জাহাঙ্গীর এক বিরাট সৈন্যদল পাঠাচ্ছেন কান্দাহারের দিকে—তখন কোথায় দুর্গ, কোথায় কি? সব একেবারে চোঁ-চাঁ ছুট।

এমন কি শাহ্ আব্বাসের মতো লোক পর্যন্ত জাহাঙ্গীরের কাছে বলে পাঠালেন—'বিশ্বাস করুন—আমি এ ব্যাপারে একেবারে নেই। আমাকে না জানিয়ে এসব হয়েছে, সম্রাট যেন একটু ক্ষমা-ঘেন্না করে নেন···।'

জাহাঙ্গীর একথা মেনেই নিলেন। এই নিয়ে বেশী ঘোঁট পাকালেন না। কান্দাহারকে একটু কড়া পাহারায় রাখলেন। যাই হোক ১৬০৭ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকেই কান্দাহারের ব্যাপারটা মিটে গেল।

কান্দাহারের ব্যাপারটা আবার আসবে পনের বছর পরে। তখন জাহাঙ্গীরের রাজত্ব অনেক দূর গড়িয়েছে। কান্দাহার আরও গড়িয়ে দেবে।

এর পরেই সম্রাট সপরিবারে ও সদলবলে চলে গেলেন কাবুলে।

বড় সুন্দর জায়গা এই কাবুল। পাহাড় আছে, পর্বত আছে, আর তার গা বেয়ে ঝর্ণা নেমে দুরন্ত পাহাড়ী নদী বয়ে গেছে। এর ওপর ফলফুলের বাগান, তাতে জল দেবার জন্য সুন্দর খাল, তার সঙ্গে বাঁধ— এই সব কিছু দিয়ে সাজানো হয়েছিল কাবুল শহর। মুঘল রাজবংশের বড় প্রিয় ছিল এই কাবুল।

জাহাঙ্গীর কাবুলে মহা আনন্দে কয়েকমাস কাটালেন—বিশেষ করে শিকারের আনন্দটা সেখানে খুব বেশি রকমই হয়েছিল।

জাহাঙ্গীর এরপর ফিরে এলেন লাহোরে, ফিরে আসার পথেই শুনলেন তাঁর বিরুদ্ধে আবার ষড়্‌যন্ত্র হচ্ছে। এবার শুধু সিংহাসন থেকে নয়, একেবারে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা হচ্ছে, আর এই ষড়্‌যন্ত্রের মূলে সেই খসরু।

প্রথম বারে বিদ্রোহ দমন করে খসরুকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল লাহোরে। সেখানে যাঁদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন, তাঁরাই খসরুকে ঘিরে সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র পাকিয়ে তুললেন।

এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন নুরউদ্দিন, খোজা ইতবর খা. বাদাক তুর্কোমান আর ইতিমদ্-উদ্-দৌলার ছেলে শরীফ।

এছাড়া চারশ'র মতো লোক নিয়ে বেশ একটা দল তৈরি হল। আরও সুবিধে হল, যখন সম্রাট খসরুকে পায়ের শেকল খুলে দিয়ে স্বাধীনভাবে একটু বেড়িয়ে বেড়াবার হুকুম দিলেন।

ষড়্‌যন্ত্রকারীরা ঠিক করলেন, যখন সম্রাট শিকার করতে গিয়ে মেতে উঠবেন, তখনই তাঁকে মেরে ফেলা হবে।

সবই ঠিক, কিন্তু সবই বেঠিক হয়ে গেল।

এঁদের মধ্যে একজন গিয়ে সব কিছু চুপি চুপি ফাঁস করে এলেন খুররমের দেওয়ানের কাছে। দেওয়ান এসে বললে খুররমকে। খুররম লাফাতে লাফাতে গেলেন সম্রাটের কাছে।

খুররমের লাফানোর কারণ তো স্পষ্ট। হতে পারেন তিনি জাহাঙ্গীরের তিন নম্বরের ছেলে, কিন্তু শক্তির যোগ্যতা তাঁরই সব

চাইতে বেশি। এক্ষেত্রে প্রথমে খসরু, এর পর পরভেজ, তার পরেই তো…।

প্রথমটি খসলে দ্বিতীয়টি যেতে কতক্ষণ! সুতরাং যাকে বলে 'গ্যালপ' করা, ঠিক তেমনি করেই তিনি ছুটে গেলেন বাপের কাছে।

অন্যদিকে ইতিবর খাঁয়ের একবাণ্ডিল চিঠিও সম্রাটের হাতে পড়ল। সম্রাট শিউরে উঠলেন—একেবারে কাচের মতো স্বচ্ছ ষড়্‌যন্ত্র। কি সাংঘাতিক!

সম্রাট বুঝতে পারলেন রাজানুগত অনেক ভদ্রলোকই আসলে তাঁর বিরুদ্ধে। সুতরাং আর বেশি হৈ-চৈ না করাই ভালো। শুধু প্রধান চারজনকে ধরে আনা হল—নুরউদ্দিন, ইতিবর খান, শরীফ এবং বাদাক তুর্কোমান।

চারজনেরই প্রাণদণ্ড হল।

অমন যে ইতিমদ্‌-উদ্‌-দৌলা, তাঁকেও যেন কেমন সন্দেহ হল। কিছুদিন বন্দী অবস্থায় থেকে শেষ পর্যন্ত দু'লাখ টাকা জরিমানা দিয়ে তিনি ছাড়া পেলেন।

এবার প্রশ্ন এল—খসরুকে নিয়ে।

বিদ্রোহী ও ষড়্‌যন্ত্রকারী পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ব্যাপারে কারোরই মত ছিল না, না সম্রাটের, না আমীর ওমরাহ্‌দের। অন্তঃপুরের বেগমদের তো একেবারে অসম্মতি ছিল—অবশ্য সেখানে স্নেহের প্রশ্ন, দরবারের প্রশ্নটা ছিল রাজনৈতিক।

অত্যন্ত জনপ্রিয় রাজকুমারের মৃত্যুদণ্ড হলে রাজ্যের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হবেই। অথচ যেমন ছিলেন তেমনি যদি খসরুকে রেখে দেওয়া যায়—সে-ও তো জাহাঙ্গীরের পক্ষে একটা বিপদকে জিইয়ে রাখা হবে!

কি করা যায়?

রাজ্যের প্রধানদের উপদেশ-পরামর্শের জন্য একটা সভা ডাকা হল। তাতে নেতৃত্ব করলেন সেনাপতি মহাবৎ খাঁ, তিনিই পরামর্শ

দিলেন, এক কাজ করা যাক না কেন। খসরু বেঁচে থাকুন আপত্তি নেই, তবে সিংহাসনের ওপর তাঁর দাবি যাতে আর বৈধ না থাকে তার ব্যবস্থা করা যাক।

রাজনীতির আইন অনুযায়ী সিংহাসনের ওপর অন্ধজনের দাবি অবৈধ, অস্বীকার্য। মুঘলযুগে এই আইনের দৃঢ়তা ছিল অত্যন্ত বেশি। অতএব মহাবৎ খাঁ প্রস্তাব আনলেন—খসরুর দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়া হোক, তা হলে অন্ধ কুমারকে ভয় করবার মতো কিছু থাকবে না।

মুহূর্তের জন্য জাহাঙ্গীরের বাপের মন কেমন করে উঠল—খসরুর অমন সুন্দর মুখ, সুন্দরতর দুটি চোখ।

কিন্তু সিংহাসন!

সিংহাসন যে সুন্দরতম।

এত বড় সাম্রাজ্যের মোহকে কখনও এড়ানো যায়?

জাহাঙ্গীর সম্মতি দিলেন।

দুটি পদ্মচোখে তীক্ষ্ণ লোহার তার বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল। খসরুর কণ্ঠ চিরে একটা তীব্র আর্তনাদ পাথরের দেওয়ালে আছড়ে পড়েছিল।

অন্ধ খসরু চিরকালের জন্য বন্দী হয়ে গেলেন।

খসরুর এই দুর্ভাগ্য, এই বেদনায় তাঁর ওপর জনসাধারণের স্নেহ-সহানুভূতিকে আরও উদ্বেল করে তুলল।

খসরু এত জনপ্রিয় ছিলেন যে, ১৬১০ খ্রীস্টাব্দে বিহারে কুতুবুদ্দিন নামে এক ব্যক্তি হঠাৎ ঘোষণা করে বসল, সেই নাকি খসরু। এমন কি নিজের দুচোখে ক্ষতের চিহ্ন দেখিয়ে বলল, তাকে যে অন্ধ করা হয়েছিল এ তারই চিহ্ন।

যাঁহাতক এই কথা বলা, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘিরে এক বিরাট দল গড়ে উঠল। কুতুব সদলবলে এগিয়ে গেল বিহারের রাজধানী পাটনার দিকে। তখন সেখানকার সুবাদার আবদুর রহমন খাঁ উপস্থিত ছিলেন না। রাজধানীর দায়িত্ব ছিল বকশী সেখ বেনারসী আর

দেওয়ান মির্জা গিয়াসা-এর ওপর। কুতুবের আচম্‌কা আক্রমণে দুজনে এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, রাজ্য রক্ষা করা দূরে থাক—পেছনের ছোট্ট একটা কাটা দরজা দিয়ে গঙ্গানদীতে নৌকো ভাসিয়ে এরা একেবারে 'দে-ছুট'।

এদিকে কুতুব পাটনা দুর্গ জয় করে ধনরত্ন সবকিছু অধিকার করে নিল। প্রচুর লোক তার দলে এল। বলতে গেলে গোটা শহরটাই তার হাতের মুঠোয় এসে গেল।

তবে মাত্র এক সপ্তাহের জন্য।

ইতিমধ্যে আবদুর রহমন খাঁ সব শুনে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলেন, সঙ্গে একদল সশস্ত্র সৈন্য। আশ্চর্য, কুতুব অদ্ভুত সাহসের সঙ্গে রুখে দাঁড়ালো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুতুবেরই পরাজয় হল; সে ধড়া পড়ল, শাস্তিও হল—ঘাতকের হাতে প্রাণ গেল।

এবার এল শেখ বেনারসী আর মির্জা গিয়াসের পালা।

জাহাঙ্গীর নিত্য নতুন পদ্ধতিতে শাস্তি দিয়ে আনন্দ পেতেন। এবারে পেলেন এমন দুটি লোককে যারা শত্রুর ভয়ে, তাদের বিন্দুমাত্র বাধা না দিয়ে, মেয়েমানুষের মতো পালিয়ে গিয়েছিল।

এই ব্যাপারের সঙ্গে মিল রেখেই তাদের শাস্তি দেওয়া হল।

বেশ করে তাদের মাথা মুড়িয়ে দাড়ি কামিয়ে দেওয়া হল, তারপর দুজনকে দুটো শাড়ি পরিয়ে উল্টো গাধার পিঠে চাপিয়ে শহরময় ঘোরানো হল। সবাইকে সাবধান করা হল, দেখ—পুরুষের মতো আচরণ না করলে সেই পুরুষের কি দশা হয়, দেখ।

খসরুর জনপ্রিয়তার এই হল নমুনা। দলে দলে লোক এসেছিল কুতুবের টানে নয়, খসরুর টানে।

তবে আসলে খসরু একেবারে অন্ধ হয়ে যান নি। তার বেঁধানোর পরেও দৃষ্টিশক্তি সামান্য অবশিষ্ট ছিল। তাই দেখে জাহাঙ্গীর চক্ষু-চিকিৎসকদের দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে খসরুর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনার বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। ফলে খসরুর একটা চোখ

চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে গেলেও আর একটা চোখে সামান্য দেখতে পেতেন।

আর সামান্য একটু দেখতে পেতেন বলেই খসরু ইতিহাসের জটিলতার সঙ্গে আরও জড়িয়ে গেলেন…

এবারে আসবেন আর একটি মানুষ, সম্রাট বা রাজপ্রাসাদের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক থাকলেও খুব কিছু একটা দহরম মহরম ছিল না—তবু তিনি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছেন মুঘল ইতিহাসের সঙ্গে। যত ছোট করেই হোক না কেন, মুঘল সাম্রাজ্যের সম্পদ-বিভবে ভরা ইতিহাসের এক কোণে তাঁকে স্থান দিতেই হবে, তাঁকে চিনে রাখতেই হবে।

মানুষটির নাম আলিকুলি বেগ ইস্তাজ্‌লু।

গিয়াস বেগের মতো আলিকুলি বেগ-ও ভাগ্যান্বেষণে পারস্য থেকে হিন্দুস্থানে এসেছিলেন। তাঁরও পথে পড়েছিল সেই কান্দাহার। আলিকুলি পারস্যরাজ শাহ্ দ্বিতীয় ইসমাইলের 'সফরচি' বা স্টুয়ার্ড ছিলেন—যাকে বলা যায় স্টোর-ইন-চার্জ, রাজবাড়ির ভাণ্ডারী। অবশ্য অনেক বইয়েই তাঁকে 'টেব্‌ল্ অ্যাটেণ্ড্যান্ট' বলা হয়েছে—অর্থাৎ খাবার পরিবেশনকারী। ডক্টর বেণীপ্রসাদের মতে আলিকুলি সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে ছিলেন।

যাই হোক, তিনি হিন্দুস্থানে এসে প্রথম গেলেন মুলতানে। সেখানে তখন ছিলেন মুঘল সেনাপতি আবদুর রহিম খানখানা। বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন তট্টা অধিকার করতে।

আলিকুলি এই সেনাবাহিনীতে নাম লেখালেন। তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক দেহসৌষ্ঠব, পৌরুষ-ব্যক্তিত্ব, কর্মদক্ষতা ও ধীর বুদ্ধিতে আবদুর রহিম মুগ্ধ হলেন, তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। যুদ্ধশেষে তাঁকে নিয়ে এলেন লাহোরে, উঁচুমহলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সে বছরটা ছিল ১৫৯৪ খ্রীস্টাব্দ—আলিকুলির জীবনের স্মরণীয় বছর। এই বছরেই তো আলিকুলির জীবনে এল বসন্তের হাওয়া—এলেন মেহেরউন্নিসা। সতের বছরের মেয়ে মেহেরউন্নিসার সঙ্গে বিয়ে হল আলিকুলি বেগ ইস্তাজ্‌লুর।

মেহেরউন্নিসার প্রতি অঙ্গে তখন রূপের বহ্নি, গভীর দুটি নীল চোখে বিদ্যুৎ-কটাক্ষ—মনে তাঁর স্বপ্নবাসর।

কোন্ শিশুবয়েস থেকে আগ্রার লাল কেল্লার সঙ্গে মেহেরউন্নিসার নিগূঢ় পরিচয়। বাবার কর্মস্থল—রাজপ্রাসাদ। ভাইয়েরও তাই—মা আসমৎ বেগম রাজপ্রাসাদে মেয়ের হাত ধরে ঘনঘন আনাগোনা করবেন, এ তো অতি সোজা কথা। আর স্বাভাবিক নিয়মেই মেয়ে বড় হবে, উচ্ছল হবে, আসা যাওয়ার পথে তার রূপের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়বে, এতে আর আশ্চর্য কি! তা ছাড়া রূপবতী মেয়েকে গুণবতী করতেও তো আসমৎ বেগম কিছু কসুর করেন নি। তাই মেহের-উন্নিসা অল্প বয়সেই অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছিলেন সাহিত্যে, চিত্রবিদ্যায়, সঙ্গীত ও কবিতা রচনায়। মেধার সঙ্গে মিলেছিল ক্ষুরধার চাতুর্য, কল্পনার সঙ্গে বাস্তব, সৌন্দর্যের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা······।

অন্যদিকে রাজকুমার সেলিম ছিলেন প্রেমিক, সৌন্দর্যের পূজারী, তিনিও ছিলেন কবি, শিল্পী। তিনি নাকি দেখেছিলেন কুমারী মেহেরউন্নিসাকে, তাঁর রূপে উন্মত্ত হয়ে তাঁকে কাছে টেনেছিলেন।

কত গল্প-কাহিনীই না গড়ে উঠেছে সেলিম-মেহেরউন্নিসার প্রথম সাক্ষাৎ, আর তাঁদের প্রাক্‌বৈবাহিক রোমান্স্ নিয়ে। নানা মুনির নানা মতে এই গল্প সপ্তধারায় সাত দিকে বয়ে গেছে···।

সেলিম নাকি মেহেরউন্নিসাকে প্রথম দেখেছিলেন গিয়াস বেগের বাড়িতে।

মেহেরউন্নিসার তখনও আলিকুলির সঙ্গে বিয়ে হয় নি।

গিয়াস সেলিমকে নিজের বাড়িতে একদিন সাদর নিমন্ত্রণ জানালেন। সেলিম গিয়াস বেগের বাড়িতে এলেন, গিয়াসের সেদিন

আনন্দ-উৎসব, খুশীর ফোয়ারা···। সবাই বসে আছেন, সামনে ফেনোচ্ছ্বসিত রক্তিম পানীয়, রক্তিম আভা সকলের মুখে।

মাঝখানে বসেছিলেন নিমন্ত্রিত-প্রধান শাহ্‌জাদা সেলিম।

উৎসবের শেষে গিয়াস বেগের ইঙ্গিতে উৎসব-মণ্ডপে একে একে প্রবেশ করলেন বাড়ির মেয়েরা, নিমন্ত্রিত অভ্যাগতারা। এর মধ্যে একজন ছিলেন মেহেরউন্নিসা। স্বচ্ছ গাত্রাবরণে আচ্ছাদিত সুঠাম দেহ, শঙ্খশুভ্র মুখ, কুঞ্চিত কেশদাম, মাথার ওপর দিয়ে নেমে এসেছে উর্ণনাভ সদৃশ অবগুণ্ঠন—তার আড়ালে দুটি চোখে, নীল আলো মাখানো দুটি পদ্মপাপড়ি···।

সেলিম সোজা হয়ে বসলেন—কে!

নিঃস্পন্দ, নিস্পলক সেলিম হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন অবগুণ্ঠনবতী সুন্দরীর দিকে।

মেহেরউন্নিসা গান করলেন। গানের মূর্ছনায় স্বপ্নের ছায়া নেমে এল সেলিমের চোখে।

মেহেরউন্নিসা নাচলেন। নাচের লীলায়িত ভঙ্গিমায় দোলা লাগল সেলিমের মনে।

তাল, লয় আর পানীয়ের রক্তিম আবেশে বিভোর হয়ে উঠলেন সেলিম।

মেহেরউন্নিসা উল্লসিত হলেন। তামাম হিন্দুস্থানের ভাবী সম্রাট সেলিমের চোখে পূর্বরাগের ইন্দ্রধনু। আর একটু শুধু বাকি, তাহলেই মেহেরউন্নিসা হবেন বিজয়িনী, সেলিম হবেন পরাভূত।

মেহেরউন্নিসার মুখের ওড়না-খানা কেমন করে যেন হঠাৎ পড়ে গেল মাটিতে। মরালগ্রীবা সামান্য বাঁকিয়ে মেহেরউন্নিসা পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন সেলিমের দিকে। তাঁর চোখে চোখ রাখলেন।

শাহানশাহ্ আকবরের উত্তরাধিকারীকেই যদি জয় না করা যায়, তবে বৃথা এ যৌবন, বৃথা সঙ্গীত নৃত্যের সাধনা।

সেলিম মনপ্রাণ দিয়ে এ পরাজয় মেনে নিলেন।

মেহেরউন্নিসার মুখে হাসির ঝলক নেমে এল।

এর পর সেলিম বাবার কাছে আর্জি নিয়ে দাঁড়ালেন, 'মেহেরকে আমি বিয়ে করতে চাই···'

সেলিমের প্রস্তাব শুনে আকবর তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন—'এসব বেয়াড়াপনা কোন যুবরাজকে মানায় না। জান না, তুমি যাকে বিয়ে করার জন্য লাফাচ্ছ, তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে! সে আলিকুলির বাগদত্তা!'

আকবর বুদ্ধিমান ছিলেন, ব্যাপার বুঝে তিনি তাড়াতাড়ি মেহের উন্নিসা-আলিকুলির বিয়ে দিলেন। ছেলেটি ভাল, সদ্বংশের সচ্চরিত্র ছেলে, বীর ছেলে। মেয়ে থাকবে ভাল।

এর পরের কয়েকটি বছর ইতিহাসের সঙ্গে মেহেরউন্নিসার কোন যোগাযোগ ছিল না। আর পাঁচটা বাড়ির গৃহস্থ বৌয়ের মতোই তাঁর দিন কেটেছিল।

আলিকুলি-মেহেরউন্নিসার দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। শুধু আমাদের কল্পনায় এ দুটি চরিত্র ভেসে ওঠে···

বেহেস্তের পারিজাত মেহেরউন্নিসার দিকে তাকিয়ে আলিকুলির চোখের পলক পড়ে না, তাঁর সিংহ-হৃদয়ে অনুরাগের শিহরণ জাগে, অমৃতমন্থনের আশায় তিনি মেহেরউন্নিসার দিকে এগিয়ে যান, নিষেধ নেই; তবু দুজনের মাঝখানে কি যেন অদৃশ্য বাধা।

মেহেরউন্নিসা তাকিয়ে দেখেন স্বামীর শালপ্রাংশু বাহু, আর তাঁর ব্যূঢ়োরস্ক বক্ষের দিকে। স্বামীর ব্যক্তিত্বের গর্বে, চরিত্রের দৃঢ়তায় মেহেরের বুকেও আবেগের ঢেউ নামে।

সুকুমারী প্রকৃতির পরম কাম্য বীর্যবান পুরুষ, তার পূর্ণ প্রতীক আলিকুলি। মেহেরউন্নিসা এমন স্বামীকেই তো ভালবাসবেন, এমন স্বামীকেই তো সব কিছু সমর্পণ করে মেহেরের সুখ, তাঁর শান্তি।

কিন্তু রাজপ্রাসাদ কই! সিংহাসন কই!

কোথায় সেই সম্রাটের দম্ভ, সাম্রাজ্যের মহিমা!

মেহেরউন্নিসার বুকে আকাশছোঁয়া আকাঙ্ক্ষা বুদ্‌বুদ করে। সেই শব্দ নীরবে আঘাত করে আলিকুলিকে। আলিকুলি স্ত্রীর মধ্যে আর সেই চিরন্তনী প্রেয়সী নারীকে খোঁজার বৃথা চেষ্টা করেন না—তিনি কাছ থেকেও দূরে চলে যান।

মেহেরউন্নিসা বার বার চেষ্টা করেন স্বামীর প্রতি তাঁর অপার শ্রদ্ধা সম্ভ্রমকে পত্নীপ্রেমে প্রাণময় করে তুলতে, কিন্তু বাধা দেয় মনের উর্ধ্বগামী তীব্র আশা, মনের আয়নায় বার বার ছায়া ফেলে আগ্রার প্রাসাদ, সেই প্রাসাদের শক্তি—সেখানে শক্তিময়ী হবার তুর্নিবার লোভ···

এই কল্পনার দরকারই হত না, যদি ঐতিহাসিক-কাহিনীকারগণ নিজেদের মধ্যে মতের এত মারামারি না বাধাতেন। তাই গল্প অনেক দূর গড়িয়েছে।

বাপের বকুনি খেয়ে যতটা না হোক, মেহেরউন্নিসার সঙ্গে তাঁর কিছুতেই বিয়ে হবে না বুঝতে পেরে তুঃখে রাগে সেলিম সেদিন অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। মুখে কিছু বলতে পারলেন না বটে, কিন্তু অপমানে গা একেবারে জ্বলে গেল। কোথায় ভারতের ভাবী সম্রাট —তিনি পেলেন না সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা মেহেরউন্নিসাকে, পেল কিনা কোথাকার একটা উটকো লোক আলিকুলি! আচ্ছা, দেখা যাবে আখেরে কি ফল দেয়। প্রতিশোধ আমি নেবই।

সেলিম তুটি হাত শক্ত করে মুঠো করলেন।

বছরের পর বছর চলে যেতে লাগল, সেলিম কিছুতেই ভুলতে পারলেন না মেহেরউন্নিসাকে। ঐ রূপ কখনও ভোলা যায়?

আকবরের মৃত্যুর পর সেলিম সিংহাসনে বসলেন—নাম হল জাহাঙ্গীর। সম্রাট হওয়ার পরেই আবার সেই পুরানো প্রেম মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এবার প্রতিশোধ নেবার সুযোগ এসেছে।

জাহাঙ্গীরের মাথায় মতলবের পর মতলব খেলতে লাগল।

আলিকুলি তখন বাংলাদেশে—বর্ধমানে। সেখানে তিনি ছিলেন একজন জায়গীরদার। তবে ইতিমধ্যে তিনি নিজের হাতে একটি বাঘ মেরে 'শের আফকন' বা ব্যাঘ্রহন্তা উপাধি লাভ করেছিলেন। এখন থেকে আমরা আলিকুলিকে শের আফকন বলব।

শের আফকনের কাছে জাহাঙ্গীরের বার্তা নিয়ে লোক গেল······ 'ভায়া, শিকারে যাচ্ছি। তোমার শিকারের কসরতে আমরা মুগ্ধ। আশা করি তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে কসুর করবে না।'

শের আফকন এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

প্রচুর লোক লস্কর নিয়ে শিকারপার্টি ঘন বনের মধ্যে এগিয়ে গেল। সঙ্গে আছেন ঘোড়ার পিঠে শের আফকন।

হঠাৎ শিকারপার্টি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সামান্য কিছু দূরে সাক্ষাৎ যমের মতো বসে আছে মস্ত বড় এক ডোরাকাটা বাঘ। মানুষ-শত্রুর গন্ধ পেয়ে রাগে গরগর করছে আর মাটিতে লেজ আছড়াচ্ছে।

জাহাঙ্গীরের মুখে হাসির ঝিলিক খেলে গেল।

'তোমাদের মধ্যে এমন কে সাহসী আছ, যে এগিয়ে এসে ঐ হিংস্র পশুটাকে আঘাত করতে পার······!'

সকলে চুপ!

সম্রাটের এমন বেপরোয়া প্রস্তাবের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। একি একটা বেড়ালকে খোঁচা মারা যে গলা বাড়িয়ে 'কে আছ' বলে লোক ডাকা হচ্ছে! য-ত সব—।

সব চুপ চাপ।

জাহাঙ্গীর একটু ট্যারছা চোখে তাকালেন শের আফকনের দিকে। শের আফকন জানতেন জাহাঙ্গীর অমন করে তাঁর দিকে তাকাবেনই—

হঠাৎ দেখা গেল তিনজন হোমরাচোমরা লোক মারাত্মক সব অস্ত্র নিয়ে বাঘের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

শের আফকন হেসে উঠলেন, সম্রাটের কাছে গিয়ে বললেন—'বনের পশুর কাছে অস্ত্র নেই, তার দেহবলই বল। আপনার শিকারীদের বলুন—তাঁরাও যেন নিরস্ত্র হয়েই এগিয়ে যান, না হলে কিসের বীরপুরুষ!'

এ আবার কি ধরনের কথা রে বাবা!

তিন শিকারী মুখ চাওয়াচাওয়ি করে পিছিয়ে এলেন—দরকার নেই বাপু খালি হাতে যমের সঙ্গে লড়াই করে বীরপুরুষ বনবার।

'বাঘের সঙ্গে আমি লড়ব—লড়াই করব খালি হাতে—'

জাহাঙ্গীর হাতীর পিঠে হাওদার ওপর ছিলেন, শের আফকনের কথা শুনে আবার ট্যার্‌ছা চোখে তাঁর দিকে তাকালেন।

শের আফকন ইতিমধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাপড়-জামা ছেড়ে একেবারে পালোয়ান বনে গেছেন।

রবার্ট কাউন্টার শের আফকনের এই চেহারার বর্ণনা করেছেন 'Indian Apollo' বলে।

শের আফকনের সিংহবিক্রম চেহারা দেখে জাহাঙ্গীরের মনের চাপা রাগ যেন আরও ফুঁসে উঠল।

এবার আরম্ভ হল মানুষ-শেরের লড়াই—একদিকে মানুষের হুম্‌কি—অন্য দিকে পশুর গর্জন, একদিকে মানুষের বুদ্ধির প্যাঁচ, শারীরিক কৌশল—অন্য দিকে পশুর শক্তি, দাঁত আর নখের পরাক্রম।

দুই শেরের যুদ্ধে গুরুতর আহত হয়েও অবশেষে মানুষ-শেরই জয়ী হল। রক্তাক্ত শেরকে পালকি করে নিরপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল, আর আশ্চর্য, ওরকম আহত হয়ে মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত পৌঁছেও শের আফকন সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এত আশা করে এত কৌশলে জাহাঙ্গীর শের আফকনকে বাঘের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন—সেই আশায় একেবারে ছাই পড়ল!

শের আফকন মরলেন না, মেহেরউন্নিসাও এলেন না।

জাহাঙ্গীরের চাপা দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ভারী হয়ে উঠল। এর পর জাহাঙ্গীর আরও সব মারাত্মক কৌশল প্রয়োগ করলেন। যেমন একবার শের আফকনের যাত্রাপথে এক বিরাট হাতী ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু সে হাতী শের আফকনকে আক্রমণ করার আগেই শের তার ভয়াবহ শুঁড়টাকে কেটে দুখণ্ড করে ফেলেছিলেন।

এই ষড়্‌যন্ত্র ব্যর্থ হল।

এবার জাহাঙ্গীর পাঠালেন চল্লিশ জন সশস্ত্রলোকের একটি দল। একদিন গভীর রাতে তারা আক্রমণ করল শের আফকনের বর্ধমানের বাড়ি। শের আফকন জেগে লাফিয়ে উঠলেন, উঠেই দেওয়ালের দিকে পিঠ করে পিছিয়ে গেলেন। সামনে একটা কোচ উল্টে দিয়ে এদের একটু সামলালেন। তারপর শুরু হল 'বাহাদুরকা খেল্'—সাঁই সাঁই শব্দে তরোয়াল একবার এদিক একবার ওদিক ঘুরতে লাগল, খচাখচ লোক মরতে লাগল, কিছু আঘাত পেল, বাকি পালিয়ে গেল।

শের আফকন তবু বেঁচে রইলেন।

জাহাঙ্গীরের মনের রাগ আগুন হয়ে জ্বলতে লাগল।

······এই পর্যন্ত সত্যিই গল্প। তবে একটা কথা, শের আফকনের বীরত্বকে কেন্দ্র করেই যখন এই সব গল্প-উপকথা গড়ে উঠেছে, তখন তাঁর শারীরিক শক্তি ও যোগ্যতা সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ না থাকাই উচিত।

এবার আসবে ইতিহাস।

জাহাঙ্গীরের ওপর সব চাইতে প্রামাণিক গ্রন্থ লিখেছেন ডক্টর বেণীপ্রসাদ। মেহেরউন্নিসা-সেলিমের প্রাক্‌বিবাহ প্রেমকে তিনি একেবারে নিরাসক্তভাবে বাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ঐ যে আলিকুলির সঙ্গে বিয়ের আগে মেহেরউন্নিসার রূপে সেলিম পাগল হয়ে তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন, আর মেহেরউন্নিসার দিক থেকেও এই ব্যাপারে যথেষ্ট সমর্থন ছিল—ওটা একেবারে বাজে কথা। ১৬০৫

খ্রীস্টাব্দে সেলিম সিংহাসনে বসে যখন সম্রাট জাহাঙ্গীর হলেন, তার পরেও কয়েকবছর কেটে যাওয়ার পর ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে নওরোজের উৎসবে মীনাবাজারে তিনি প্রথম মেহেরউন্নিসাকে দেখতে পান, রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করেন। কারণ ইতিমধ্যে মেহেরউন্নিসার স্বামী শের আফকন নিহত হয়েছিলেন, মেহেরউন্নিসাকে নিয়ে আসা হয়েছিল মুঘল-হারেমে।

সুতরাং জাহাঙ্গীর-মেহেরউন্নিসার বিয়েটা বিয়েই, সাধারণ নিয়মে স্বাভাবিক বিয়ে, এর পেছনে পূর্বেকার কোন রোমান্স্ বা রহস্য ছিল না—এই-ই হল ডক্টর বেণীপ্রসাদের বহুচিন্তিত মত।

বেণীপ্রসাদ যে যুক্তি দেখিয়েছেন তাও প্রণিধানযোগ্য। যেমন, তিনি বলেছেন যে, যদি আকবরের জীবিতকালে মেহেরউন্নিসার বিয়ের আগে সেলিম ও মেহেরউন্নিসার মধ্যে মদনদেবের কোন হাত থেকেই থাকে—তাহলে সমসাময়িক কোন ইতিবৃত্ত বা কাহিনীতে তার নিশ্চয় উল্লেখ থাকত। বিশেষ করে তখন মুঘল দরবারে নানা বিদেশীদের ভিড়—তাদের মধ্যে কয়েকজন তো মুখিয়েই থাকতেন রাজবাড়ির কোন উপাদেয় তথ্য, কোন রিপোর্ট তাঁরা পান কিনা—একটু কিছু পেলেই তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিজেদের বিবরণীতে ঠাঁই দেবেন—দেশে লিখে পাঠাবেন! অথচ আশ্চর্য—এই ব্যাপারে এমন কেউ নেই যার বিবরণীকে সমসাময়িক বলে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।

ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে, ১৬০৭ খ্রীস্টাব্দে শের আফকনের হত্যাতে।

১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে সেলিম যখন মেবার অভিযানে গিয়েছিলেন তখন যুদ্ধে-অভিজ্ঞ সমরনিপুণ আলিকুলিও তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। এই মেবারেই তিনি খালি হাতে একটা বাঘ মেরেছিলেন বলে সেলিম সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর নামকরণ করেছিলেন শের আফকন······।

মেবার অভিযান চালানোর কিছু পরেই সেলিম আকবরের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। তখন শের আফকন সেলিমের পক্ষ ত্যাগ করে চলে আসেন আকবরের কাছে।

আকবরের মৃত্যুর পর সেলিমের হাতে ক্ষমতা এলেও দলত্যাগী শের আফকনকে তিনি কোনরকম শাস্তি তো দিলেনই না, উপরন্তু তাঁকে ফৌজদার ও জায়গীরদার করে পাঠিয়ে দিলেন বাংলাদেশের বর্ধমানে। সুতরাং শের আফকনের উন্নতির পথ যিনি পরিষ্কার করেছেন, তাঁর মনে শের আফকনের বিরুদ্ধে রোমান্স জনিত কোন রাগ ছিল বলে মনে হয় না।

এখানে একটু অন্য কথা বলা যাক। ভারতবর্ষে পাঠানশক্তিকে হারিয়ে দিয়ে মুঘলশক্তির পত্তন হয়েছিল। আকবরের দাপটে গোটা উত্তর ভারত কাঁপত। তবু তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের একটি জায়গায় একটা কাঁটা রয়ে গিয়েছিল। প্রায়ই সেটি খচ্‌খচ্‌ করে আকবরকে যন্ত্রণা দিত,—তাঁকে উত্যক্ত করত। সে কাঁটাটি ছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশে তখনও পাঠান শক্তি মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইত, আর তাদেরই পথ অনুসরণ করত বাংলার দুর্দান্ত ভুঁইয়ার দল। আকবর কত বার কাঁটার মুখ ভোঁতা করেছেন, তবুও বাংলার মাটি থেকে তাদের একেবারে উৎখাত করতে পারেন নি।

জাহাঙ্গীরের সময়েও প্রথম দিকে বাংলাদেশের অবস্থা ঐ একই রকম ছিল—ষড়্‌যন্ত্র সংঘর্ষ লেগেই থাকত। মানসিংহ বাংলাদেশে বেশ কিছু দিন সুবাদার ছিলেন। বাংলাদেশে তিনি যা হোক খানিকটা শান্তি আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৬০৬ খ্রীস্টাব্দে মানসিংহকে বিহারে বদলি করে সে জায়গায় জাহাঙ্গীর তাঁর দুধ-ভাই কুত্‌ব্‌-উদ্‌-দিন কোকাকে বাংলার সুবাদার করে পাঠালেন।

জাহাঙ্গীরের কাছে কুত্‌ব্‌-উদ্‌-দিন ছিলেন প্রিয় পুত্র, সহৃদয় ভ্রাতা এবং প্রাণের বন্ধু—যাকে বলা যায় friend, philosopher and guide—একেবারে দিলের দোস্ত।

এই প্রাণের বন্ধু কুতুব্-উদ্-দিনকে পাঠানো হল বিপদ-আশঙ্কায়-ভরা বাংলাদেশে। উপরন্তু শের আফকন সম্বন্ধেও জাহাঙ্গীর সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন—শের আফকন সেখানে রাজবিদ্রোহী-সুলভ কি সব নাকি করছিলেন। তাঁকেও একটু সম্‌ঝে দেওয়া দরকার।

শের আফকনকে মুঘলদরবারে পাঠানোর সমস্ত কর্তৃত্ব কুত্‌ব্-উদ্ দিনকে দেওয়া হল, এমন কি দরকার বুঝলে শের আফকনকে উচিত শাস্তি দেবার অধিকার ও কুত্‌ব্-উদ্-দিন পেলেন।

কুত্‌ব্-উদ্-দিন বাংলাদেশে এলেন। ক'দিন পরে বর্ধমানে গিয়ে তাঁবু গাড়লেন, শের আফকনকে ডেকে পাঠালেন তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য।

শের আফকন দুজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে সুবাদারের সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

শিবিরের প্রধান দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তিনি কুত্‌ব্-উদ্-দিনের কাছে যত এগিয়ে যেতে লাগলেন, স্পষ্টই বুঝতে পারলেন তাঁকে ঘিরে ফেলা হচ্ছে, শিবিরের সেনাবাহিনী তাঁর সম্বন্ধে যেন একটু বেশী তৎপর হয়ে উঠল।

শের আফকন বাতাসের গায়ে কি যেন এক আশঙ্কার ইঙ্গিত পেলেন—তাঁর শিরায় শিরায় গরম রক্ত বয়ে গেল, মাথায় আগুন জ্বলে উঠল।

বিস্মিত কণ্ঠে চীৎকার করে তিনি বলে উঠলেন, 'এ কেমন ব্যবহার! এর মানে কি!'

কুত্‌ব্-উদ্-দিন ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে এলেন, শের আফকন আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর বলিষ্ঠ হাতে শাণিত তরবারি ঝক্ ঝক্ করে উঠল, মরণ-আঘাত নেমে এল সামনে দাঁড়ানো কুত্‌ব্-উদ্-দিনের দেহে।

রক্তাক্ত মরণাতুর কুত্‌ব্-উদ্-দিন সেই অবস্থাতেই আদেশ দিলেন এর প্রতিশোধ নিতে।

কুত্‌ব্‌-উদ্‌-দিনের সঙ্গী-সাথীরা অবশ্য আদেশের অপেক্ষায় ছিল না, এর আগেই অম্বা খাঁ (মতান্তরে পীর খাঁ) নামে একজন সৈন্য প্রচণ্ড আঘাত হানল শের আফকনের মাথায়। অম্বা খাঁও সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর পেলো, মৃত্যুর আঘাতে লুটিয়ে পড়ল।

এর পরেই সব সৈন্য একপাল নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল শের আফকনের ওপর, টুকরো টুকরো হয়ে গেল উন্নতশির তুর্কীবীর মেহেরউন্নিসার স্বামী শের আফকনের সুদৃঢ় দেহ।

বারো ঘণ্টার মধ্যে কুত্‌ব্‌-উদ্‌-দিনেরও শেষ নিশ্বাস পড়ল।

এই সংবাদ গিয়ে পৌঁছলো জাহাঙ্গীরের কানে। দুঃখে আর ক্রোধে তিনি অস্থির হয়ে বলেছিলেন—'শয়তানটা নরকে পচে মরুক—ঐ ওর উপযুক্ত শাস্তি'—দাঁতে দাঁত ঘষে জাহাঙ্গীর সেদিন চাপা গর্জন করে উঠেছিলেন…।

শের আফকনের বিধবা স্ত্রী মেহেরউন্নিসা ও তাঁদের সন্তান মেয়ে লাড্‌লী বেগমকে নিয়ে আসা হল মুঘল প্রাসাদে। মেহেরউন্নিসা হলেন আকবরের বিধবাপত্নী জাহাঙ্গীরের অতি প্রভাবশালিনী বিমাতা সলিমা বেগমের সহচারিণী—'লেডি-ইন-ওয়েটিং'।

এইভাবে মেহেরউন্নিসা চার বছর কাটিয়েছিলেন, তারপর এসেছিল ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে নওরোজের রাত—সেদিন জাহাঙ্গীর মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন আলোর দীপ্তি মেহেরউন্নিসাকে, তাঁকে ভালবেসেছিলেন, মাস দুয়েকের মধ্যেই তাঁকে বিয়ে করেছিলেন।

জাহাঙ্গীরের আমলের পরবর্তী কাহিনীকার, কাফি খাঁ কিন্তু অত সহজে শের আফকনের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি শেষ করেন নি। প্রচুর রং চড়িয়ে পাঁচ রকম উপাদান দিয়ে তিনি তাঁর কাহিনী লিখে রেখে গেছেন।

তিনি বলেছেন, সেলিম ও মেহের ছোটবেলায় দুজন দুজনের খেলার সাথী ছিলেন। কালক্রমে দুজনে বড় হয়ে উঠলেন। সেলিম মেহেরের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দিলের সঙ্গিনী করতে চাইলেন। ঐ

দিলের আবেগেই তিনি একদিন মেহেরকে কাছে টেনেছিলেন। মেহের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন হারেমে বেগমদের কাছে, সেখানে সেলিমের এই ব্যবহারের কথা বলে দিয়েছিলেন।

একথা উঠল গিয়ে খোদ আকবরের কানে। আকবর ছেলেকে ডেকে খুব খানিকটা বকলেন, এবং এ বিয়ে যে হতে পারে না এ বিয়েতে যে তাঁর সম্পূর্ণ অমত, তাও জানিয়ে দিলেন।

যাই হোক, সেলিম কিন্তু মেহেরকে ভুলতে পারলেন না। তাই তিনি সম্রাট হয়ে কুত্‌ব্‌-উদ্‌-দিনকে বাংলার সুবাদার করে পাঠালেন —উদ্দেশ্য ছিল শের আফকনের কাছে প্রস্তাব করে মেহেরউন্নিসাকে ফিরিয়ে আনা।

শের আফকন আগেই এ ব্যাপারে আঁচ করতে পেরেছিলেন—অবস্থাটা বুঝতে পেরেই তিনি সরকারী কাজে ইস্তফা দিলেন।

কিন্তু এতে নিস্তার পেলেন না।

কুত্‌ব্‌-উদ্‌-দিন তাঁকে বারবার ডেকে পাঠাতে লাগলেন। কিন্তু শের আফকন দেখা করতে এলেন না। তখন কুত্‌ব্‌-উদ্‌-দিন নিজে সরকারী কাজের অছিলা করে বর্ধমানে শের আফকনের জায়গীরের অল্প একটু দূরে তাঁবু গাড়লেন। সেখানে গিয়ে ডেকে পাঠাতে শের আফকন দেখা করতে গেলেন, তবে জামার নিচে বর্ম ও তরবারি নিয়ে গিয়েছিলেন। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় শের আফকনের মা নাকি বলেছিলেন, 'বাছা, তোমার মা কাঁদবার আগে তোমার শত্রুর মায়ের চোখে যেন জল নামে···!'

শের আফকন গেলেন। কুত্‌ব্‌-উদ্‌-দিন মিষ্টি হেসে তাঁর সঙ্গে কত ভাল ভাল কথা বললেন, তারপর আসল কথা ভাঙলেন—

'বাদশাহের হুকুম, মেহেরকে ফিরিয়ে দাও, মেহেরকে বাদ দিয়ে তাঁর জীবন অন্ধকার, মেহেরকে তাঁর চাই-ই···'

'বটে! স্পর্ধার এতটা সীমা ছাড়িয়েছেন সম্রাট!'

রাগে শের আফকনের মুখে আর কোন কথা সরল না—শুধু

তরবারিটা আমূল গেঁথে দিলেন কুত্‌ব্‌-উদ্‌-দিনের পেটে। সঙ্গে সঙ্গে কুতুবের অনুচররাও হুমড়ি খেয়ে পড়ল শের আফকনের ওপর। শের আফকন সাংঘাতিক আহত হয়েও রক্তাক্ত দেহে নিজের বাড়ির দোরগোড়ায় ছুটে গেলেন—পাছে মুঘল সম্রাট জোর করে স্ত্রী মেহেরউন্নিসাকে কেড়ে নিয়ে যান মুঘল হারেমে, পাছে অমর্যাদা হয় শের আফকনের বংশমর্যাদার! তার চাইতে নিজের হাতে স্ত্রীর জীবনের অবসান ঘটানো শ্রেয় মনে করে ঐ অবস্থাতেও তিনি বাড়িতে ছুটে গিয়েছিলেন।

বাড়িতে শাশুড়ী ছিলেন। তিনি নাকি জামাইকে ওভাবে আসতে দেখে এবং তাঁর মারাত্মক মনোভাব আঁচ করতে পেরে আগে ভাগে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তারপর ভেতর থেকে কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন—'তুমি নাকি মরে গেছ একথা শুনে মেয়ে আমার কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। তুমি আর ভেতরে এসে কি করবে বাবা! তুমি বাইরে থেকেই তোমার আঘাতের চিকিৎসা করাও গিয়ে…'

এই নিদারুণ সংবাদে শের আফকন সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন।

পাহাড়ী নদীর মতোই গল্পের ঢল নেমেছে। আর কয়েক বছর পরে এ কাহিনী লেখা হলে শুধু শুধু শাশুড়ী কেন, বোধ করি শ্বশুর শালা সবাই ভেতর থেকে শের আফকনের সঙ্গে কথা বলতেন।

একদিকে কঠিন নীরস ও নিছক ইতিহাস, অন্যদিকে বিভিন্ন কাহিনীকারদের লেখা নানান রঙে রঙিন-হয়ে-ওঠা রোমাঞ্চকর গল্প—এই দুইয়ের মাঝখানে ঐতিহাসিক ভারসাম্য রাখা সহজ নয়। সেলিম-মেহেরের রোমান্টিক গল্প, শের আফকনের হত্যা, সকন্যা মেহেরউন্নিসাকে নিয়ে আসা, তারপর জাহাঙ্গীর-মেহেরউন্নিসার বিয়ে—এর প্রতিটি ঘটনা নিয়ে এক একটি বড় পরিচ্ছেদ হতে পারে।

বেণীপ্রসাদ কতকগুলি পরিষ্কার কথা বলেছেন। তার মধ্যে প্রথমটি হল যে, জাহাঙ্গীর-নূরজাহানের মধ্যে কোন পূর্ব-অনুরাগ ছিল না। তিনি বলেছেন, সমসাময়িক ফার্সী এবং বিদেশী কোন বিবরণেই এই রোমান্সের উল্লেখ নেই, এর উল্লেখ রয়েছে পরবর্তী যুগের বিবরণীতে।

এটা ঠিক কথা যে, মেহের সম্রাজ্ঞী নূরজাহান হয়ে একদিন মুঘল-সাম্রাজ্যের হাল ধরেছিলেন বলেই প্রধানত এই দুই বাদশা-বেগমের মধ্যে বিয়ের আগে কোন রোমান্স ছিল কিনা—এই নিয়ে ঐতিহাসিক-লেখক-কাহিনীকারদের মধ্যে এত মারামারি, কথার এত মারপ্যাঁচ। নাচিয়ে মেয়ে আনারকলী (যার সঙ্গে সেলিমের প্রেমকাহিনী সর্বজনবিদিত) যদি কোনদিন জাহাঙ্গীরের ব্যক্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে ঝরোখা থেকে তাঁর সাম্রাজ্য চালাতেন, তা হলে তাঁর নামেও ঠিক ঐ রকমই কথার কচকচি চলত। প্রায় সব বিখ্যাত লোকদের বেলাতেই দেখা যায় তাঁরা খ্যাতি লাভ করার পর তাঁদের ছেলেবেলার জীবন নিয়ে নানা রঙের গালগল্প গড়ে ওঠে—তাঁদের তুচ্ছতম ঘটনাকেও গুরুতর প্রাধান্য দিয়ে মহিমান্বিত করা হয়।

জাহাঙ্গীর-নূরজাহানের ছেলেবেলাও ঠিক এই ছাঁচে বিচার করা যায়। মেহেরউন্নিসার বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে রাজবাড়ির যে সম্পর্ক ছিল, আসমৎ বেগম যে-ভাবে বেগমমহলে পরিচিত ছিলেন, রাজ-কুমার সেলিম যে-রকম রঙের নেশায় মেতেছিলেন—তাতে মেহের-উন্নিসার রূপে যদি তাঁর মাথা ঘুরে যায়—তাতে তো অস্বাভাবিক কিছু নেই! মেহের পরে অনেক উঁচুতে উঠেছিলেন বলেই এই নিয়ে এত আলোচনা। নইলে ঐ রকম প্রেমে ঐ যুগের নবাব-বাদশারা শুধু একবার কেন, শত সহস্রবার পড়তেন। এটা কোন অভাবনীয় ব্যাপার ছিল না, বা একে বেণীপ্রসাদের ভাষায় "deep scandal"-ও বলা চলে না। মুঘল হারেমকে পটভূমিকায় রেখে যদি ঘটনাটিকে বিচার করা যায়, তা হলেই ব্যাপারটা আরও সোজা ও স্বাভাবিক

হয়ে আসে। উপরন্তু সমসাময়িক যাঁরা ছিলেন, বা সামান্য কিছু পরে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের কাছে নূরজাহানের মহিমাই বেশী ফুটে উঠেছিল, সেই মহিমার প্রাধান্যের কাছে মেহের-সেলিমের মধ্যে কোথায় কোন্ ছেলেমানুষ বয়সে কি-একটা হয়েছিল—তার কোন গুরুত্বই ছিল না। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে এই ব্যাপার উল্লিখিত না হওয়ার মধ্যেও কিছু আশ্চর্য নেই। কেন না মেহের-উন্নিসার উল্লেখ তো দূরের কথা, প্রভাবশালিনী নূরজাহানের নাম-ই তো সম্রাট প্রথম উল্লেখ করেছেন বিয়ের কয়েক বছর পরে।

পরবর্তী যুগের গবেষণায় ছেলেবেলার এই ঘটনাকে ডালপালা নিয়ে শেকড়সুদ্ধ টেনে তোলা হয়েছে। তবে এই শেকড় কোন আগাছার শেকড় কিনা সেটাও দেখতে হবে, এবং সেটা নির্ভর করবে অন্যান্য ঘটনার ওপর।

পরবর্তীকালের গাল-গল্পে ভরা কাহিনীতে বলা হয়েছে, জাহাঙ্গীর শের আফকনকে হত্যা করে মেহেরউন্নিসাকে নিয়ে আসার জন্যই নাকি মানসিংহকে সরিয়ে কুত্‌ব্‌-উদ্‌-দিন কোকাকে বাংলার সুবাদার করে পাঠিয়েছেন।

বেণীপ্রসাদ বলেছেন, এ অনুমানও একেবারে মিথ্যে। সিংহাসনে আরোহণ করবার পর সরুর বিরোধিতায় জাহাঙ্গীরকে বেশ কিছুদিন নাজেহাল হতে হয়েছিল, এবং এই বিরোধিতার মূল শক্তি ছিলেন রাজা মানসিংহ—বাংলাদেশের সুবাদার। রাজনীতির দিক থেকে বাংলাদেশ তখন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। যে মানসিংহ খসরুকে দাঁড় করিয়ে জাহাঙ্গীরকে উত্যক্ত করে মেরেছিলেন, সেই মানসিংহকে বাংলাদেশে রেখে দেওয়াটা জাহাঙ্গীরের কাছে আরও বিপজ্জনক বলে মনে হয়েছিল। বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে মানসিংহ মুঘল সম্রাটকে ভবিষ্যতে বিপদে ফেলতে পারেন—জাহাঙ্গীরের মনে এ আশঙ্কা একেবারেই অমূলক বা অস্বাভাবিক ছিল না। সুতরাং মানসিংহকে বিহারে সরিয়ে দিয়ে জাহাঙ্গীর বাংলাদেশে নিজের

প্রিয়জন কুত্‌ব্‌-উদ্‌-দিন কোকাকে সুবাদার করে পাঠিয়েছিলেন, এর মধ্যেও অযৌক্তিক কিছু নেই।

শের আফকনকে হত্যা করার পেছনে মেহেরউন্নিসাকে হারেমে নিয়ে আসার কোন পরিকল্পনা ছিল না। শের আফকন রাজবিদ্রোহ-মূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন—এরকম একটা সন্দেহ জাহাঙ্গীরের মনে দেখা দিয়েছিল। শের আফকনের মতো একজন দুঃসাহসী উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোকের পক্ষে ঐ ধরনের সুযোগ গ্রহণ করা কোন যুগেই অসম্ভব নয়, বিশেষ করে সেই সময়কার বাংলাদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া তো সম্পূর্ণভাবে এই সুযোগের অনুকূলে ছিল। উপরন্তু সেলিম যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন, তখন শের আফকন সেলিমের পক্ষ ত্যাগ করে আকবরের দলে যোগ দিয়েছিলেন—এ ঘটনা সুবিদিত।

সুতরাং সম্রাট জাহাঙ্গীর যদি সামান্যতম কারণেও একদা-দলত্যাগী শের আফকনকে সন্দেহ করেন, তাতে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না।

অন্যদিকে কুত্‌ব্‌-উদ্‌-দিন যদি আর একটু কৌশলী হতেন, তা হলে হয়তো শের আফকনকে নিহতও হতে হত না, তাঁকে সম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী রাজধানীতে বন্দী করে নিয়ে আসা হত, অথবা অন্য কোন শাস্তি দেওয়া হত।

বেণীপ্রসাদ ও তাঁর স্বপক্ষীয় ঐতিহাসিকদের যুক্তিগুলি খুবই সঙ্গত, বিশ্বাসযোগ্য ও গবেষণাপ্রসূত।

তবু স্বাভাবিক বুদ্ধিতে এইসব যুক্তিতেও কতকগুলি ফাঁক ধরা যায়।

প্রথমতঃ আফগান শত্রুতার মূল কেন্দ্র বাংলাদেশে যে মানসিংহ কিছুটা শান্তি এনে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাজে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হল বিহারে। কারণ পাছে তিনি বাংলাদেশে দল তৈরি করে মুঘল সম্রাটকে বিপদে

ফেলেন। কিন্তু যদি এই আশঙ্কাই থাকে, তবে তাঁকে বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে না সরিয়ে কাছে বিহারে বদলি করা হল কেন? উপরন্তু সিংহাসনে একটু গুছিয়ে বসে ভেবে চিন্তে তারপরেই তো মানসিংহ সম্বন্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিলে হত। ক'দিন না হয় অশান্তি-বিশৃঙ্খলা-ভরা বাংলায় বিরূপ অথচ কর্মঠ লোকটিকে রেখে দিলেই হত। অত সাততাড়াতাড়ি করে সরিয়ে দেওয়া হল কেন?

আর একটি কথা—বাংলাদেশকে যদি সম্রাট গুরুত্বপূর্ণই ভেবে থাকেন, তা হলে সেখানে যোগ্যতর লোক না দিয়ে কুত্‌ব-উদ্‌-দিনকেই বা পাঠালেন কেন? তিনি জাহাঙ্গীরের প্রিয়পাত্র ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই মাপকাঠিতে যোগ্যতা বা বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাই কি? বরঞ্চ শের আফকনের হত্যার পেছনে কুত্‌ব্‌-উদ্‌-দিনের কাজকে তো বেণীপ্রসাদ নিজেই 'tactless blunder' বলেছেন—এই সামান্য কাজে যিনি 'tactless, তাঁর বুদ্ধি-রাজনীতির উপর আমাদের তো আস্থা থাকার কথা নয়।

শের আফকন সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন রাজদ্রোহী ষড়্‌যন্ত্রকারী, সেই হিসেবেই তাঁকে বন্দী করার চেষ্টা এবং তার পরিণাম মৃত্যু।

কিন্তু আশ্চর্য যে, যদিও শের আফকনকে বলা হয়েছে 'suspected of treason', কিন্তু ঠিক কী ধরনের অপরাধে তিনি অপরাধী ছিলেন, তা কিন্তু কোথাও স্পষ্টাক্ষরে বলা হয় নি।

বেণীপ্রসাদ শের আফকনকে ষড়্‌যন্ত্রের দোষে অভিযুক্ত করেছেন, আবার তাঁর বইয়ে একই জায়গায় বলেছেন, "The suspicion of disloyalty thrown on Sher Afkun may have been unjust."

তবে একটা কথা বলা যেতে পারে যে, শের আফকনই কুত্‌ব্‌-উদ্‌-দিনকে প্রথমে আঘাত করেছিলেন, আর সে আঘাত ছিল মারাত্মক। নিদারুণ আহত হয়ে তবেই কুত্‌ব্‌-উদ্‌-দিন পার্শ্বচরদের

শের আফকনকে আক্রমণ করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন—অবশ্য তাঁর আদেশের আগেই অম্বা খাঁ শের আফকনের মাথায় আঘাত হেনেছিলেন।

উভয় পক্ষের দোষেই এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ঘটেছিল।

রাজনৈতিক কারণে শের আফকনকে হত্যা করা হয়েছিল মনে করে নিলেও মেহেরউন্নিসাকে লাভ করার উদ্দেশ্যে জাহাঙ্গীর কুত্‌ব্‌-উদ্‌-দিনকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলেন, এটা এমন একটি গুজব এমন একটি জোরালো গল্প, যার জন্য যতুনাথ সরকারের মতো ঐতিহাসিকও এই ব্যাপারের উল্লেখ না করে থাকতে পারেন নি। তিনি বলেছেন,—জাহাঙ্গীর বাদশাহী তখ্‌তে বসবার দিন-পনেরো পরেই মানসিংহকে বাংলার সুবাদার করে পাঠালেন। এইবার নিয়ে মানসিংহ তিনবার সুবাদারী পেলেন। কিন্তু মানসিংহের এই সুবাদারী ছিল সংক্ষিপ্ত ও অনাড়ম্বর। কারণ ওদিকে যে—জাহাঙ্গীর অশান্ত ও ব্যথাতুর। তাঁর আঁধার ঘরে আলো জ্বলে না, ‘হর্‌তরফ অন্ধেরা’—চারদিকেই আঁধার আর আঁধার। সম্রাটের কামনার আলো তখন শিখা হয়ে জ্বলছে বর্ধমানের জায়গীরদার শের আফকনের নিরাড়ম্বর গৃহে। এই শিখাকে জাহাঙ্গীর চেয়েছিলেন হারেমের জ্যোতি করে নিয়ে আসতে—যে আলো পরে জগজ্জ্যোতি নূরজাহান হয়ে বিশ্বের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল···সে আলো বিনে যে প্রাসাদ অন্ধকার; তাই তো জাহাঙ্গীর পেয়ারের দোস্ত দুধভাই কুত্‌ব্‌-উদ্‌-দিন কোকাকে বাংলার সুবাদার করে পাঠালেন, আর তাঁর কানে কানে বলে দিলেন বেদনার্ত রাজহৃদয়ের জন্য বিশল্যকরণী সংগ্রহ করতে হবে···শের আফকনের অনির্বাণ শিখাটিকে যে তাঁর চাই।···মানসিংহকে এসব হৃদয়ঘটিত ব্যাপারের অনুপযুক্ত মনে করেই তো জাহাঙ্গীর তাঁকে বিহারের সুবাদার করে পাঠিয়েছেন···। এই তো গেল গুজব।

অন্যদিকে শের আফকন যদি জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রই করেন, তা হলে তো তিনি নিজের বিপদ সম্বন্ধে আরও সচেতন থাকবেন।

তিনি কেন অমন করে, মাত্র দুজন অনুচর নিয়ে কুত্‌ব্‌-উদ্‌-দিনের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন ? তাঁর মতো বুদ্ধিমান লোক নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করে এত বড় বেহিসাবী কাজ করবেন, এ ভাবতেও খারাপ লাগে।

আর একটি প্রশ্ন—রাজনৈতিক কারণে কোন লোককে হত্যা করা তো সে যুগে প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। শের আফকনের হত্যাও এরকমের একটি ঘটনা। উপরন্তু শের আফকন ছিলেন একজন সাধারণ জায়গীরদার, মোটামুটি একজন ফৌজদার। কাজেই তাঁকে কিভাবে কোন্ পরিবেশে হত্যা করা হয়েছে, এই নিয়ে বিভিন্ন লেখক এত মাথা ঘামিয়েছেন কেন ? তখনই কি মনে হয় না যে, নিছক রাজনৈতিক ব্যাপারের পেছনে আরও কিছু গূঢ় কারণ থাকলেও থাকতে পারে ?

মেহের-সেলিমের রোমান্সের আর একটি দিক হল, শের আফকনের হত্যার পরেই তাঁর স্ত্রী আর মেয়েকে রাজধানীতে নিয়ে আসা এবং এনেই মুঘল হারেমে সলিমাবেগমের তত্ত্বাবধানে রেখে দেওয়া। এই ব্যাপারটিকেও দুদিক থেকে আলোচনা করতে পারা যায়।

প্রথমতঃ শের আফকনকে রাজনৈতিক কারণে হত্যা করলে তাঁর স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে টানাটানি কেন ?

দ্বিতীয়তঃ যেখানে ইতিমদ-উদ্‌ দৌলা মেহেরের বাপ, আসফ-খাঁ মেহেরউন্নিসার ভাই, সেখানে বাপ-ভাইয়ের আশ্রয়ে না রেখে তাঁদের মুঘল অন্তঃপুরে নিয়ে আসা হল কেন ? রাজনৈতিক কারণ, যেটা, সেটাতো রাজনীতিক নায়কের মৃত্যুর সঙ্গেই তো শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। পরবর্তী এই কাজগুলাই কাহিনীকারদের মনে নানা সন্দেহ অনুমান ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাঁরা ভেবেই নিয়েছেন মেহের-উন্নিসা সম্বন্ধে জাহাঙ্গীরের পূর্ব-অনুরাগ না থাকলে শের আফকনের মৃত্যুর পর মেহেরউন্নিসাকে নিয়ে এত কিছু করবার দরকার ছিল না।

বেণীপ্রসাদ বলেছেন, জাহাঙ্গীরের ইতিহাস পড়ে আমরা মেহের-উন্নিসা ওরফে নূরজাহানের যে তেজোদৃপ্ত চরিত্রের পরিচয় পাই, তাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে তাঁর নির্দোষ স্বামী শের আফকনের রক্তে কলঙ্কিত জাহাঙ্গীরকে তিনি কিছুতেই পতিত্বে বরণ করতে পারতেন না, বা সলিমাবেগমের সহচারিণী পরিচারিকা হিসেবে হারেমে থাকতে চাইতেন না। উপরন্তু জাহাঙ্গীরের ওপর নূরজাহানের যে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, সে অনুরাগ শের আফকনের হত্যাকারীর ওপরে থাকা একেবারেই সম্ভব ছিল না।

এই মন্তব্যকেও আমরা সমালোচনা করতে পারি।

প্রথমতঃ জাহাঙ্গীর-প্রেয়সীর তেজোদৃপ্ত চেহারা শুধু ক্ষমতাময়ী নূরজাহানেই মেলে। ঐ ধরনের কোন ব্যক্তিত্বের পরিচয় আমরা ক্ষমতাহীন মেহেরউন্নিসার মধ্যে পাই না—সুতরাং তিনি কিছুতেই স্বামী-হত্যাকারীকে বিয়ে করতে চাইবেন না, এযুক্তি খুব সঙ্গত নয়।

দ্বিতীয়তঃ, জাহাঙ্গীরের নির্দেশেই কুত্‌ব্‌-উদ্‌-দিন শের আফকনকে শাস্তি দিতে এসেছিলেন, এবং কুত্‌ব্‌-উদ্‌-দিন শের আফকনের মৃত্যুর জন্য যতই দায়ী হোন না কেন, আসল দায়িত্ব যে জাহাঙ্গীরের ছিল—মেহেরউন্নিসার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে এটা নিশ্চয়ই জানতেন। তবু তিনি জাহাঙ্গীরকে বিয়ে করেছিলেন। সারাজীবন তাঁর ওপর মেহেরউন্নিসার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।

এহেন অনুরাগের আরম্ভ কি তা হলে ১৬১১তেই? তার আগে নয়?

এই প্রসঙ্গে হঠাৎ মনে পড়ে যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র একটি অংশ, যেখানে আকবর শাহ্‌ গত হয়েছেন, আর সেলিম সিংহাসনে আরূঢ় হয়েছেন, মতিবিবির কাছে একথা শুনে মেহের কাঁদতে লাগলেন, তাঁর চোখে জলের ধারা বয়ে গেল।

'মতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদ কেন?"

মেহেরউন্নিসা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায় ?"

মতির মনস্কাম সিদ্ধ হইল। তিনি কহিলেন, "তুমি আজিও যুবরাজকে একেবারে বিস্মৃত হইতে পার নাই!" মেহেরউন্নিসা গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, "কাহাকে বিস্মৃত হইবে? আত্মজীবন বিস্মৃত হইব, তথাপি যুবরাজকে বিস্মৃত হইতে পারিব না। কিন্তু শুন ভগিনি: অকস্মাৎ মনের কবাট খুলিল; তুমি একথা শুনিলে; কিন্তু আমার শপথ, একথা যেন কর্ণান্তরে না যায়।"

মতি কহিল, "ভাল, তাহাই হইবে। কিন্তু যখন সেলিম শুনিবেন যে, আমি বর্ধমানে আসিয়াছিলাম, তখন তিনি অবশ্য জিজ্ঞাসা করিবেন যে, মেহের-উন্নিসা আমার কথা কি বলিল? তখন আমি কি উত্তর করিব?"

মেহের-উন্নিসা কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন, "এই কহিও, মেহের-উন্নিসা হৃদয়মধ্যে তাঁহার ধ্যান করিবে। প্রয়োজন হইলে তাঁহার জন্য আত্মপ্রাণ পর্যন্ত সমর্পণ করিবে। কিন্তু কখনও আপন কুলমান সমর্পণ করিবে না। দাসীর স্বামী জীবিত থাকিতে সে কখনও দিল্লীশ্বরকে মুখ দেখাইবে না। আর যদি দিল্লীশ্বর কর্তৃক তাহার স্বামীর প্রাণান্ত হয়, তবে স্বামিহন্তার সহিত ইহজন্মে তাহার মিলন হইবেক না।"'

উপন্যাস ইতিহাস নয়। তবে আমাদের মনের ক্ষুদ্রতম সন্দেহের সঙ্গে যদি সাহিত্য-সম্রাটের উদ্ধৃতি মিল ঘটেই যায়, তাতে ক্ষতি কি?

মেহেরউন্নিসাকে মুঘল হারেমে নিয়ে গিয়েই কিন্তু জাহাঙ্গীর তাঁকে বিয়ে করলেন না, পুরোপুরি চারটে বছর টানা কেটে যাওয়ার পর জাহাঙ্গীর মেহেরউন্নিসাকে বি[illegible] করেছিলেন।

এই দীর্ঘ চারটি বছর তো কাহিনীকার ও ঐতিহাসিকেরা চুপ করে থাকতে পারেন না। কাজেই এ ক'বছরের অবসরেও অনেক গল্প-আগাছা জমে উঠেছিল।

মেহেরউন্নিসার সৌন্দর্যের খ্যাতি ক্রমে হারেমের দরজা পার হয়ে দরবারে ছড়ালো। তারপর দরবার ছেড়ে চারদিকে। তাঁর সূচীকর্মের নানা নমুনা চাঁদনীর বাজারে আমীর-ওমরাহ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উঁচু দামে বিকোতে লাগল।

এর পর গল্প আরও বিকৃতির পথে এগোল, তাতে আমাদের দরকার নেই।

আমাদের দরকার ১৬১১ খ্রীস্টাব্দের নওরোজ-উৎসব-দিবস,—যেদিন জাহাঙ্গীর নাকি প্রথম দেখেছিলেন মেহেরউন্নিসাকে, মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করেছিলেন!

কিন্তু হারেমে যাঁর নিত্য গতায়াত, ১৬১১ খ্রীস্টাব্দের আগে এই দীর্ঘ চারবছরে তিনি কি একবারও মেহেরউন্নিসাকে দেখেন নি?

মেহেরউন্নিসা তো ছিলেন সলিমাবেগমের কাছে, যাঁর সঙ্গে জাহাঙ্গীরের ছিল নিগূঢ় সম্পর্ক। সলিমাবেগমের অনাবিল স্নেহ অবিরত ঝরে পড়ত সম্রাট-ছেলের ওপর। আর তাঁর আশ্রয়াধীনা মেহেরউন্নিসার সঙ্গে সম্রাটের একদিনও সাক্ষাৎ হয় নি, এই বা কি করে সম্ভব?

এমনও তো হতে পারে যে, এত কাণ্ড করে সম্রাট যাঁকে বাপ-ভাইয়ের কাছে না দিয়ে হারেমে নিয়ে এলেন, রাজনীতির খাতিরেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বিয়ে করতে পারেন নি? কারণ খসরুর বিদ্রোহকে সবে দমন করা হলেও তাঁর স্বপক্ষীয় দলটি উপেক্ষণীয় ছিল না। মেহেরউন্নিসাকে হারেমে আনবার পর রাজ্যের মধ্যে তখনও গোলমালের রেশ ছিল—তাই জাহাঙ্গীর বিয়েতে মনের দিক থেকে হয়তো বা বাধা পেয়েছিলেন!

শুধু তাই নয়, সদ্য-নিহত শের আফকনের বিধবাকে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করলে আমীর-ওমরাহদের একটা অংশ যে বিগড়ে যাবে, অসন্তুষ্ট হবে, এ-ও জাহাঙ্গীর জানতেন।

অন্য দিকে খসরুর দ্বিতীয় বিদ্রোহে মেহেরউন্নিসার বাপ-ভাইয়ের

অংশ ছিল। হয় তো বা এই কারণেই মেহেরকে হারেমে রাখা হয়েছিল—মেহের-জাহাঙ্গীরের বিয়ে এত বিলম্বিত হয়েছিল।

যে কারণেই হোক বিয়ে হয়েছিল সেই ১৬১১-তে—

এই বছরটি শুধু জাহাঙ্গীরের জীবনে নয়, গোটা মুঘলযুগের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা।

মেহেরউন্নিসা তখন চৌত্রিশ পার হয়ে যাচ্ছেন, তবু তাঁর রূপে তখনও বিদ্যুৎবহ্নি, আর আশ্চর্য—এ বহ্নি কখনও স্তিমিত হয় নি।

সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর শক্তি-বুদ্ধি-যুক্তি, সব কিছু সমর্পণ করেছিলেন মেহেরউন্নিসার কাছে।

নূরউদ্দিন জাহাঙ্গীর নামটির সঙ্গে মিল রেখে সম্রাট মেহেরউন্নিসার নোতুন নামকরণ করলেন নূরমহল—হারেমের আলো! জাহাঙ্গীরের দীপান্বিতা, ইতিহাসের নবীন স্বাক্ষর।

শুধু তো আগুনের মতো রূপই নয়, এর সঙ্গে নূরমহলের ছিল শাণিত বুদ্ধি, সুমিত রুচি, শিল্পবোধ, আর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী। নূরমহলের দিকে তাকিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলে জাহাঙ্গীরের মন ভরে উঠত। তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতেন নূরমহলকে মুখে মুখে ফারসী বয়েত রচনা করতে দেখে, আর মনের কল্পনাকে তুলি দিয়ে রঙিন প্রাণময় করে আঁকতে দেখে।

রূপের সঙ্গে প্রতিভার কী অতুলনীয় সমন্বয়!

নূরমহলের রূপকে জাহাঙ্গীর সোহাগ জানাতেন তারিফ করতেন, তাঁর পদ্মপলাশ দীপ্তিময় চোখদুটোকে তিনি সমীহ করতেন, শ্রদ্ধা করতেন। নূরমহলের সান্নিধ্যে আর স্পর্শে সম্রাট জাহাঙ্গীর মন্ত্রমুগ্ধ হলেন।

১৬১৩ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সলিমাবেগম মারা গেলেন। হারেমে উচ্চতম আসনে তিনি অধিষ্ঠিতা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই আসনে জাহাজীর এবার বসালেন বেগম নূরমহলকে।

এবার থেকে নূরমহল হলেন রাজ্যের প্রধানা মহিলা—অত্যন্ত সম্মানিতা, 'First Lady of the Realm'।

১৬১৬ খ্রীস্টাব্দে নওরোজের উৎসবে জাহাঙ্গীর নূরমহলের নামকরণ করলেন নূরজাহান—দীপ্তিময়ী, শুধু হারেমের আলো নয়, বিশ্বের আলো। সেই আলোর জাদুতে নূরজাহান ধীরে ধীরে ঘুম পাড়ালেন একদা-শক্তিশালী ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী সম্রাট নূরউদ্দিন জাহাঙ্গীরকে

শুরু হল সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের রাজত্ব।

মুঘল রাজত্বে নূরজাহানের আবির্ভাব কাল ১৬১১ থেকে ১৬২৭—ষোল বছর। এই ষোলবছরে আমরা দেখব একটি রূপসী মেয়ের অভাবনীয় ক্ষমতা।

নূরজাহানের রাজ্যশাসন শুধু একখানা শুকনো ইতিহাস নয়। এ ইতিহাস ঘটনাবহুল এক বিচিত্র নাটক।

নূরজাহান কখনও মুঘল সিংহাসনে বসেন নি, অথচ দরবার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত, কে জানে কী বিধান আসে সিংহাসনে-আসীন সম্রাট জাহাঙ্গীরের আড়াল থেকে। ভীত সভাসদ আবার মুগ্ধ হয়েছে নূবজাহানের নিত্য নোতুন ফ্যাশানের অভিনব আবিষ্কারে। সুন্দর কারুকার্য শোভিত সূক্ষ্ম বস্ত্রের অতি হালকা আরামদায়ক মহার্ঘ পোশাকে অবাক হলেন অভিজাত মহিলা ও ওমরাহ্‌রা।

নূরজাহান তৎকালীন ফ্যাশান-সমাজকে একে একে উপহার দিলেন দু দাম ওজনের পেশোয়াজ, পাঁচতোলা ওজনের উড়ানী, বাদ্‌লা (জরি), আর কিনারী (লেস্)।

পোশাকগুলি দেখে মনে হত সুতোর তৈরী নয়, মাকড়সার জালে কে যেন ফুলপাতা এঁকে দিয়েছে। এদের ওজন প্রজাপতির পাখাকেও লজ্জা দিত।

আর ফরাস-ই-চন্দনী ? নূরমহালী ?

চন্দনকাঠের রং-করা ঘরজোড়া কার্পেট ফরাস-ই-চন্দনী।

পঁচিশ টাকায় তৈরি হত বর-কনের নরম জরির হালকা পোশাক —নূরমহালী।

নোতুন পোশাক হলেই তো চলবে না, তাকে তো সুরভিত করতে হবে। সুগন্ধে বিমোহিত হবে লোকের মন, তবে তো সে তাকাবে নোতুন ফ্যাসানে তৈরি পেশোয়াজ, উড়ানীর সূক্ষ্ম শিল্পকলার দিকে !

অতএর আবিষ্কার হল 'অতর-ই জহাঙ্গীরী'—গোলাপী আতর, যার এক কোঁটা হাতে ঘষলে চারদিক ভরে উঠত সদ্যকোটা অজস্র গোলাপের গন্ধে।

নূরজাহান নিজে সুরভিত হতেন গোলাপ-নির্যাসের স্নানে— দৈনিক খরচ পড়ত তিনহাজার টাকা !

'অতর-ই-জাহাঙ্গীরী'—এ আবিষ্কারের পেছনে নাকি ছিলেন নূরজাহান-জননী আসমৎ বেগম, যাঁর কাছে নূরজাহান চিরকাল সৌন্দর্য, রুচি ও বুদ্ধির জন্য ঋণী ছিলেন।

দরবার গৃহের চেহারা পাল্টে গেল, রূপান্তর হল অন্দরমহলের। রাজপ্রাসাদের সম্পদের সঙ্গে হাত মেলালো সৌন্দর্য।

নূরজাহানের আগমন বার্তা ঘোষিত হল সব কিছুর মধ্যে। সম্রাটের ফরমানে রাজমোহরের পাশে সংযুক্ত হল নূরজাহানের নাম। এমন কি মুদ্রায় লেখা থাকত—

"বা হুকুমে শাহ্জাহাঙ্গীর ইয়াফ্‌ৎ সদ্ জেউয়র।

বনামে নূরজাহান পাদিশাহ্ কোম্ জর্।"

—জাহাঙ্গীরের আদেশে যে সকল স্বর্ণমুদ্রায় নূরজাহানের নাম আছে, সেই সকল স্বর্ণের মূল্য শতগুণ অধিক।

দানপত্রে নূরজাহানের বিনা মোহরে কোন স্ত্রীলোককে জমি দান করবার রীতি ছিল না।

রাজ্যসুদ্ধ সবাই মনপ্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করল একজন এসেছেন,

সিংহাসনের আড়ালে অদেখা তাঁর অস্তিত্ব; তবু সে অস্তিত্ব বাতাসের মতো সর্বব্যাপী, কালক্রমে সর্বগ্রাসীও বটে।

জাহাঙ্গীরের রঙ্গমঞ্চে নূরজাহানের প্রবেশ তো শুধু আগমন নয়, —আবির্ভাব।

একদিকে নূরজাহান ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী, ঐশ্বর্যবিলাসী, সৌন্দর্য-পিয়াসী —অন্যদিকে তিনি করুণাময়ী, পরের দুঃখে সমব্যথী, নারীর জন্মগত গুণে গুণবতী।

দয়া-দাক্ষিণ্য-দানে নূরজাহান ছিলেন অদ্বিতীয়া, বিশেষ করে আশ্রয়হীনা অনাথা মেয়েদের দিকেই যেন তাঁর মনটা বেশি টানত।

মেয়েদের জীবনের কতটুকুই-বা পরিধি—ছোট্ট একটু শান্তির সংসার,—স্বামী, সন্তান, তাদের মঙ্গল—এইটুকুই তো যথেষ্ট।

অনাথা মেয়েদের এই জীবনে শ্রীময়ী করে প্রতিষ্ঠা করবার দিকে নূরজাহানের যেন বিশেষ ঝোঁক ছিল। অন্ততঃ পাঁচশ অসহায় মেয়েকে তিনি বিয়ে দিয়েছেন, তাদের জীবনে শান্তি দিয়েছেন, স্বস্তি দিয়েছেন। ওদের বিবাহিত জীবন সুখের হোক, নূরজাহান এই কামনা করে অকাতরে অর্থ দান করেছেন।

কোনদিন কি চাপা দীর্ঘনিশ্বাস মিলিয়ে যেত যমুনার বুকে বয়ে-যাওয়া হাওয়ার সঙ্গে?

নূরজাহান যতবড় সম্রাজ্ঞীই হোন না কেন, বিবাহিত জীবনের বিড়ম্বনা তো তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। ব্যক্তি শের আফকন আর সম্রাট জাহাঙ্গীর, একদিকে শান্তি, স্বস্তি,—অন্যদিকে ক্ষমতা, আকাঙ্ক্ষা—এই দুইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নূরজাহান কি কোন দিন তাঁর নিভৃত চিন্তায় বিব্রত বোধ করেন নি?

নূরজাহান এলেন।

নূরজাহানের পাশে দাঁড়ালেন মা আসমৎ বেগম, বাবা ইতিমদ-উদ্-দৌলা, ভাই আসফ খাঁ। আর?

আর খুররম—জাহাঙ্গীরের তৃতীয় ছেলে। আকবর বলতেন, ছেলে বটে খুররম। সেলিমের আর কোন ছেলের সঙ্গে তুলনাই হয় না…

সৌন্দর্য, বুদ্ধি, ধৈর্য আর সাহস—নূরজাহান সবই পেয়েছিলেন মা আসমৎ বেগমের কাছ থেকে।

সম্রাটের অন্দর মহলে প্রধানা বেগমের কি কি কর্তব্য, কিভাবে চলতে হবে, কি করে চালাতে হবে, সবই আঙুল উঁচিয়ে শিখিয়েছিলেন আসমৎ বেগম।

ইতিমদ-উদ্-দৌলা ছিলেন পাকা মাথার লোক, বুদ্ধিধারী পণ্ডিত। তেহ্‌রানের ছিঁড়ে-কুটিকুটি-হয়ে-যাওয়া ভাগ্যকে তিনি জোড়া লাগিয়েছিলেন এই হিন্দুস্থানে। তাঁর যোগ্যতায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন আকবর, মুগ্ধ হয়েছিলেন জাহাঙ্গীর। তাই সাফল্যের ধাপ পেরিয়ে সৌভাগ্যের সিংহদ্বারে উপস্থিত হতে ইতিমদ-উদ্-দৌলার বেশী সময় লাগে নি।

বহু সৈন্যের অধিপতি ইতিমদ-উদ্-দৌলা ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দে পেলেন নিজের সম্মাননিদর্শন একখানা পতাকা। তার আগমনবার্তা ঘোষণার জন্য দরবারে সকলের সামনে বাজানো হত দামামা।

এই সম্মান শুধু রাজকুমারদেরই প্রাপ্য ছিল। এ শিকে খুব কম লোকের ভাগ্যেই ছিঁড়ত।

প্রায় প্রতি বছরে ইতিমদ-উদ্-দৌলার অধীনস্থ সৈন্যসংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল, উনি হলেন রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ। তার সঙ্গে এল রাজস্ববিভাগের দায়িত্ব। সব শেষে রাজ্যের কর্ণধার—উজির-প্রধান।

মেয়ের ভাগ্যে বাপের ভাগ্য।

বাপের চাতুর্যে মেয়ের প্রাধান্য।

আর আবুল হাসান? ১৫১১ খ্রীস্টাব্দে যিনি ছিলেন ইতিবদ খাঁ, ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনিই হলেন আসফ খাঁ। উপাধির সঙ্গে ক্ষমতা এল,

উঁচু আসন আরও উঁচু হল। আসফ খাঁ হলেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের লেফ্‌ট্যানেণ্ট জেনারেল।

সর্বোচ্চ সেনানায়কের পদ রিজার্ভ করা থাকত রাজকুমারদের জন্যে। কাজে না হলে অন্তত নামে তাঁরাই হতেন সমরাধিনায়ক।

আসফ খাঁয়ের বীরত্বের মতোই ছিল তাঁর খাওয়ার বহর।

খেতে পারতেন বটে।

অত্যন্ত তৃপ্তি আর সন্তোষের সঙ্গে তিনি সামনে-সাজানো নানা রকম মোগলাই ডিশ একটার পর একটা শেষ করতেন—খেতে তিনি কখনও কোন ক্লান্তি বোধ করেন নি।

কিন্তু তাই বলে কি তাঁর আর সব কিছু ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল?

ফারসী সাহিত্য আর বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে তাঁর ব্যুৎপত্তি কে অস্বীকার করবে?

সকলের ওপরে ছিল আসফ খাঁয়ের বাস্তব বুদ্ধি। তার ফলে তিনি যেভাবে রাজস্ব বুঝতেন, শাসনকার্য চালাতেন, সেরকম খুব কম দেখা যায়। কাজেই আসফ খাঁয়ের নামেও পতাকা নির্দিষ্ট হল, সম্মান-ভেরী ঘোষণার ব্যবস্থা হল।

আসফ খাঁ কিস্তি মাত করলেন ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে মেয়ে আর্জুমন্দবানু বেগমের সঙ্গে খুরমের বিয়ে দিয়ে। খুরমের বয়স তখন কুড়ি।

ভাগ্যিস নূরজাহানের মতো অমন একটা বোন ছিল, সে পেছনে না থাকলে কি হত বলা যায় না।

অবিশ্যি আর্জুমন্দবানু বেগমের মতো এমন সুন্দরী মিষ্টি মধুর মেয়ে পেয়ে খুরমও নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করেছিলেন। চতুর বুদ্ধিটা না পেলেও আর্জুমন্দবানু পিসীর রূপটুকু তো সম্পূর্ণই পেয়েছিলেন।

বাপ মা আর ভাই—এঁরা তো ছিলেন নূরজাহানের সঙ্গের সাথী।

আর ছিলেন রাজকুমার খুরম। যদিও জাহাঙ্গীরের ছেলেদের মধ্যে খুরমের তৃতীয় স্থান, তবু তিনি জানতেন, সামান্য দেখতে

পেলেও খসরু অন্ধ, সুতরাং তাঁর পক্ষে সিংহাসন দাবি করা বলতে হবে অন্যায় আবদার।

আর মেজো ছেলে পরভেজ?

পরভেজের মনে ইচ্ছের বহরটা খুব—রাজা হব, হ্যান করব, ত্যান করব,—কিন্তু তাতে বুদ্ধিটা তো খেলানো চাই। সে বুদ্ধির নামে পরভেজের ভাঁড়ারে এক মস্ত বড় গোল্লা ছাড়া আর কিছু ছিল না আর ওদিকে মদ খেয়ে খেয়ে তো যাবার দাখিল। সিংহাসন পর্যন্ত টেনে হেঁচড়ে যেতে পারবেন কিনা সন্দেহ। সুতরাং বাকি খুরম।

নূরজাহান খুরমকে দলে টানতে বেশি দেরি করেন নি।

সেকালের নামকরা সব পণ্ডিতদের কাছে খুরম লেখাপড়া শিখেছিলেন। তবে তাঁর জীবনে সাফল্যের মূলে ছিল-ঠাকুরদাদা আকবরের আদর্শ, তাঁর ব্যক্তিত্ব আর দৃঢ়তা।

সবচাইতে বিস্ময়ের কথা তেইশ বছর বয়স পর্যন্ত খুরম মদের মুখ দেখেন নি। যে বয়সে মুঘল রাজপুত্রেরা মদ আর অন্যান্য নেশায় চুর হয়ে চোখ লাল করে বসে থাকতেন, সে সময় খুরমের পক্ষে সাদা চোখে, স্থির মস্তিষ্কে বসে থাকাটা সত্যিই আশ্চর্যের।

ছেলের এই সাত্ত্বিক ধরনধারণ বাপ জাহাঙ্গীরের কাছে কিন্তু বাড়াবাড়ি ঠেকত। রাজার ছেলে, লেখাপড়া শিখবে, আবার পাঁচ রকম আমোদ-আহ্লাদে মেতে উঠবে, নেশাটা-আশটা করবে, এতে মন্দের কি আছে বাপু!

খুরম সেবারে চব্বিশ বছরে পড়লেন।

জন্মদিনের উৎসবে জাহাঙ্গীর ছেলেকে যথারীতি আশীর্বাদ করলেন, খোদাতালার কাছে দীর্ঘায়ু কামনা করলেন।

তারপর ছেলেকে ধরে বসলেন, 'গলাটা ভেজানো নিয়ে কথা, এই তো? এতে দোষের কি আছে বাবা—পালপার্বণে ওরকম একটু-আধটু খেতে হয়। তোমাকে তো বাপু আমি ঐ নিয়েই পড়ে থাকতে বলছি না…'

অনেক অনুরোধেও যখন ছেলের মন টলল না, খুররম কিছুতেই মুখের কাছে মদের গ্লাস ধরলেন না, তখন জাহাঙ্গীর তাঁর পণ্ডিত ছেলেকে ইবন-সিনার উদাহরণ দিলেন—'ভেবে দেখ ইবন-সিনার কথা। আরবদেশে ওরকম বাঘা ডাক্তার, অমন দার্শনিক পণ্ডিত বুদ্ধিমান লোক খুব বেশি আসেন নি। তিনি পর্যন্ত বলে গেছেন পরিমাণ মতো মদ খেলে শরীর বা মনের কোন ক্ষতি হয় না। তবে ? তুমি মদ খাবে না তো কি খাবে যত ইয়েরা……!'

খুররম যতদূর পেরেছিলেন বাপের প্রস্তাবকে ঠেলে রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত আর পারলেন না। কয়েক ঢোক খেয়ে ফেললেন। মন্দ লাগল না।

জাহাঙ্গীর খুশি হলেন।

ঘটনাটা নিজের হাতে লিখে রাখলেন, 'বাপধনকে একটু মদ খাওয়াতে কম মেহনত হল না……'

খুররম ভালবাসতেন ঐশ্বর্য-আড়ম্বর, জাঁকজমক। যেদিকে তাকাবেন সেদিকে যেন উপচে-পড়া সম্পদের নিদর্শন থাকে—এই ছিল খুররমের বাসনা।

তবে ঐশ্বর্য শুধু গাদা করে সাজানো নয়, তাকে শিল্পীর রূপ দিয়ে সুন্দর করে গড়তে হবে। তবে না মুঘল সম্পদের ব্যবহার চরিতার্থ হবে, আর খুররমের শিল্পরুচির বিকাশ হবে!

অন্যদিকে খুররমের স্থির দৃঢ় দৃষ্টি ছিল বাপের সিংহাসনের ওপর। বাপের পর ঐ সিংহাসনে আর কাউকে কল্পনা করলে মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলে উঠত।

ঐ সিংহাসন তাঁর।

ঐ সিংহাসন তাঁর চাই-ই চাই।

সিংহাসনে পৌঁছবার জন্য খুররম গোপন সুড়ঙ্গ খুঁড়তে আরম্ভ করলেন প্রথম থেকেই। তাই জাহাঙ্গীরের রাজ্যাভিষেকের পর খসরু আর তাঁর সঙ্গীসাথীদের ষড়যন্ত্রের খবরটি বাপের কানে অত্যন্ত

আনন্দের সঙ্গে তুলে দিয়েছিলেন তিনি। এই কাজটি করে খুরম বাপের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। একে লেখাপড়া জানা বীর ছেলে, তায় ষড়্যন্ত্র ধরিয়ে দিয়ে বাপের প্রাণ বাঁচানো—এ কি ছেলের কম ভক্তির পরিচয়।

জাহাঙ্গীর খসরুর বিদ্রোহকে পা দিয়ে পিষে ফেলে নিশ্চিন্ত হলেন, তার পর তাকালেন খুরমের দিকে। তাঁকে এবার পুরস্কার দিতে হবে।

১৬০৭ খ্রীস্টাব্দেই খুরমকে মস্ত বড় সেনাপতির পদে বসানো হয়েছিল। খসরুর ঐ ব্যাপারের পর জাহাঙ্গীর খুরমকে হিসার-ফিরোজের জায়গীরদার করে দিলেন। ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে খুরমের অধীন সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হল—বছরে বছরে আরও বৃদ্ধি হল। সবাই বুঝল জাহাঙ্গীর বড্ড বেশি ঝুঁকে এসেছেন খুরমের দিকে। বাপের পরে নিশ্চয় এই ছেলের ওপরেই সিংহাসনের ভরসা···

খুরম বেশ বড় করেই সুড়ঙ্গের মুখ খুললেন। বেশ বড় ফাঁদের সুড়ঙ্গ না করলে ভেতর দিয়ে তর তর করে যাওয়া যাবে কি করে?

খুরমের পথ আরও পরিষ্কার হল ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে, যখন তিনি আসফ-কন্যা আর্জুমন্দবানু বেগম বা মমতাজ মহলকে বিয়ে করলেন। যাঁর শ্বশুর হলেন আসফ খাঁ, দাদাশ্বশুর ইতিমদ-উদ্-দৌলা, আর পিসশাশুড়ী স্বয়ং সম্রাজ্ঞী—তাঁর ভাবনা কি? সিংহাসন তো সেধে এসে তাঁকে ধরা দেবে।

কিন্তু দেয় নি। সিংহাসন এত সহজে হাতের কাছে আসে নি। সে পরের কথা···

বিয়েতে যে ধুমধাড়াক্কা হলো ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। শ্বশুর-জামাই দুজনেই ঐশ্বর্য-জাঁকজমকের পক্ষপাতী। সুতরাং রাজ্যসুদ্ধ লোকের এ বিয়েতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল, কানে তালা লাগল। বিয়ের মিছিলের আগে আগে সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজে বরকর্তা হয়ে আসফ খাঁয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন। তাঁর বাড়িতে একদিন একরাত কাটিয়ে এসেছিলেন।

সবই হল—উৎসব হল, খুরম-আর্জুমন্দবানু বেগম সুখীও হলেন, কিন্তু অন্যদিকে ইতিহাসে একটা বড় রকমের গেরো পড়ল।

এই বিয়ে সামাজিক নিশ্চয়ই, তবে এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটাও বড় কম ছিল না। নূরজাহান একেবারে আটঘাট বেঁধে ভেবেচিন্তে তাঁর কাজ শুরু করলেন। খুরম-মমতাজের বিয়ে হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দর সুগঠিত, সুপরিকল্পিত এবং সুপরিচালিত দল তৈরি হল—তৈরি হল নূরজাহান-'জুন্‌তা' (*Junta*)—নূরজাহান চক্র।

'জুন্‌তা' শব্দটি স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ অভিধানে মেলে। বিশেষ কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কয়েকজনকে নিয়ে যে সাময়িক শাসনগোষ্ঠী তৈরি হয়, তাকে বলে *Junta*। স্পেনকে রক্ষা করবার জন্য নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে এই রকম একটি সাময়িক শাসনগোষ্ঠী বা জুন্‌তা পার্টি গড়ে উঠেছিল।

ইংরেজ ইতিহাসে জুন্‌তা পার্টিকে একটু নিন্দাচ্ছলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ চলতি শাসন, শাসক অথবা রাজার বিরুদ্ধে একটা বিরোধী গোষ্ঠীকে সেখানে বলা হয় 'জুন্‌তা'। যেমন ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ম ও রাণী অ্যানের রাজত্বে হুইগ্‌ জুন্‌তা-পার্টি তৈরি হয়েছিল। তাই মুঘলযুগেও যে নূরজাহান-চক্র গড়ে উঠল তাকেও ইতিহাসে বলা হয় 'নূরজাহান-জুন্‌তা'।

এই মুঘলশাসনগোষ্ঠীর চারজন সদস্য-সদস্যা—ইতিমদ-উদ্-দৌলা, আসফ খাঁ, নূরজাহান আর খুরম। ১৬১২ থেকে ১৬২২—এই দশটি বছর মুঘল সাম্রাজ্য বলতে গেলে এঁদেরই হাতে ছিল। নূরজাহানের বুদ্ধি আর ধীশক্তি ছিল এই দলের প্রধান সম্পদ।

মনে প্রশ্ন জাগে—জাহাঙ্গীরের আসন তা' হলে কোথায় রইল? তাঁর ব্যক্তিত্ব কি তাহলে এতই তুচ্ছ ছিল যে, নূরজাহান আসা মাত্রই তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন? রাজকার্য সম্বন্ধে আর সচেতন থাকার প্রয়োজন মনে করলেন না?

ব্যাপারটা কিন্তু আসলে তা নয়।

জাহাঙ্গীর এই বিয়ের পরে অন্তত প্রথম কিছুদিন আপন মহিমাতেই বিরাজ করেছেন। রাজ্য পরিচালনার সমস্ত ক্ষমতা—বৈদেশিক-আভ্যন্তরীণ সমস্ত নীতি সব কিছুই তিনি যেমনটি আরম্ভ করেছিলেন, তেমনটিই ছিল। তবে নূরজাহানের গুণে, রাজনীতিতে, তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয়ে চমৎকৃত হয়ে তাঁর ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের এই নূরজাহান-নির্ভরতা ক্রমেই বেড়ে গিয়েছিল।

নূরজাহানের বুদ্ধির জয় এখানেই।

জাহাঙ্গীরকে তিনি কখনও হটিয়ে দিতে চান নি, সব সময় তাঁকে সামনে রেখেই চলেছেন। শুধু জাহাঙ্গীরের ঠিক পাশের জায়গাটি তিনি কখনও ছাড়েন নি, জাহাঙ্গীরের ছায়ায় কাউকে আসতে দেন নি। সম্রাট জাহাঙ্গীরের ওপর একমাত্র নূরজাহানেরই ছিল এজমালি স্বত্ব।

নূরজাহানের এই একচ্ছত্র আধিপত্যে বাবা তো উৎফুল্ল হয়েই ছিলেন, আসফ খাঁ, খুরমও কম খুশি হন নি। কারণ এই নূরজাহানের বুদ্ধিতে, তাঁর ইচ্ছেতেই তো খুরম সন্ সন্ করে ওপরে উঠতে লাগলেন। জামাইয়ের এই উঠ্‌তি আনন্দে আসফ খাঁয়েরও আনন্দ। আর এই আনন্দ একটানা একভাবে চলেছিল ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

নূরজাহান ছিলেন পয়মন্ত! নইলে জাহাঙ্গীর যে বিপদে পড়েছিলেন বাংলাদেশ আর মেবার নিয়ে!

বাংলাদেশে পাঠানশক্তি আর ভুঁইয়ার দলকে মানসিংহ খানিকটা ঠাণ্ডা করে দিলেও সবটা পারেন নি। মুঘলশক্তিকে হটিয়ে দেবার জন্য বাংলাদেশের পাঠানেরা অনবরত খোঁচাখুঁচি করত। আজ

ডাণ্ডা খেয়ে ঠাণ্ডা হল তো, কালকেই কলা দেখাত। জাহাঙ্গীর দেখলেন মহাবিপদ। ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে জাহাঙ্গীর বাংলার সুবাদার করে পাঠালেন ইসলাম খাঁকে। ইসলাম খাঁ সেলিম চিস্তির ছেলে, একজন নামকরা সেনাপতি।

ইসলাম খাঁ বাংলাদেশে এলেন। সঙ্গে সুজৎ খাঁ। যে কজন ভুঁইয়ার ওপর ইসলাম খাঁয়ের দৃষ্টি পড়ল তাঁদের মধ্যে একজন যশোহরের প্রতাপাদিত্য, আর একজন শ্রীপুরের ইসা খাঁয়ের ছেলে ওসমান খাঁ—যিনি মানসিংহকে পর্যন্ত প্রথম প্রথম ঘোল খাওয়াতে ছাড়েন নি।

ইসলাম খাঁ বাংলাদেশে এসে সব কিছুর আগে রাজমহল থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেলেন ঢাকায়। ঢাকার নাম হল জাহাঙ্গীর নগর। এখান থেকে কাজের খুব সুবিধে হবে বলে মনে হল।

প্রথমে বাংলার ছোটখাট ভুঁইয়াদের খোঁড়া করা হল। তারপর যুদ্ধ হল প্রতাপাদিত্য, আর সবার শেষে ওসমান খাঁয়ের সঙ্গে।

প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দী করে—শোনা যায় তাঁর হাতে পায়ে শেকল পরিয়ে তাঁকে নাকি একটি খাঁচায় পুরে—যখন ঢাকা থেকে দিল্লী নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন পথে বারাণসীতে তিনি মারা যান।

ওসমান খাঁ কিন্তু ইসলাম খাঁকে বেশ কিছুটা বেগ দিয়েছিলেন।

শোনা যায় ওসমান খাঁ একবার ইসলাম খাঁয়েরই একটি অনুচর দিয়ে তাঁকে হত্যা করার ষড়্যন্ত্র করেছিলেন। কিন্তু এই ষড়্যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ওসমান খাঁ যা ভেবেছিলেন তা আর হল না। অগত্যা বাকী রইল যুদ্ধ।

১৬১২ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি হল—যুদ্ধ হল। ঢাকা থেকে প্রায় দু'শ মাইল দূরে নেক উজিয়াল নামে একটা জায়গায় যুদ্ধ হয়েছিল। ওসমান খাঁ নিজে হাতীর পিঠে চেপে যুদ্ধ চালাতে লাগলেন। পাঠানদের প্রথম ধাক্কা সামলানো মুঘলদের পক্ষে

বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রথম দিকে মশা মাছির মতো মুঘল-সৈন্য আর কয়েকজন বাছাই করা সেনপতি শেষ হয়ে গেল। উল্লসিত ওসমান সুজৎ খাঁয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করলেন। সুজৎ খাঁ পাল্টা জবাব দিলেন। যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করল।

অবশেষে মাথায় একটা গুলি লেগে ওসমান খাঁ গুরুতর আহত হলেন—সেদিনই মাঝরাত্রে তিনি মারা গেলেন।

ওসমান খাঁয়ের মৃত্যু বাংলাদেশের পাঠানশক্তির চরম পতন নির্দেশ করল।

১৬১২ খ্রীস্টাব্দের ১লা এপ্রিল। জাহাঙ্গীর বাংলার খবর শুনে উল্লসিত হলেন। খবর পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে ওসমান খাঁয়ের কাটা মাথাটাও তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

অশান্তিতে ভরা বাংলাদেশে শান্তি এল।

এবার মেবার-কাহিনী।

পর পর তিনটি অভিযান গেল মেবারে। প্রথম অভিযানের অধিনায়ক ছিলেন পরভেজ—অবশ্য আসলে ছিলেন সেনাপতি আসফ খাঁ জাফর বেগ। ফল—পরাজয়।

দ্বিতীয় অভিযানের নেতৃত্ব করলেন সেনাপতি মহাবৎ খাঁ। যুদ্ধবিদ্যা ও সৈন্য পরিচালনায় একমাত্র খুরম ছাড়া তাঁর সমতুল্য আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু এই দুর্ধর্ষ সেনাপতি মেবারকে বিপর্যস্ত করেও বাগে আনতে পারলেন না।

অবশেষে গেলেন খুরম। ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দ। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে চরম নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে মাসের পর মাস অবরোধ করে দুর্ভিক্ষ মহামারী লাগিয়ে শেষপর্যন্ত খুরম মেবার-রানা অমরসিংহকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করলেন। ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দে অমরসিংহ মুঘলসম্রাটের সঙ্গে সন্ধি করলেন।

জাহাঙ্গীর বাপের আদর্শের কথা স্মরণ করে অমরসিংহকে কোন

অসম্মান করলেন না, রাজপুত মর্যাদার দিকে তাকিয়ে সন্ধি করলেন।

মেবার-রানার মুঘল দরবারে হাজির হওয়ার এবং মেবার রাজ-কন্যাকে মুঘল-হারেমে পাঠানোর কোন বাধ্যবাধকতা রইল না। মুঘল-দরবারে রাজকুমার করণ পাঁচহাজারী মনসবদার নিযুক্ত হলেন।

সেই যুগের তুলনায় মেবারকে সম্মান দেখানো হল যথেষ্ট। তবে একটা কঠিন কড়ার ছিল, চিতোর দুর্গকে কখনও যেন অস্ত্র দিয়ে সাজিয়ে শক্তিশালী না করা হয়—খবরদার! এমন কি চিতোর দুর্গের মেরামত পর্যন্ত চলবে না, বালি খসে পড়লেও কলি ফেরানো হবে না—সাবধান! অর্থাৎ দুর্গের দুর্গত্ব পুরোপুরিভাবে নষ্ট করে দেওয়া হল।

খুররম করণকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন আজমীরে বাপের সঙ্গে দেখা করাতে। জাহাঙ্গীর করণকে অভ্যর্থনা জানিয়ে কাছে বসালেন, অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা বললেন, তারপর উপহারে উপহারে ঝড় বইয়ে দিলেন।

প্রথম দিন দিলেন অনেক দামের এক সেট পোশাক, তার সঙ্গে একখানি জড়োয়া-তরবারি।

তেজস্বী স্বাধীনচেতা করণকে নরম করবার জন্য জাহাঙ্গীর যে পন্থাটা নিয়েছিলেন সেটি তিনি আত্মজীবনীতে ভারি সুন্দর করে লিখে গেছেন।

করণের মন জয় করার জন্য তিনি তাঁকে নিত্য নোতুন জিনিস উপহার দিয়েছিলেন। প্রথম সাক্ষাতে দরবারে তিনি কিভাবে অভ্যর্থিত হয়েছিলেন, কি-কি পেয়েছিলেন, সে তো আগেই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় দিনে সম্রাট করণকে উপহার দিলেন পাথর সেটকরা একখানা ছোরা, পরদিন একটা বিশেষ জাতের ইরাকী ঘোড়া, তার পিঠে আবার জড়োয়া জিন। তার পরদিন করণকে নিয়ে যাওয়া হল মুঘল হারেমের দরবারে। নূরজাহানের পক্ষ থেকে তাঁকে দেওয়া হল

একটি বহুমূল্য সম্মান-স্মারক পোশাক, একটি জড়োয়া-তরবারি, জিন-সুদ্ধ একটি তেজিয়ান ঘোড়া, আর মস্ত একটি হাতী।

'জুন্‌তা' পার্টির অধিনায়িকার উপযুক্ত উপহার।

জাহাঙ্গীর আরও উপহার দিলেন—মুক্তোর মালা, সাজপরানো হাতী, চুন্নিপান্নার দুটো আংটি, কার্পেট, কুশন, সোনার পাত্রে নানা রকমের সুগন্ধী আতর। তা ছাড়া হরিণ, আরবী কুকুর, আরও অনেকগুলি ঘোড়া।

আর কয়েকটা বাজপাখী, শিকারী বাজপাখী।

কারণ যখন ফিরে গেলেন, তখন, জাহাঙ্গীরের ভাষায়, তাঁর কাছে ছিল নগদ আর রত্নরাজির মূল্য বাবদ দুলাখ টাকা, একশ দশটা ঘোড়া পাঁচটি হাতী। এ ছাড়া খুররমের দেওয়া উপহারের বিরাট বোঝা।

মণিমাণিক্যের ছটায় বীরশ্রেষ্ঠ রাজপুতদের নরম করবার মনোরম রাজনীতি।

আর খুররম?

মেবার জয়ে কৃতী ছেলে খুররম পেলেন বাপের উল্লসিত আনন্দোচ্ছ্বসিত আদর, চুম্বন আর আলিঙ্গন। সকলের ওপর অগুণতি অমূল্য উপহার আর প্রচুর সম্মান।

খুররমের জয়ে নূরজাহান-জুন্‌তার জয়, খুররমের সম্মানে নূরজাহান জুন্‌তার সম্মান, খুররমের উন্নতিতে নূরজাহান-জুন্‌তার শ্রীবৃদ্ধি।

আরাকান-চট্টগ্রামের মগরাও কি কম যন্ত্রণা দিয়েছে মুঘল সম্রাটকে! পর্তুগীজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারাও তো সমানে লুঠতরাজ আর নানা রকমের দৌরাত্ম্য করে জাহাঙ্গীরকে উত্ত্যক্ত করে তুলেছিল। তাদের সম্পূর্ণ দমন করা যায় নি বটে, তবে অন্য-দিকে নূরজাহানের পার্টি ঠিকই এগিয়ে গেছে, একটুও থমকায় নি।

নূরজাহানের সত্যিই পয় আছে।

স্পুটনিকের গতিতে নূরজাহান-চক্র এগিয়ে চলল!

ইতিমধ্যে শোনা গেল এক নতুন দলের পদধ্বনি—তাতার-ইরাক-মোগলের নয়, এ পদধ্বনি এসেছে অনেক সমুদ্র পার হয়ে, অনেক ঝঞ্ঝা লাঞ্ছনা ভোগ করে। এই পদধ্বনি খাস ইংরেজদের। যাদের সাদা চামড়ার নিচে নীল রক্ত, আর নীলচোখের আড়ালে নির্লজ্জ আকাঙ্ক্ষা। মৃদু তালে বুদ্ধি খেলাবার কৌশল ও সামান্য উপচার নিয়ে আভূমি নত হয়ে তারা ভারতবর্ষে এসেছিল। পর্তুগীজদের মতো তারা ঘুষি পাকায় নি, কামান দাগে নি, কথায় কথায় এদেশীয় মানুষদের মাথা কাটে নি। ইংরেজদের ছিল ইনজেকশন দেওয়ার নীতি। সময় সুযোগ ক'রে পুট্ করে শুধু ছুঁচটি ফুটিয়ে দেওয়া। তারপর দেহের শিরা-উপশিরায় শুরু হত তার প্রতিক্রিয়া।

১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে সুরাট বন্দরে ইংরেজদের চারখানা জাহাজ এসে পৌঁছল। যাত্রীদের মধ্যে একজন ছিলেন ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হকিন্স্। ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌সের কাছ থেকে হকিন্স্ একখানা সুপারিশপত্র নিয়ে এলেন জাহাঙ্গীরের দরবারে। হকিন্সের কথার জাদুতে সম্রাট জাহাঙ্গীর মুগ্ধ হলেন! জমজমাট বন্দর সুরাটের আশেপাশে ইংরেজদের তিনি চারটে কুঠি বসাবার অনুমতি দিলেন।

হকিন্সের জমাটি স্বভাবে জাহাঙ্গীর তাঁর দিকে আকৃষ্ট হলেন, ঘনিষ্ঠ হলেন যখন হকিন্স্ তাঁর সঙ্গে তুর্কী ভাষায় বাতচিত-রসালাপ করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব হতে দেরি হল না। এমন কি হকিন্স্ জাহাঙ্গীরের খাস কামরায়ও আড্ডা দিতেন, আর সেখানে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মদ খেতেন। হকিন্স্‌কে জাহাঙ্গীর খুশীমনে চারশ' সৈন্যের মন্‌সবদার করে দিয়েছিলেন।

তবে এই পর্যন্তই। হকিন্স্ ব্যবসায়ে আর কিছু সুবিধে করতে পারেন নি।

তিন বছর পর তিনি মুঘল দরবার ত্যাগ করলেন।

কিন্তু এদিকে যে আর এক গোলমাল বেধে উঠল।

ইংরেজদের এইসব আসা-যাওয়া, সম্রাটের সঙ্গে হাসিমস্করা একেবারে সহ্য করতে পারল না পর্তুগীজেরা। ব্যবসার ক্ষেত্রে তাদের মৌরুসী পাট্টায় একটা বড় রকমের ঘা মারল এই ইংরেজরা, এবং তাদের মতিগতি যে সুবিধের নয়, এ কথাটা পর্তুগীজদের বুঝতে এতটুকু দেরি হল না। সুতরাং আরম্ভ হল মারামারি, যুদ্ধ। ইংরেজ জাহাজ 'ড্রাগন' ও 'অসিয়াণ্ডার'—জাহাজ না বলে নৌকো বলাই উচিত—নাজেহাল করে দিল এক বিরাট পর্তুগীজ নৌবহরকে।

জাহাঙ্গীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন ইংরেজদের যুদ্ধকৌশল আর সাহসকে। কিন্তু করলে হবে কি, তিনি কি তার জন্যে ইংরেজদের বেশি আদর করলেন, না পর্তুগীজদের হটিয়ে দিলেন? আগে আসার যে ফল, বেশি প্রাধান্য পাওয়া—পর্তুগীজরা সে সুবিধে সমানে ভোগ করে যেতে লাগল। তাদের ঠেকায় কে? তারা নির্বিচারে ব্যবসা আর বোম্বেটেগিরি—একসঙ্গে চালাতে লাগল।

কিন্তু সব জিনিসেরই যে সীমা আছে, এটা পর্তুগীজরা ভুলে গিয়েছিল। ফলে ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দে তারা সম্রাটেরই খানকয়েক জাহাজ লুঠ করে বসল।

পর্তুগীজদের এত বড় ঔদ্ধত্যে জাহাঙ্গীর রেগে আগুন। তিনি হুকুম দিলেন, যে কটাকে পাওয়া যায়, হয় ধরে নিয়ে আয়, না হয় ঘাড় ধরে বার করে দে। বড্ড বাড় বেড়েছে বেটাচ্ছেলেদের……।

এই ব্যাপারে মুঘল সৈন্যের হাতে পর্তুগীজরা বেশ একচোট মার খেল, তাদের একচেটে আধিপত্যে খানিকটা ভাঁটা পড়ল।

পর্তুগীজদের সর্বনাশে ইংরেজরা উল্লসিত—পৌষমাসের আশায় তারা উৎফুল্ল। অত্যন্ত গোবেচারা ভালো মানুষের মতো তারা মুঘল দরবারে আনাগোনা শুরু করল।

প্রথম জেম্‌সের কাছ থেকে একখানা পরিচয়পত্র ও সুপারিশ নিয়ে ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দে এলেন উইলিয়াম এডোয়ার্ড্‌স্‌।

সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

উইলিয়াম এডোয়ার্ডস্ খুব খুশি ও আশান্বিত হয়ে উঠলেন, যখন দেখলেন পর্তুগীজদের ওপর সম্রাটের আগেকার টান তো নেই-ই, উপরন্তু তাদের দুর্ব্যবহারে সম্রাট অত্যন্ত বিরক্ত।

কিন্তু আসলে উইলিয়াম এডোয়ার্ডস্-ও কোন কাজের কাজ করতে পারলেন না। ভারতবর্ষে বাণিজ্য-সংক্রান্ত কোন সুবিধেই ইংরেজরা পেল না।

ওলন্দাজরাও ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল। তবে ভারতবর্ষের ভেতরে আধিপত্য স্থাপনের চাইতে এদের বেশি দৃষ্টি ছিল ভারতমহাসাগরে ভাসমান সম্পদশালী দ্বীপগুলির ওপর।

ওলন্দাজরা প্রটেস্ট্যান্ট, পর্তুগীজরা ক্যাথলিক। সুতরাং ধর্মীয় ব্যাপারে প্রথম থেকেই এই দু'দলে প্রবল শত্রুতা আরম্ভ হল। মাঝখান থেকে ইংরেজদের সুবিধে হয়ে গেল।

তবে যতটা ভাবা গিয়েছিল ততটা নয়।

এবার এলেন স্বনামধন্য ইংরেজ দূত স্যার টমাস রো—ঐ ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দেই। তাঁর সঙ্গে এলেন চ্যাপলেন বা পাদ্রী টেরী। টমাস রো অত্যন্ত কূটনীতিবিশারদ ও বুদ্ধিমান ছিলেন।

জাহাঙ্গীর তখন আজমীরে। সেখানে তিনি বিরাট দরবার খুলে বসেছেন, মেবার জয়ের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আছেন।

১৬১৬ খ্রীস্টাব্দে জানুয়ারী মাসে টমাস রো আজমীরে উপস্থিত হলেন। বিনীত মোলায়েম ভাষায় সম্রাটের সঙ্গে প্রথম আলাপ করলেন। তাঁর সৌজন্যে সম্রাট খুশি হলেন। কৌতূহলী হলেন ইংরেজ দূতের মাঝে মাঝে-দেওয়া বিচিত্র উপহারে—নানারকমের পুতুল, খেলনা, কুকুর, তার মধ্যে আবার আইরিশ গ্রে হাউণ্ড—শিকারী কুকুর, ঘোড়া, নরম লোমের দস্তানা, টুপি, কোট, ভেলভেট, কুশন, দাড়িকামানোর বাক্স, আরও কত টুকিটাকি।

মণিমুক্তো, সোনারূপোর মধ্যে বসে-থাকা সম্রাটের কাছে এই ধরনের উপহার বেশ খানিকটা বৈচিত্র্য এনে দিত।

টমাস রো উপহারের জন্য একবার বিলেত থেকে কাচের আলমারিও আনিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে জাহাজ পৌঁছনোর পর যখন উপহারটি খোলা হল, তখন দেখা গেল, কি জিনিস কিছু বোঝার জো নেই, ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে।

এই বিদেশীর চোখে নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছিল সিংহাসনের আড়ালে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের বুদ্ধির খেলা, তাঁর কূটনৈতিক চাতুরী, সীমাহীন আকাশের মতো তাঁর ক্ষমতার বিস্তার। এই বিদেশী আরও লক্ষ্য করেছিলেন, নূরজাহান-চক্রের নির্দেশে রাজ্যের শাসন, নূরজাহানের অঙ্গুলি হেলনে রাজকর্মচারীদের (যত উচ্চপদস্থই হোন না কেন) উত্থান ও পতন।

একদিকে নূরজাহান-চক্রের চক্রান্ত, অন্যদিকে বন্দী খসরুকে কেন্দ্র করে প্রাচীন আমীর-ওমরাহ্ রাজকর্মচারীদের অসন্তোষ, এই চক্রের বিরুদ্ধে তাঁদের দাঁড়ানোর প্রয়াস—এই বিক্ষোভের মাঝখানে স্যার টমাস রো প্রথমটায় সত্যিই থমকে গিয়েছিলেন। তারপরেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কার মাধ্যমে, কার কাছে আবেদন করলে ইংরেজ-বাণিজ্যের সুবিধে হবে, তাঁর এতদূর বয়ে আসা সার্থক হবে।

তিনি স্পষ্টাক্ষরে তাঁর রোজনাম্‌চায় লিখলেন, "Normahall is my sollicitor, ar.ᵈ her brother my broker"—নূরমহল আমার উকিল, তাঁর ভাই আমার দালাল! এঁদের সাহায্য না পেলে সম্রাটের কাছে আবেদন করা চল.ব না।

এদিকে নূরজাহানও বুঝেছিলেন, খাঁটি ব্যবসাদারের জাত এই ইংরেজ। কোন কাজে ওদের তড়িঘড়ি নেই,—ধীর-স্থির বুদ্ধিমান। নূরজাহান ইংরেজদের বাণিজ্য সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়েছিলেন, আনুকূল্য দেখিয়েছিলেন। এমন কি ভাই ·াসফ খাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন ইংরেজদের বাণিজ্য দ্রব্যগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যেন ভাল ব্যবস্থা হয়।

অবিশ্যি আখেরে টমাস রোও খুব সুবিধে করতে পারেন নি।

মুঘলযুগে যখন নারীসমাজ ছিল কালো পর্দায় ঢাকা, বাদশাহের হারেম ছিল জাফ্‌রিকাটা দেওয়ালে বন্দী, সাম্রাজ্যে ছিল হাজার রকমের রাজনৈতিক সমস্যা-ষড়্‌যন্ত্র, ঠিক সেই সময় নূরজাহান যে-কোন এক দক্ষ সম্রাটের মতোই রাজকার্য চালিয়েছিলেন। সম্রাট আকবরের বিরাট ঐতিহ্যে-ভরা শাসনের ঠিক পরেই রাজ্যচালনায় নূরজাহানের এই কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। আভ্যন্তরীণ শান্তি, বৈদেশিক কূটনীতি, শাসনসংস্কার, শিল্প-সৌন্দর্য অনুশীলন, তার বিকাশ—সব কিছুতেই ছিল নূরজাহানের উপদেশ ও নির্দেশ। সব ঐতিহাসিকেরাই জাহাঙ্গীরের শাসনকালকে মোটামুটি সম্পদ-ঐশ্বর্যে-ভরা শান্তিপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন। এই কৃতিত্ব নূরজাহানের প্রাপ্য। জাহাঙ্গীর এই নূরজাহানেরই বুদ্ধিতে হেলান দিয়ে মোটামুটি সুখে রাজত্ব করে গেছেন।

চব্বিশ ঘণ্টা দিনরাতে মুঘল সম্রাটের নিয়ম মাফিক রুটিন জাহাঙ্গীর মেনে গেছেন অতি যত্নে। নূরজাহান সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন, সম্রাটের দৈনন্দিন মহিমা যেন এতটুকু ক্ষুণ্ণ না হয়, কখনও যেন না হয়। তাই টমাস রো এবং টেরী, হকিন্স ইত্যাদি অন্যান্য ভ্রমণকারীদের বিবরণে বিস্তৃতভাবে ফুটে উঠেছে জাহাঙ্গীরের নিত্যকার কাজকর্তব্যের রুটিন।

সম্রাটের প্রতিদিনের রুটিনে ঝরোখা-দর্শন ছিল সবচাইতে মহিমামণ্ডিত। সম্রাটের আভিজাত্যে এর স্থান ছিল অনেকখানি।

প্রতিদিন ভোরবেলা সম্রাট এসে দাঁড়াতেন তাঁর নির্দিষ্ট প্রাসাদ-অলিন্দে, নিচে যমুনার ধারে মাঠটিতে জমা হত সম্রাটের দর্শনপ্রার্থী অগণিত লোক। সতৃষ্ণ নয়নে তারা তাকিয়ে দেখত তাদের সম্রাটকে। ঈশ্বরকে চোখে দেখা যায় না, সম্রাটকে তো দেখা যায়! সম্রাটের ক্ষমতাকে উপলব্ধি করা যায়। ইহলোকে তিনিই তো ঈশ্বর; পুরোপুরি না হলেও, প্রতিনিধি তো বটে।

দিল্লীশ্বরের নামে খুত্‌বা পাঠ করিয়ে আকবরশাহ্‌ সম্রাটের

আসনকে আরও উঁচু করে দিয়েছিলেন—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা'—সেই আসন জাহাঙ্গীরের আমলে যেন এতটুকু হেলে না পড়ে—এই দিকে জাহাঙ্গীরের চাইতেও বেশি নজর ছিল নূরজাহানের।

সম্রাটের ঝরোখা দর্শনে সশ্রদ্ধ নতি জানাতো দর্শনার্থীর দল—সম্রাটের জয় হোক, সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন—এই ছিল তাদের একমাত্র প্রার্থনা। সম্রাট-দর্শনে তাদের জীবন ধন্য হত।

ধন্য মনে করতেন নূরজাহান নিজেকেও। ফুলকাটা পাথরের আড়ালে নূরজাহান বসে থাকতেন, জাহাঙ্গীরের শুভকামনায় প্রজাদের জয়ধ্বনিতে তিনি বিজয়িনীর হাসি হাসতেন। কায়া-সম্রাটের দীর্ঘায়ুর জন্য প্রজাদের শুভকামনায় যে ছায়া-সম্রাজ্ঞীর শক্তি বৃদ্ধি, এ কথা কি সেদিন কেউ জানত ?

মুঘলসম্রাটদের এই ঝরোখা-দর্শন মুঘল-রাজনীতিতে এত গুরুত্ব-পূর্ণ ছিল, যে সম্রাট অসুস্থ হয়ে পড়লেও তিনি যতক্ষণ সক্ষম থাকতেন, প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পরে প্রজাদের দেখা দিতেন। তাদের প্রমাণ দিতেন, তিনি আছেন।

সম্রাটের দৈনন্দিন রুটিনে এতটুকু বিশৃঙ্খলা ঘটলে প্রজাদের মনে সংশয়ের ঝড় উঠত, আর সামান্যতম সুযোগে মুঘলযুগে রাজনৈতিক আকাশে ঝড় ওঠা কোন বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল না। তাই সূর্যোদয়ের পরেই সম্রাট ব্যস্ত হয়ে উঠতেন, কতক্ষণে চাক্ষুষভাবে প্রমাণ দেবেন তিনি আছেন, আর প্রজারাও প্রমাণ পাবে, তাদের সম্রাট, যেমনই হোন না কেন,—আছেন, তাদের সামনেই আছেন। এই তো গেল সকালের ব্যাপার। দুপুরবেলা সম্রাট হাতী বা অন্য কোন বন্য দুর্দান্ত পশুর লড়াই দেখে সময় কাটাতেন, খেলা দেখার নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে সম্রাট একবার অন্দরমহলে যেতেন। খাওয়া দাওয়া করতেন, একটু বিশ্রাম নিতেন। আর সেই ফাঁকে হারেমের মেয়েদের নানা অভাব অভিযোগ শুনতেন। হারেমের শৃঙ্খলা রক্ষা করা মুঘল সম্রাটের অন্যতম কর্তব্য ছিল। হাজার কয়েক মেয়ে নিয়ে ছিল

মুঘল হারেম। তাদের নির্দিষ্ট ঘর ছিল। আর তাদের তত্ত্বাবধনের জন্য ছিল মেয়ে-দারোগা।

সন্ধ্যের সময় সম্রাট বসতেন দরবারে—বিখ্যাত দেওয়ান-ই-আমে। ঐশ্বর্য আর সম্ভ্রম দিয়ে দরবার সাজানো হত, নূরজাহান তাঁর নিজস্ব শিল্পরুচি আর ফ্যাশান দিয়ে জাহাঙ্গীরের দরবারগৃহকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন। ঝকঝকে চাঁদোয়ার নিচে থাকত সম্রাটের আসন। তার ওপর মহার্ঘ রাজকীয় পোশাক পরে সর্ব অবয়বে ঐশ্বর্যের বান ডাকিয়ে সম্রাট বসতেন।

উপস্থিত সকলকে চোখ মেলে দেখা, আর তারই সঙ্গে নিজেকে দেখানো, এই ছিল সম্রাটের প্রধান কাজ।

দরবারে বসে সম্রাট বিচারকার্য চালাতেন, অভিযোগ শুনতেন, রায় দিতেন।

সিংহাসনের নিকটতম অন্তরঙ্গ হয়ে বসতেন সচিব সেনাপতি, আমীর ওমরাহের দল। অবশ্য তাঁদের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ ছিল। রূপোর রেলিং দিয়ে ঘেরা সুন্দর কার্পেট পাতা, রেশম ভেলভেট দিয়ে সাজানো একটু উঁচু জায়গায় বসতেন রাজ্যের উচ্চতম কর্মচারী, সম্ভ্রান্ত জন, বৈদেশিক দূত, আর বিদেশাগত সম্মানিত ভ্রমণকারী অতিথি।

এর পরের ধাপে থাকতেন অন্যান্য ভদ্রজন, আর বাদবাকি অংশে ছড়িয়ে থাকত সাধারণ প্রজা।

দরবারের সব কিছু ব্যস্ততার মধ্যেও সম্রাটের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য ছিল, উপস্থিত সকলের মনে নিজের চেহারার একটা শিলমোহরী ছাপ ফেলা।

মুঘলযুগের সম্রাট ছিলেন সর্বেসর্বা। তবু ঝরোখা ও দরবারের মাধ্যমে প্রজাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করার গুরুত্ব তিনি ভাল করেই জানতেন।

দরবারে শুধু বিচারকার্যই চলত না। টমাস রো বলেছেন, সুন্দর সাজ-পরানো নোতুন আমদানি হাতীঘোড়াও এই সময়ে সম্রাটের

সামনে লাইন করে নিয়ে যাওয়া হত। জাহাঙ্গীরের হাতীঘোড়ার সংখ্যাতেও ছিল একটা মোঘলাই মহিমা।

রাত্রি ঘনিয়ে এলে সম্রাট তাঁর খাসমহল বা দেওয়ান-ই-খাসে যেতেন। সেখানে পূর্ব অনুমতি ছাড়া কারো যাওয়ার অধিকার ছিল না। সুতরাং পছন্দসই উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বন্ধুরাই শুধু এখানে আসতে পেতেন। সম্রাট তাঁদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও পরামর্শ ইত্যাদি করতেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে পানপাত্রে 'সিপ' দিতেন।

রাত বাড়ত, সম্রাটের চোখের পাতা ভারি হয়ে আসত, গোলাপী চোখ লাল হত, হাজার বাতির মালা-সাজানো ঝাড়লণ্ঠন তাঁর চোখের সামনে দুলে দুলে উঠত, দুলে উঠত সম্রাটের মন—হারেমে যেতে হবে।

হারেম—আরব্যরজনীর সহস্র-এক গল্পের নায়িকারা যেখানে অপরূপ ভঙ্গিমায় মোহিনী মায়ার জাল বুনত, যেখানে পানপাত্রে সাকীর উদ্দাম যৌবন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হারেম হাতছানি দিত সম্রাটকে, দীর্ঘ ছায়াকে দীর্ঘতর করে ধীরমন্থর পায়ে সম্রাট এগিয়ে যেতেন······

জাহাঙ্গীরের হারেমে বহু নারী, তাদের সহস্র অঙ্গে বিচিত্র রূপ! তবু টমাস রো-এর ভাষায়, "Though hee keepe a thousand, yet one governs him, and wynds him up at her pleasure···" হাজারের মধ্যে একজন নারী, যাঁর ইচ্ছা আর ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত হত সম্রাটের গতি, তাঁর রীতি আর নীতি।

ইনিই ছিলেন নূরজাহান।

জাহাঙ্গীর যখন যেভাবে উপস্থিত হন না কেন, ঠিক ছায়ার মতো লোকচক্ষুর অগোচরে নূরজাহান সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে থেকেছেন, তাঁর ওপর প্রভাব ও ক্ষমতা বিস্তার করেছেন।

সিংহাসনে সম্রাট বসে থাকলেও তাই উপস্থিত সকলেই উপলব্ধি করেছেন—সিংহাসনের পেছনে জাফরিকাটা পাথরের অন্তরালে আছে

ছুটি দীপ্ত চোখ, তীব্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে প্রত্যেকের সামান্যতম গতিবিধি, কথাবার্তার ভঙ্গী, বুকের নিচে চাপা ষড়্‌যন্ত্র বা যে-কোন মতলব।

'মাসির-উল-উমারা'তে উল্লিখিত আছে, জাহাঙ্গীরের নামে কেবল খুত্‌বা পাঠ করা হত—এছাড়া রাজ্যের সব কটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলত নূরজাহানের নির্দেশে—এমন কি মাঝে মাঝে তিনি ঝরোখাতেও বসতেন, সামনে ঝুলত সূক্ষ্ম চিকের আবরণ' তিনি দেখতে পেতেন সবাইকে, নিজে থাকতেন অদর্শনীয়া। সেই অদেখা অপূর্বাকে তসলিম-কুর্নিস জানাত সকলে। উচ্চপদস্থ ক্ষমতাবান রাজকর্মচারীরা রাজকার্য সম্বন্ধে আদেশ প্রার্থনা করে উৎসুক উদ্বিগ্ন হয়ে তাকিয়ে থাকতেন—কি বিধান ঘোষণা করা হবে ঐ জালের আড়াল থেকে কে জানে। মধুক্ষরা কণ্ঠস্বরে কী তীব্র সুকঠিন ভাষা, ইস্পাতের ফলার মতো কী তীক্ষ্ণ আদেশ। আভূমি মাথা নীচু করে সেলাম দিয়ে তাঁরা তাঁদের আনুগত্য জানাতেন। সাধ্য কি, কারো একচুল এদিক ওদিক নড়বার!

তবু কয়েকজন প্রবীণ, কয়েকজন শক্তিধারী উচ্চাকাঙ্ক্ষী সভাসদদের বুকের অন্তরতম স্থানে কি একটা প্রতিবাদ যেন মাথা ঠেলে উঠত। সম্রাট যখন বেঁচে, তিনি যখন সিংহাসনে বসে, তাঁর দৈনন্দিন রুটিনে যখন এতটুকু গরমিল নেই, তখন কেন এই দৈববাণী? কেন সবাই আড়ালের দীপ্তিকে ভয় পাবে?

নূরজাহানের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এইখানেই।

মাঝে মাঝে নূরজাহান অশান্ত হয়ে উঠতেন। আরও শক্ত করে জাল বাঁধতে হবে। ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে জাল বিছিয়ে দিতে হবে, রাঘব বোয়াল থেকে চুনোপুঁটি পর্যন্ত—সবাইকে এর মধ্যে টেনে আনতে হবে। ছিদ্রজালে তারা ঢুকবে, নিশ্ছিদ্র জালে তারা বন্দী হয়ে থাকবে। তবে না নূরজাহানের রাজত্ব! তাঁর চক্রের চক্রান্ত!

নূরজাহান অস্থির হয়ে উঠতেন। আসমৎ বেগম এসে পেছনে

দাঁড়াতেন, মেয়ের মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন, মৃদুকণ্ঠে কত কি বলে মেয়েকে ধীরে ধীরে শান্ত করতেন।

সামনে এসে দাঁড়াতেন ইতিমদ-উদ্-দৌলা। ধৈর্য আর বুদ্ধির প্রতীক বাপকে দেখে নূরজাহান আশ্বস্ত হতেন।

পাশে এসে দাঁড়াতেন আসফ খাঁ। তাঁর চতুর দুটি চোখে ঝকঝকে আলো। নূরজাহান ভরসা পেতেন।

কাছে এগিয়ে আসতেন শাহ্জাদা খুররম। নূরজাহানের মন খরগোশের মতো লাফিয়ে উঠত। নূরজাহানের হাতিয়ার খুররম, তাঁর আশার বাতি জ্বেলে রাখার কত বড় সলতে খুররম।

চারদিকে এত সব থাকতে নূরজাহান-চক্রের ভয় কি? নূরজাহান নির্ভয়ে উঠতে লাগলেন।

রাত গভীর হয়ে আসত। নূরজাহান তাকিয়ে থাকতেন লাল-নেশায়-আচ্ছন্ন নিদ্রাতুর জাহাঙ্গীরের দিকে। জড়িত কণ্ঠে সম্রাট যখন আরও পানীয়ের আদেশ দিতেন, শ্লথ হাতে মদের গেলাস মুখের কাছে ধরতেন, নূরজাহান বাধা দিতেন। চাঁপা-কলি গোলাপী হাতে টেনে নিয়ে আসতেন বিষপাত্র। জড়িত রুক্ষ কণ্ঠে সম্রাট প্রতিবাদ করতেন। কখনও-বা নেশার ঘোরে নূরজাহানকে আঘাত দিতেন। নূরজাহান অসীম ধৈর্য নিয়ে বসে থাকতেন। একটি দুরন্ত ছেলের মতোই যেন সম্রাটের ব্যবহার, আঘাত করলে লাগে না। সব কিছু মেনে নিয়েই তো সম্রাটকে রক্ষা করতে হবে। সুস্থ দেহে সহজ মনে তাঁকে যে প্রতিদিন ঝরোখাতে দাঁড়াতেই হবে, দরবারে বসতেই হবে। নইলে নূরজাহানের কি উপায় হবে? নূরজাহান-চক্রের কি গতি হবে?

সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন

এবার এল আর এক সমস্যা। এল নয়, আগের থেকে এসেই

ছিল। দক্ষিণভারতে মুঘল আধিপত্য স্থাপনের প্রশ্নটা যেন ক্রমেই জটিল হয়ে পড়ল। আকবর যে আকবর, যিনি উত্তরভারতকে সর্ষের ফুল দেখিয়ে ছেড়েছিলেন, তিনি পর্যন্ত বিন্ধ্যপর্বত আর নর্মদা পার হয়ে আহ্‌মদনগর, খান্দেশ, বেরার অসিরগড়—এই কটি জায়গায় মুঘল-শক্তির আস্ফালন দেখিয়েছিলেন মাত্র। তাও অনেক মেহনত স্বীকার ক'রে।

শুধু মুঘলরা নয়। কোন্ প্রাচীন হিন্দুযুগ থেকে উত্তর ভারতের শক্তিশালী বীর্যবান সম্রাটেরা সমানে চেষ্টা করে গেছেন বিন্ধ্য-সাতপুরা পর্বতমালা পেরিয়ে দক্ষিণের মালভূমিতে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য। মাঝে মাঝেই উত্তরের অভিযান ধাক্কা দিয়েছে দক্ষিণকে, আবার দক্ষিণ থেকেও পাল্টা জবাব পেতে দেরি হয় নি। উত্তর দক্ষিণ—এই দু'অংশেরই শক্তিশালী সম্রাটেরা স্বপ্ন দেখেছেন আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের একচ্ছত্র রাজচক্রবর্তী হবার।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে দুটি রাজ্যের উত্থান চোখ ঝলসে দিয়েছিল। একটি বাহমনী, অপরটি বিজয়নগর। তারপর যেমন হয়—পারস্পরিক বিবাদে দুটি রাজ্যেরই পতন। এক বাহমনী রাজ্য ভেঙে বেরার, বিদর, আহ্‌মদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা—এই পাঁচটি টুকরো রাজ্যে পরিণতি লাভ করল।

আকবরের রাজত্বকালে বেরার আহ্‌মদনগরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। বিদরের বিশেষ কোন প্রাধান্য ছিল না, কিন্তু খান্দেশের দব্‌দবা ছিল খুব—যেমন শক্তি, তেমনি ধনৈশ্বর্য।

সম্রাট আকবরের দৃষ্টি পড়ল দক্ষিণের এই দেশগুলিতে। তাঁর লক্ষ্যস্থল ছিল খান্দেশ, আহ্‌মদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা। দক্ষিণের আনুগত্য লাভ করার জন্য আকবর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। তিনি যখন চাঁদসুলতানার বীরত্ব ও সংগঠনী শক্তিকে দমিয়ে, অসিরগড়ের দুর্ভেদ্যতাকে ভেঙে দিয়ে সেখানে মুঘল আধিপত্যের ভিত খুঁড়লেন, ঠিক তখনি রাজকুমার সেলিমের বিদ্রোহ তাঁকে উত্তর ভারতে চলে

আসতে বাধ্য করল। আকবর যদি দক্ষিণে আর কিছুদিন থাকতে পারতেন, তাহলে ভবিষ্যতে সেলিমেরই লাভ হত।

সম্রাট জাহাঙ্গীরও চাইলেন দক্ষিণভারতে মুঘল-আধিপত্য স্থাপিত হোক, উত্তরের মতো দক্ষিণের অধিবাসীরাও মুঘল-মাহাত্ম্যের জয়গান করুক।

এ সব কথা ভাবতে তো খারাপ লাগে না, কাজে এগোন নিয়েই কথা।

প্রথমেই তো ধরতে হবে আহ্‌মদনগরকে। কিন্তু ধরার সাধ্য কি! ওখানে তখন বসেছিলেন বীরকেশরী তীক্ষ্ণধী মালিক অম্বর। জাতে ছিলেন আবিসিনীয়, জীবনের কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল ক্রীতদাস হিসেবে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যোগ্যতা ও বুদ্ধির মিটার বেড়েছিল দ্রুত গতিতে। আহ্‌মদনগরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, বেরার-জয়ী চেঙ্গিস খাঁ—যাঁর অধীনে মালিক অম্বর কাজ শুরু করেছিলেন—তিনি তো প্রথমে অবাক, তরপরে মুগ্ধ। ফলে মালিক অম্বর অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছিলেন।

মুঘল কাহিনীকারেরা পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন মালিক অম্বরের বিচারক্ষমতা আর তাঁর শাসনতান্ত্রিক যোগ্যতার।

শুধু তাই নয়, রাজা টোডরমলের অর্থনৈতিক আদর্শকে গ্রহণ করে তিনিও এক সুন্দর রাজস্বনীতি গড়ে তুলে রাজ্যের অশেষ উপকার ও উন্নতি করেছিলেন।

সকলের ওপর মালিক অম্বরের সৈন্য ও যুদ্ধপরিচালনার খ্যাতি তো ছিলই। তার হাতিয়ারকে ভয় পেত না এমন লোক তখন খুব কমই ছিল।

কোন দিক দিয়েই যেন মানুষটির কোন ঘাটতি ছিল না। মন্ত্রী আর সেনাপতি, এ দুইয়েরই এক বিরল সমন্বয় ঘটেছিল মালিক অম্বরের মধ্যে।

এ-হেন মালিক অম্বর জাহাঙ্গীরের সময়ে আহ্‌মদনগরের হাল

ধরেছিলেন। আকবরের সময় আহ্‌মদনগরের যতখানি মুঘলদের হাতে চলে এসেছিল, দক্ষিণে-পাঠানো মুঘল সেনাপতি-অধিনায়কদের নিজেদের মধ্যে মারামারি খেয়োখেয়ির সুযোগে তিনি সেগুলো এক এক করে উদ্ধার করতে লাগলেন।

এই ব্যাপারে মালিক অম্বর যুদ্ধনিপুণ দুঃসাহসী মারাঠি ঘোড়-সওয়ারদের সাহায্য নিলেন। উপরন্তু 'গেরিলা' নীতিতে যুদ্ধ করে তিনি মুঘলদের ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন—তারা কিছুতেই কোন সুবিধে করে উঠতে পারল না।

জাহাঙ্গীর সম্রাট হওয়ার তিন বছর বাদে, ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে আবদুর রহিম খানখানাকে অধিনায়ক করে দক্ষিণভারতে পাঠালেন—যাতে তিনি এক দিকে সেখানে মুঘলশিবিরের বিশৃঙ্খলা দমন করেন, অন্যদিকে মালিক অম্বরকে জব্দ করেন।

কিন্তু খানসাহেবের ব্যক্তিত্বও পারল না মুঘলশিবিরের কর্তাদের পারস্পরিক হিংসা-দ্বেষ মিটিয়ে শৃঙ্খলা আনতে; আর নিজেদের মধ্যে এত গোলমাল থাকলে কি মালিক অম্বরের মতো লোককে ঠেকানো যায়?

সব দেখে শুনে জাহাঙ্গীর দক্ষিণে পাঠালেন রাজকুমার পরভেজ, সেনাপতি সরিফ খাঁ ও আসফ খাঁকে।

পরভেজ হলেন খান্দেশ ও বেরারের গভর্ণর, তার ওপর সমরা-ধিনায়ক। কিন্তু এতখানি পদবৃদ্ধি হয়ে লাভ কি? পরভেজের পানাসক্তি, চারিত্রিক শৈথিল্য আর প্রচুর অহঙ্কার ছাড়া আর তো কোন গুণ ছিল না। বুরহানপুরে তিনি আসর জাঁকিয়ে বসলেন বটে, কিন্তু কর্তৃত্ব রইল সেই খানখানার-ই হাতে। আসল কাজের কিন্তু কোনই সুরাহা হল না। মুঘলশিবিরে সেই গোলমাল চলতে লাগল, আর এই সুযোগের সুবিধা নিয়ে মালিক অম্বর এগিয়ে গেলেন।

জাহাঙ্গীর মহা বিপদে পড়লেন। দক্ষিণ থেকে উত্তরে যে সব সংবাদ যেতে লাগল তাতে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা।

জাহাঙ্গীর পর পর নামী নামী সেনাপতিদের পাঠাতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন খানজাহান লোদী, বীরসিং দেও, সুজত খাঁ, রাজা বিক্রমজিৎ, মেবার জয়ে খ্যাত আবদুল্লা খাঁ, আর মানসিংহ।

এরই মধ্যে খানখানা একবার আহ্‌মদনগর আক্রমণ করতে গিয়ে এমন তছনছ হয়ে ফিরে এলেন, হীন সর্তে সন্ধি করলেন যে, জাহাঙ্গীর তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি মুখ কালো করে মুঘলসম্রাটের সামনে উপস্থিত হলেন। সম্রাট্ থেকে শুরু করে সবাই তাঁকে ছি-ছি করতে লাগলেন।

এবার আবদুল্লা খাঁ সাজ-সাজ রব তুলে সব ঠিকঠাক করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন। এবার তিনি যে ব্যবস্থা করেছেন মালিক অম্বরকে নাকি মুখে আর রা কাড়তে হবে না।

আহ্‌মদনগর আক্রমণ করার জন্য আগে একটা এ্যাডভান্স্ পার্টি বেরিয়ে গেল। তাতে রইলেন খানজাহান লোদী, মানসিংহ এবং আমীর-উল-উমারা।

শত্রুকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা হলো। দেখা যাক বাছাধনেরা এবার কি ক'রে কি করেন। আবদুল্লা খাঁ গোঁফে চাড়া দিলেন।

আবদুল্লা খাঁয়ের এই দম্ভটাই হল কাল। এই দম্ভের ফলে তিনি যে ভুলটি করলেন, আর তার মাশুল দিতে গিয়ে যে কাণ্ডটি হল, তা আর বলার নয়।

যেখানে আগে ঠিক হয়েছিল সবাই মিলে একসঙ্গে বেশ গুছিয়ে আহ্‌মদনগরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, সেখানে একা যুদ্ধজয়ের সব গৌরব নেবার জন্য আবদুল্লা খাঁ একদল সৈন্য নিয়ে অন্য দিক দিয়ে আহ্‌মদনগরে ঢুকলেন।

ঢুকে খুব খুশি। সব তো ফাঁকা। কোথায় বা শত্রুসৈন্য, কোথায়-কি! বাধা-বিপদ কিছুই তো নেই। ব্যাটারা সব ভয়ে পালিয়েছে দেখছি……

আবদুল্লা খাঁ নির্বিবাদে ঢুকে পড়লেন আরও ভেতরে—দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঘেরা ঐ পাহাড় উপত্যকার দেশে। ওদিকে একবার যেন কেমন মনে হল তাঁর ঘোড়সওয়ারের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে গেছে। তবে তাই নিয়ে বেশী মাথা ঘামানোর সময় পাওয়া গেল না।

আবদুল্লা খাঁ যখন অনেকটা ঢুকে পড়লেন তখনই আরম্ভ হল মালিক অম্বরের 'গেরিলা' যুদ্ধের খেলা। আবার খেলছে কারা? মারাঠীরা—যারা এর আগেই গোপনে ঘোড়সওয়ার হিসেবে কিছুটা মুঘল সৈন্যবাহিনীতে মিশে গিয়েছিল। এই মারাঠীরা চোখের পলক না পড়তে কাজ হাসিল করে চলে গেল। যখন-তখন যেখানে-সেখানে থেকে মুঘলদের ওপর গুলিগোলা চলতে লাগল—যারা শত্রুর হাতে ধরা পড়ল, তাদের নাক আর কান কেটে নেওয়া হল।

কিছুতেই এই মারাঠীদের মুখোমুখি করা গেল না। তাই মুঘল সম্রাটের অত যে বিরাট সৈন্যবাহিনী, তা কোন কাজেই লাগল না।

পরাজিত সেনাপতিরা গজরাতে লাগলেন—সামনে আসার মুরোদ নেই, কেবল আড়াল থেকে ইয়ার্কি করা···

আবদুল্লা খাঁ দৌলতাবাদে পৌঁছলে অবস্থা আরও শোচনীয় হল। আর কোন উপায় না দেখে তিনি এবার সসৈন্যে পিছোতে লাগলেন। ফেরার পথে শত্রুসৈন্যের হাতে যতদূর নাজেহাল হবার হলেন। সাধারণ সৈন্য তো মারা গেলই, কয়েকজন নামী সেনাপতিও শেষ হয়ে গেলেন।

আহ্‌মদ নগরের সীমা পার হয়ে আবদুল্লা খাঁ যতক্ষণ না মিত্ররাষ্ট্র বাগ্‌লানায় এসে পৌঁছলেন, ততক্ষণ আর হাঁপ ছাড়তে পারলেন না। সেখান থেকে গেলেন গুজরাটে।

পরাজয়ের এত বড় কালিমা নিয়ে ফিরে আসতে হবে, আবদুল্লা খাঁ এটা ভাবতেও পারেন নি।

জাহাঙ্গীরের কানে এ কলঙ্কের কাহিনী পৌঁছলে তিনি রাগে

দুঃখে অস্থির হয়ে উঠলেন। যুদ্ধফেরত সেনাপতিরা যখন মাথা নীচু করে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন, তখন তিনি তাঁদের ধরে ধরে যাচ্ছেতাই করে বকলেন।

আর আবদুল্লা খাঁ ?

আবদুল্লা খাঁ সম্রাটের কাছ থেকে যে-সমস্ত বুলি শুনলেন, তাঁর ইচ্ছে করছিল এর চাইতে জল্লাদ এসে তাঁর মাথাটা কেটে নিক। এ লজ্জা-অপমান আর সহ্য করা যায় না।

সভাসদরা বললেন, যাকগে, যা হবার তা তো হয়েইছে, এখন খানখানাকেই যুদ্ধের সব কিছু দায়িত্ব দিয়ে আবার দক্ষিণে পাঠানো যাক। কেন না উনি হেরেই আসুন, আর যাই করুন, দক্ষিণে উনি এতদিন ছিলেন, ওখানকার হালচাল উনিই ভাল বোঝেন। নিজেদের মধ্যে এত খেয়োখেয়ি না থাকলে খানখানা নিশ্চয়ই জয় লাভ করতে পারতেন, তাঁর সে ক্ষমতা আছে।

সকলের পরামর্শ নিয়ে নিজেও খানিকটা ভেবে-চিন্তে জাহাঙ্গীর খানখানাকে আবার সর্বাধিনায়ক করে দক্ষিণে পাঠালেন। সে বছরটা ছিল ১৬১২ সাল।

খানসাহেবের এবারে বেশ খানিকটা সুবিধে হয়ে গেল। কারণ ইতিমধ্যে মালিক অম্বরের দলেও গোলমাল বেধে গিয়েছিল। সেই একতা, সেই দৃঢ়তা আর ছিল না। খানসাহেব এই সুযোগটা পুরোমাত্রায় নিলেন। মালিক অম্বর বিজাপুর আর গোলকুণ্ডার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে বিরোধের বিষটা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

মুঘলদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের জন্য আগে এগিয়ে গেলেন সেনাপতি শাহ্‌নওয়াজ খাঁ আর দরাব খাঁ, সঙ্গে গেলেন আরও কয়েকজন সেনাপতি। এঁরা তীব্রভাবে আক্রমণ চালালেন দক্ষিণী সৈন্যদের ওপর। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণী বাহিনী আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, বিপর্যস্তভাবে হেরে গিয়ে যে যেদিকে পারল, ছুটে পালালো, বেশ

কিছু বন্দী হল, তাদের অস্ত্র গোলাবারুদ কত কি যে মুঘলদের হাতে পড়ল তার ঠিক নেই।

খানখানা একটু স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন। এবারে যাহোক সম্মানটা অনেকখানি ফিরে পেয়েছেন। এর আগে যে অপমানটা পোয়াতে হয়েছে! কিন্তু সম্মান ফিরে পেলে হবে কি, তাঁর দলের লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে এমন কয়েকটা যাচ্ছেতাই কথা বলছে যে, সে আর সহ্য করা যায় না। তারা বলে কিনা খানসাহেব, যিনি ১৬১৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণে মুঘল অধিনায়ক হয়ে বসেছিলেন, তিনি নাকি সেখানে প্রচুর ঘুষ খেয়ে বেড়াচ্ছেন।

ওদিকে পরভেজের তো দক্ষিণে থাকাও যা, না থাকাও তাই। দিনকে দিন তো উনি মানুষের বাইরে চলে যাচ্ছেন।

ঠিক এই সোনার মুহূর্তে নূরজাহান-চক্র নড়েচড়ে উঠল। নূরজাহান এতদিন ধরে দক্ষিণের ব্যাপারটি শুধু দেখে গেছেন, দেখেছেন আর মনে মনে অঙ্ক কষেছেন।

খানখানার সাফল্যের খবরে জাহাঙ্গীর যখন উল্লসিত, ঠিক তক্ষুণি সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন নূরজাহান।

জাহাঙ্গীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। নূরজাহানের চোখদুটো যেন বেশী উজ্জ্বল, বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মাথাটা কেমন যেন টলে ওঠে। নূরজাহানের সমস্ত শরীরে আতরের গন্ধ মাখানো—অতর-ই-জাহাঙ্গীরের মনমাতানো গোলাপের গন্ধ।

জাহাঙ্গীরের শরীর মন মাতাল হয়ে ওঠে। নূরজাহানও ঠিক এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। স্বামীর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'দক্ষিণে এবার শাহ্জাদা খুরম যাবে। যুদ্ধে জয় হয়েছে ঠিকই, কিন্তু যুদ্ধের শেষপর্বের এখনও বাকি। শত্রুর শেষ রাখতে নেই, একথা সবাই জানে। খুরমের মতো ছেলেকে পাঠালে সব কিছু সমস্যার সমাধান হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে এমন কৌশলী ভূয়োদর্শী ছেলে কটা মেলে……!'

জাহাঙ্গীরের চোখের সামনে আলোর শিখাটি আগুনের শিখার মতো জ্বলতে লাগল। ঐ শিখা জাহাঙ্গীর বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারেন না—একটা মধুর ভীতি যেন তাঁর সামনে ফণা মেলে দাঁড়ায়।

জাহাঙ্গীর মাথা হেলিয়ে নূরজাহানের প্রস্তাবে সায় দেন,—'খুররম যাবে বৈকি, নিশ্চয় যাবে। তার মতো এমন সেনাপতি কে আছে? মালিক অম্বরের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী-খেলোয়াড় তো খুররমই···'

নূরজাহানের মুখে স্নুকুমার শুভ্রতা, জাহাঙ্গীর এই রূপের মোহে আবিষ্ট হয়ে পড়েন। তাই নূরজাহানের গোলাপী ঠোঁটের বাঁকা হাসি জাহাঙ্গীরের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। জাহাঙ্গীরের হাতে তখন পানপাত্র। তাতে লাল সিরাজী। জাহাঙ্গীরের সামনে জীবনের আলো, তাতে রূপের বন্যা। প্রাসাদের আকাশে তখন ঢেউখেলানো মেঘ, তাতে মৃদু তালের মূর্ছনা।

হঠাৎ দুটি কথা মনে পড়ে গেল জাহাঙ্গীরের। তিনি সম্রাট, তাঁকে তো শুধু সায় দিলেই চলবে না। তাঁকে আরও কিছু ভাবতে হবে না? মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে বসলেন জাহাঙ্গীর······

'কিন্তু পরভেজ? খুররমকে যদি দক্ষিণে পাঠাই তা হলে পরভেজের মন খারাপ হয়ে যাবে না? তার অসম্মান হবে না?'

জাহাঙ্গীরের এই গম্ভীর প্রশ্নে নূরজাহান একটু হাসলেন··· পরভেজের মতো ছেলের জন্য সম্রাটের এত ভাবনা? তাকে তো এলাহাবাদে পাঠিয়ে দিলেই হয়। পরভেজের দক্ষিণে থাকা যা, এলাহাবাদে থাকাও তাই। পরভেজ যেখানেই যাক না কেন, তার অস্তিত্ব নিয়ে তো কেউ মাথা ঘামাবে না। তা ছাড়া কোথায় খুররম, আর কোথায় পরভেজ! দুজনের মধ্যে কোন তুলনা হয়? সিংহের সামনে কখনও ইঁদুর দাঁড়াতে পারে···

'ঠিক কথা—' জাহাঙ্গীর মাথা নাড়লেন। বীর ছেলে খুররম, সোনার ছেলে খুররম। দক্ষিণে যদি কাউকে পাঠাতে হয় তো সে খুররম।

কিন্তু······

জাহাঙ্গীর আবার গম্ভীর হয়ে মাথা উঁচু করে বসলেন— 'খানখানা ? তাকে কি করব ? তাকে তো আর অযোগ্য বলে দূরে সরিয়ে দেওয়া যাবে না। বলতে গেলে তার জন্যেই তো দক্ষিণে মুঘল সম্রাটের যাহোক মুখ রক্ষা হয়েছে। দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে খানখানা যদি মার-মার করে মালিক অম্বরের সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়ত, তা হলে আজকে দক্ষিণে মুঘলদের কি দশা হত বল দেখি ?'

'সে তো নিশ্চয়ই, একশ বার নয়, হাজার বার সে কথা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু…'

নূরজাহান জাহাঙ্গীরের আরো কাছে সরে এলেন। আতরের গন্ধটা আরও উগ্র হয়ে উঠল, আরও একটা কি ফুলের গন্ধ যেন ভেসে আসছে। চামেলী ফুল কি ? নূরজাহানের বড় প্রিয় ফুল। গন্ধে সমস্ত শরীর মন নিথর করে দেয়।

গন্ধ-সুরভিত নূরজাহানের নিশ্বাস পড়ে সম্রাটের গায়ে—'কিন্তু খানসাহেব তো বুড়ো হয়েছেন। তাঁকে নিয়ে আর টানাটানি কেন ? শেষ-গুছনোর দায়িত্ব এবার খুররমের ওপরেই দেওয়া হোক। তার যোগ্যতাকে সম্রাট নিশ্চয় অস্বীকার করেন না…?'

নূরজাহানের নিশ্বাসের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের নিশ্বাস মেলে, নূরজাহানের নিবিড় সান্নিধ্যে জাহাঙ্গীর স্বপ্ন দেখেন…

জাহাঙ্গীর মাথা হেলালেন। তাই হোক। যোগ্যতম ছেলে খুররম, তার ওপরেই দক্ষিণ-অভিযানের সব কর্তৃত্ব দেওয়া হোক। এতে খারাপ কিছু হবে না, ভালই হবে।

নূরজাহান-চক্রের স্পিডোমিটারে কাঁটা ঘুরতে লাগল।

১৬১৬ খ্রীস্টাব্দে অক্টোবর মাসের শেষের দিকে এক শুভদিনে খুররম আজমীর থেকে দক্ষিণে রওনা দিলেন। মূল্যবান উপহার রাশি দিয়ে দক্ষিণ অভিযানের নায়ককে অভিষিক্ত করা হল। যাত্রা কালে তাঁকে যে তরবারিটি উপহার দেওয়া হয়েছিল, টমাস রো-এর মতে

তার দাম অন্ততঃ এক লাখ না হয়ে যায় না। আর দেওয়া হয়েছিল একখানা ছোরা। তারও দাম ছিল চল্লিশ হাজার।

মারণাস্ত্রকে হীরেমাণিকের ছটা দিয়ে সাজাতে মুঘল সম্রাটরা ভালবাসতেন।

শুধু কি উপহারের রাশি? এর ওপর তাঁকে শাহ্ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হল। অভূতপূর্ব সম্মান সন্দেহ নেই।

নূরজাহান-চক্রের নেপথ্যসঙ্গীত খুব দ্রুততালে উচ্চগ্রামে সুর ধরেছিল। খুররমের পথ একেবারে পরিষ্কার।

খুররম তাঁর যাত্রাপথে অগণিত টাকা পয়সা ছড়াতে ছড়াতে গিয়েছিলেন, প্রচুর লোক তাঁকে অনুসরণ করেছিল। 'খুররমের জয় হোক' ধ্বনি দিয়ে তারা পাগলের মতো রাস্তায় চলেছিল। কে বলবে, খুররমের এ যাত্রা যুদ্ধযাত্রা, শোভাযাত্রা নয়!

যুদ্ধক্ষেত্রের ধারে কাছে থাকবার জন্য জাহাঙ্গীরও সপরিবারে মালবের দিকে মাণ্ডুতে রওনা দিলেন।

সম্রাটের যাওয়া নয় তো, একটা গোটা রাজধানীর চলে বেড়ানো। সেই লোক-লস্কর, দাসদাসী, বেগম-হারেম, খোজা-প্রহরী, সৈন্যসামন্ত, বিভিন্ন কর্মদপ্তর—সব কিছু নিয়ে তবে সম্রাটের যাত্রা।

টমাস রো প্রাঞ্জল ভাষায় জাহাঙ্গীরের এই যাত্রার বর্ণনা করেছেন। সাজপোশাক জাঁকজমকের বর্ণনা তো ছিলই, উপরন্তু এবারে আর একটি জিনিসের বর্ণনা ছিল, সেটি হল একখানি ইংলিশ কোচ, একটি চার-ঘোড়ার গাড়ি। আগাগোড়া চায়না ভেলভেটে মোড়া এই গাড়িখানা টমাস রো জাহাঙ্গীরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে কোম্পানীর পক্ষ থেকে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল একজন সায়েব কোচম্যান, নাম—উইলিয়াম হেমসেল।

গাড়িটা জাহাঙ্গীরের খুব পছন্দ হয়েছিল। তাঁর আদেশে গাড়িটাকে আবার মোগলাই কায়দায় জমকালো সাজে সাজানো হয়েছিল, আর ঐ গাড়ির অনুকরণে এখানকার মিস্ত্রীরাও গাড়ি তৈরি করেছিল।

সম্রাট জাহাঙ্গীর সপরিবারে ও সদলবলে মাণ্ডু যাত্রা করলেন। এদেশে তৈরি সোনারূপো আর পারসিয়ান ভেলভেট সাজানো একটি কোচে ছিলেন সম্রাট নিজে, আর ইংলিশ কোচখানাতে চললেন নূরজাহান।

সম্রাটের আত্মার সঙ্গে তো নূরজাহানকে মিশে থাকতে হবে—যতই কেন না অন্য বেগমরা থাকুন। নূরজাহান ছাড়া সম্রাটের সব কিছু ছিল ঝাপসা। নূরজাহানের বুদ্ধি পরামর্শ ছাড়া জাহাঙ্গীর সামনের দিকে পা ফেলবেন কোন্ ভরসায়?

সম্রাট-সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে চলল হাতীঘোড়ার শোভাযাত্রা। ভেরী বাজিয়ে সম্রাটের শুভযাত্রা ঘোষণা করা হল। যাত্রা পথে মাঝে মাঝে বিশ্রাম ও শিকার করে সম্রাট মাণ্ডুতে পৌঁছলেন ১৬১৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে। আজমীর থেকে আসতে চার মাসের একটু বেশি সময় লাগল। খাড়া দুর্গম পাহাড়ের ওপর মাণ্ডু শহর। আভিজাত্যে ও ঐতিহ্যে ভরা এই শহরের এক বিশাল প্রাসাদে জাহাঙ্গীর এসে উঠলেন।

ওদিকে শাহ্ খুরম দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেছেন, পথে মেবারে রাণা অমরসিংহের সঙ্গে দেখা হল। তাঁর ছেলে করণসিং পনের শ' অশ্বারোহী নিয়ে খুরমের দলে যোগ দিলেন।

নর্মদার ধারে সাক্ষাৎ হল আবদুর রহিম খানখানা, খানজাহান লোদী আর মহাবৎ খাঁয়ের সঙ্গে। তাঁদের নিয়ে শাহ্ খুরম ১৬১৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে সদলবলে ঢুকলেন বুরহানপুরে।

এবারে শুরু হবে খেলা। খেলা হবে, আর নূরজাহানের বুদ্ধির র‍্যাডারে তার ছবি ফুটে উঠবে।

শাহ্খুরম আগেভাগেই আফজল খাঁ এবং রাজা বিক্রমজিৎকে পাঠিয়েছিলেন বিজাপুরের সুলতান আদিলশাহ্ আর মালিক অম্বরের কাছে। তাঁরা গিয়েছিলেন শান্তির প্রস্তাব নিয়ে। শাহ্খুরম অনর্থক যুদ্ধ করে ধ্বংস ডেকে আনবার বিরোধী। উত্তর আর

দক্ষিণ, এ দুইয়ের মাঝে শান্তি হোক, অনর্থক সৈন্য-অর্থ ক্ষয়ে কোন পক্ষেরই লাভ নেই।

শান্তির দূত দু'জন সাদরে অভ্যর্থিত হলেন।

একটা জিনিস মালিক অম্বর আর আদিলশাহ্ বুঝেছিলেন যে, মুঘল শিবিরে অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে এতদিন ধরে তাঁরা যে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে এসেছেন, নিজেদের সুবিধে করে নিয়েছেন, সেটি আর চলবে না। কেননা প্রথমতঃ, নিজেদের মধ্যে এতদিন যে ঐক্যের বল ছিল, তাতে ভাঙন ধরেছে, নানারকম গোলমাল শুরু হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, খুরম যে বিশাল সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে এসেছেন, তাতে যত নিপুণ কৌশলের গেরিলা-নীতিই হোক না কেন, তাঁকে ঠেকানো যাবে না।

শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে বেশী টাকার লোভে বেশ কিছু সৈন্য-সেনাপতি মুঘলদের দলে গিয়ে ভিড়েছে।

আর কেনই বা ভিড়বে না? তারা সেই কবে থেকে এখানে মুঘলদের শিবিরে রাজকীয় লোভনীয় জীবনযাত্রা দেখছে—দেখছে আর নিজেদের বনে-পাহাড়ে ছুটে বেড়ানো রুক্ষ জীবনের সঙ্গে তুলনা করছে!

মানুষের মধ্যে কেবল স্বদেশপ্রেমই থাকবে? জীবনকে ভোগ করবার লোভ থাকবে না?

মালিক অম্বর তাঁর দলের লোকদের 'সাইকোলজি' বুঝে শঙ্কিত হয়েছিলেন।

তাই মালিক অম্বর খুরমের শান্তির বাণী গ্রহণ করলেন, তাঁকে বালাঘাট রাজ্যটি ফিরিয়ে দিলেন, দিলেন আরও কয়েকটি দুর্গের সঙ্গে আহ্মদনগর দুর্গের স্বত্ব-স্বামিত্ব।

অন্যদিকে আদিলশাহ্ প্রায় পনের লক্ষ টাকা মূল্যের বিভিন্ন উপঢৌকন পাঠিয়ে খুরমকে খুশিতে উচ্ছ্বসিত করে তুললেন।

খুরম সৈয়দ আবদুল্লা বরাহ্‌কে তাড়াতাড়ি সম্রাটের কাছে

পাঠালেন—'শীগগির যাও। গিয়ে বল, দাক্ষিণাত্য বিজয় সম্পূর্ণ হয়েছে। শত্রুরা সব হেরে গিয়ে চুপসে গেছে। আমি যা বলেছি, ওরা তাই মেনে নিয়েছে···'

দূত প্রথমেই এই সংবাদ দিল—সম্রাট জাহাঙ্গীরকে নয়, সম্রাজ্ঞী নূরজাহানকে। খবর পেয়ে হাসির ঝলক নেমে এল নূরজাহানের মুখে। দক্ষিণে ঠিক সময়ে তিনি পাঠিয়েছিলেন নূরজাহান-চক্রের মূল্যবান সদস্যটিকে!

নূরজাহান সম্রাটকে সুসংবাদ জানালেন, তিনি গর্বিতভাবে তাকালেন সম্রাটের দিকে—'আমার সেনাপতি-নির্বাচনে তাহলে দেখছি কোন ভুল হয় নি সম্রাট। শাহ্‌খুরম ছাড়া এমন কাজে সাফল্য আনার সাধ্য আর কারো ছিল না, আর কারো নেই-ও···'

'তোমার মানুষ চেনার ক্ষমতার কোন তুলনা নেই নূরজাহান···' আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে জাহাঙ্গীর বললেন।

তিনি তক্ষুণি দু'লাখ টাকা আয়ের একটি জায়গীর নূরজাহানের নামে লিখে দিলেন।

দেবেন না! যে-দাক্ষিণাত্য নিয়ে সেই কবে থেকে গোলমাল চলেছে, সেখানে শাহ্‌খুরম মাত্র ছ'মাসে কি কৃতিত্বই না দেখালেন!

নূরজাহানের পরামর্শ-বুদ্ধিতেই তো সম্রাট এমন লোককে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। তাই না মুঘলদের মান বাঁচল, শেষরক্ষা হল!

নূরজাহান শুধু ঘরের লক্ষ্মী নয়, ভাগ্যলক্ষ্মীও বটে।

নূরজাহানের জয় হোক।

শাহ্‌খুরমের জয়ে মাণ্ডুতে উল্লাসের হুল্লোড় বয়ে গেল। দক্ষিণে শাসনকর্মের সব বিলিব্যবস্থা করে খুরম অক্টোবর মাসে মাণ্ডুতে এসে পৌঁছলেন!

বিরাট অভ্যর্থনা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। দক্ষিণের যুদ্ধে যিনি জয়ী হয়ে ফিরেছেন, তাঁর অভ্যর্থনা-উৎসবে রাজপরিবারের

সবাই যোগ দিয়েছিলেন, মেয়ে-পুরুষ—সব। থরে থরে সাজানো হল উপহার রাশি।

শাহ্‌খুর্‌রম পিতার সামনে এসে দাঁড়ালেন, আভূমি নত হয়ে পিতাকে কুর্নিশ জানলেন, ভূমি চুম্বন করলেন।

জাহাঙ্গীর সস্নেহে আলিঙ্গনে পুত্রকে আশীর্বাদ করলেন। তাঁকে পাশে নিয়ে অপেক্ষমান প্রজাদের ঝরোখা-দর্শন দিলেন। পুত্রের অধীন সৈন্যসংখ্যা ত্রিশ হাজার করে বাড়িয়ে দিলেন। শাহ্‌খুর্‌রমের নামান্তর হল—পিতৃদত্ত উপাধি লাভে তিনি এবার হলেন শাহ্‌জাহান—জগতের অধিপতি, পৃথিবীর রাজা। এখন থেকে সিংহাসনের নিকটতম স্থানে শাহ্‌জাহানের আসন নির্দিষ্ট হল।

নূরজাহান খুর্‌রমকে দিয়েছিলেন মুক্তো, হীরে আর চুনি বসানো একটি গাত্রাবরণ।

নূরজাহান-জুন্‌তার প্রতিটি নির্দেশ সম্রাট মেনে চলেছেন, নূরজাহানের র‍্যাডারে প্রতিটি সঙ্কেত শুভচিহ্ন নিয়ে ফুটে উঠছে। নূরজাহান নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারেন, তাঁর কোন ভয় নেই···

ভয় সত্যিই নেই। নইলে এত উৎসবে খানখানার স্থান কোথায়? যদিও তাঁকে খান্দেশ, বেরার আর আহ্‌মদনগরের গভর্নর করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সম্রাট কি তাঁকে আর কোন বিশেষ সম্মানে তৃপ্ত করেছিলেন! অথচ দক্ষিণের বাঘটিকে তিনিই তো কাবু করে-ছিলেন!

খানখানা নিজের মনেই মাথা নাড়লেন। দক্ষিণ জয়ের সমস্ত খেতাব-কৃতিত্ব একেবারে কুড়িয়ে পুঁছিয়ে দেওয়া হল খুর্‌রমকে!

খুর্‌রমের ভাগ্য, আর খানখানার কপাল! নইলে এমন হবে কেন? মাঝখান থেকে নেপোয় দই মারবে কেন?

লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এত মেহনত স্বীকার করে মুঘলরা দক্ষিণে যেটুকু সীমা বাড়ালেন, আকবরের আমলে ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণে সেটুকু সীমারেখাই টানা হয়েছিল, অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের আমলে এক ইঞ্চিও বাড়ে নি। যে মালিক অম্বর আহ্‌মদনগর আর তার আশেপাশের সবকিছু মুঘলদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দক্ষিণ ভারতে একটা ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁকে কিছুদিনের জন্য শুধু একটু বেকায়দায় ফেলা হয়েছিল—তাও সে কৃতিত্ব খুরমের নয়, পুরোপুরি আবদুর রহিম খানখানার। খুরম গিয়ে শুধু সন্ধিটুকু করেছিলেন। এ যেন বাঘ মারল একজন, তার গায়ে পা দিয়ে বুক ফুলিয়ে ফটো তুলল আরেকজন।

শান্তি হলে কি হবে, মালিক অম্বর যতদিন বেঁচে ছিলেন, দক্ষিণের ব্যাপারে অটুট শান্তি কোনদিনই আসে নি। যে মুহূর্তে শাহ্‌জাহান দক্ষিণ ছেড়ে এদিকে এলেন, সেই মুহূর্তেই মালিক অম্বর নোতুন উৎসাহে আবার সৈন্যবাহিনী সাজিয়ে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে মুঘলদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। অবশেষে ১৬২০ খ্রীস্টাব্দে মুঘলদের সঙ্গে সব শান্তিচুক্তি ছিন্ন করলেন।

দাক্ষিণাত্য জয় হয় নি ঠিকই, কিন্তু নূরজাহানের জয় হয়েছিল। নূরজাহান-চক্র আরও ধারালো হয়ে উঠল।

এরপরে জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন গুজরাটে, সঙ্গে গেলেন শাহ্‌জাহান। সমুদ্রের ধারে একটি সুন্দর প্রাচীন বন্দর—ক্যাম্বে। দু'মাস লাগল পৌঁছতে।

সাগরের উত্তাল ঢেউ, তার নীলিমায় মুগ্ধ হলেন জাহাঙ্গীর। কবিতার ছন্দ গুনগুন করে উঠল নূরজাহানের কণ্ঠে। সীমাহীন সাগরের মত্ত হাওয়ায় উদ্ধত চেতনায় উদ্বুদ্ধ হলেন শাহ্‌জাহান। ঠিক ঐরকম সীমাহীন মত্ততা দিয়ে নিজেকে শক্তিমান করে তুলতে হবে, সে শক্তির অংশীদার এ জগতে কেউ থাকবে না—কেউ নয়, কখনও নয়······একটা চাপা হুঙ্কার সাগরের ক্রুদ্ধ গর্জনের সঙ্গে

মিলিয়ে গেল। শাহ্‌জাহান ছাড়া সে কণ্ঠস্বর আর কারও কানে পৌঁছল না।

শুধু নূরজাহান লক্ষ্য করলেন শাহ্‌জাদা শাহ্‌জাহান আজকাল যেন একটু বেশী দৃপ্ত ভঙ্গিতে হাঁটা চলা করছেন! চারিদিক যেন একটু বেশী কাঁপিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াচ্ছেন!

নূরজাহানের আকর্ণ টানা ভ্রূ দুটির মাঝে ক্ষণিকের জন্য কয়েকটি রেখা ফুটে উঠল, তারপরেই মিলিয়ে গেল।

সামনেই সম্রাট জাহাঙ্গীর।

নূরজাহান স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

আকাশ সে যত বড়ই হোক, সূর্যদেবের কাছে তার চিরকালের পরাজয়।

ক্যাম্বেতে সম্রাট রইলেন মাত্র দশদিন। তারপরেই ১৬১৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে চলে এলেন সবরমতীর ধারে আহ্‌মেদাবাদে। সেখানে রইলেন তিনমাস।

সম্রাটের থাকাকালীন ওখানে দেখা দিল রোগের মহামারী—কলেরা নয়, বসন্ত নয়,—ইনফ্লুয়েঞ্জা। ভীষণ জ্বর, চোখ জ্বালা আর গা হাতপায়ে অসম্ভব ব্যথা।

জ্বর বেশীদিন থাকত না, কয়েকদিন পরেই নেমে যেত। কিন্তু মনে হত কোন ধুনুরী এসে প্রাণপণ শক্তিতে গোটা শরীরটাকে যেন ধুনে রেখে গেছে। নিজের কাছে নিজের শরীরের কোন অস্তিত্ব আছে বলে মনে হত না—এত দুর্বলতা, এত ক্লান্তি।

প্রচুর লোক মারা গেল।

জাহাঙ্গীর, শাহ্‌জাহান দু'জনেই এই ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপে পড়েছিলেন, জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পর দুজনেরই বেশ কিছুদিন মনে হয়েছিল, রাজ্য, সিংহাসন, গর্ব, আস্ফালন—সব মিথ্যে, সব মায়া। চারিদিকে সব কিছু নির্জীব, সব কিছু মৃত······

আহ্‌মেদাবাদ আর ভাল লাগল না। জাহাঙ্গীর এবার আগ্রার

দিকে পা বাড়ালেন। পথে অক্টোবর মাসে এক সুসংবাদ পেলেন, শাহ্‌জাহানের প্রিয়তমা বেগম মমতাজমহল তৃতীয় ছেলের জন্ম দিয়েছেন। উৎফুল্ল জাহাঙ্গীর নাতির নাম রাখলেন—আওরংজেব। শাহ্‌জাহান পুত্রের জন্মোৎসব পালনে অনুষ্ঠান জাঁকজমকের ত্রুটি করলেন না।

এদিকে পথে এক বিষাদের সংবাদ এল। ওঁরা শুনতে পেলেন দেশে সাংঘাতিক প্লেগ দেখা দিয়েছে।

বিউবোনিক প্লেগ।

পাকা ফোড়ার মতো গ্ল্যাণ্ড ফুলে উঠত। জ্বরে গা পুড়ে যেত, গায়ের রং ক্রমশঃ কালো হয়ে আসত। মৃত্যুর সঙ্গে কিছুক্ষণ মুখোমুখি যুদ্ধ করে নিস্তেজ হয়ে কখন যে রোগীর শেষ নিশ্বাসটি ঝরে পড়ত, রোগের ভয়াবহতায় কারো চোখেও পড়ত না।

পড়বে কি করে! কেউ কি সহজে রোগীর কাছে আসত? পিপাসায় কাতর রোগীর শুকিয়ে-যাওয়া জিবে ঠোঁটে আলগোছে একটু খাবার জল ঢেলে দিলেও তো নিস্তার থাকত না। সঙ্গে সঙ্গে উপকারী বন্ধু আত্মীয়কে ঐ প্লেগ সাদরে আলিঙ্গন করত।

এই মৃত্যুরূপী প্লেগের বর্ণনা রয়েছে জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতেই। তিনি শুনেছিলেন সেনাপতি আফজল খাঁ জাফরবেগের মেয়ের কাছ থেকে......

"হঠাৎ একদিন আমার উঠোনে দেখলাম একটা ইঁদুর কেমন যেন মাতালের মতো টলছে। একবার পড়ছে, একবার উঠছে। ঠিক যেন বুঝতে পারছে না কোথায় যাবে। আমি একজন দাসীকে ইঁদুরের লেজ ধরে একটা বেড়ালের সামনে ছুড়ে দিতে বললাম। বেড়ালটা মহা আনন্দে লাফিয়ে এসে ইঁদুরটাকে কামড়ে ধরল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই যেন মুখ থেকে ইঁদুরটাকে ফেলে দিল। বেড়ালটার মুখে একটা বেদনা, একটা অসোয়াস্তির ভাব ফুটে উঠল, ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। পরদিন, বেড়ালটা যখন প্রায় মারা যাচ্ছে,

তখন ওকে একদানা আফিম দেবার কথা মনে এল। যখন বেড়ালটার মুখ হাঁ করা হল, তখন দেখা গেল ওর জিব আর টাকরা কালো হয়ে গেছে। তিন দিন ঐরকম যন্ত্রণাকর অবস্থায় কাটিয়ে চার দিনের দিন বেড়ালটার একটু জ্ঞান এল। কিন্তু এর পরে দাসীটির গ্রন্থি ফুলে উঠল, অত্যন্ত জ্বর আর ভীষণ বেদনায় মেয়েটি অস্থির হয়ে পড়ল, ওর গায়ের রং ধীরে ধীরে কাল্‌চে হলুদের মতো হয়ে গেল। পরদিন সে মারা গেল……"

বর্ণনায় আরও আছে—মাত্র আট ন'দিনের মধ্যে ঐ একই বাড়ির সতের জন লোক মারা গেল। শেষপর্যন্ত এমন হল যে মুমূর্ষু রোগী একটু জলের জন্য আর্তনাদ করেছে, তবু কেউ সাহস করে কাছে গিয়ে আকণ্ঠ তেষ্টাভরা মুখে একফোঁটা জল দিতে পারে নি। কে যাবে? সব চাইতে প্রিয় জিনিস তো নিজের প্রাণটুকুই।

সেদিন যদি আলবেয়র কামু থাকতেন, তবে হয়তো তাঁর 'লা পেস্টে'র চাইতেও আরও ভয়াবহ এক মৃত্যুর বর্ণনায় আমরা শিউরে উঠতাম।

দেখতে দেখতে প্রায় গোটা উত্তরভারতে ঐ মহামারী ছড়িয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে প্রকোপ একটু কমে এলেও এর অস্তিত্ব ছিল অনেক দিন—সেই ১৬১৬ থেকে একেবারে ১৬২৪ পর্যন্ত। প্লেগের প্রকোপ যখন ছড়িয়ে পড়েছিল, জাহাঙ্গীর শাহ্‌জাহান দুজনেই তখন রাজকীয় জৌলুশ নিয়ে দক্ষিণে বিরাজ করছিলেন। প্লেগে হাজার হাজার লোকের মৃত্যুতে তাঁদের গায়ে আঁচ লাগে নি। মুঘলযুগের ঐশ্বর্যের তলায় সাধারণ মানুষের জীবনের মূল্য তখন এক কানাকড়ির বেশী ছিল না।

প্লেগ ছড়িয়েছিল বটে, কিন্তু আশ্চর্য, ফতেপুর সিক্রীতে কিছু হয় নি। কারণ ও জায়গায় প্লেগ ঢুকতে পারে এই আশঙ্কায় কিছুদিন আগের থেকেই আশেপাশের লোক দেশগাঁ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। মহামারীর কালগ্রাস থেকে বাঁচবার জন্য আক্রান্ত জায়গা ছেড়ে দিয়ে

পালিয়ে যাওয়াটাই ছিল তখনকার দিনে সব চাইতে ফলপ্রদ প্রতিষেধক।

সুতরাং ছোঁয়াচে প্লেগ ফতেপুর সিক্রীতে আর কাউকে ছুঁতে পারে নি। চারিদিককার মৃত আবহাওয়ার মধ্যেও ফতেপুর সিক্রী বেঁচে ছিল। তাই জাহাঙ্গীর রাজধানীতে ফিরে আসার পথে যখন ঐ ভয়াবহ প্লেগের কথা শুনলেন, তখন তিনি আগ্রায় না গিয়ে ফতেপুর সিক্রীতে গিয়ে উঠলেন। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে তারপর ১৬১৯ খ্রীস্টাব্দে এপ্রিল মাসে সম্রাট ফিরে এলেন রাজধানী আগ্রায়।

১৬১৭ থেকে ১৬২০ সালের মধ্যে জাহাঙ্গীরের উল্লেখযোগ্য রাজ্য জয়ের মধ্যে ছিল কাঙড়া বা নগরকোট। আকবরও পারেন নি এই রাজ্যটি নিজের হাতের মুঠোয় পুরতে। সুতরাং এই দুর্জয় কাঙড়াকে জয় করায় জাহাঙ্গীরের আভিজাত্য ও সম্মান অনেকখানি বেড়ে গেল।

কাঙড়া জয়ের আগেই সম্রাটের স্বাস্থ্যে ভাঙন ধরল।

কোন সীমা না রেখে সম্রাট মদ আর আফিমকে একসঙ্গে সঙ্গের সাথী করে তুলেছিলেন। সকাল থেকে শুরু করে রাত্রিবেলায় নেশায় ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত জাহাঙ্গীর অকাতরে মদ আর আফিম খেয়ে নীলকণ্ঠ হয়ে বসে থাকতেন।

নেশা করার মধ্যে জাহাঙ্গীর কোন নীতি বা ভারসাম্য রক্ষা করার যুক্তি খুঁজে পেতেন না। ফলে তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন মনের জোর থাকলেও দেহ বিকল হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেয়।

১৬১৮ খ্রীস্টাব্দ।

সম্রাট তখন গুজরাটে। অসহ্য গরম। সবে ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে উঠে জাহাঙ্গীরের তখন সবকিছু অন্ধকার মনে হচ্ছিল। আর ঠিক

ঐ সময়ে তিনি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, পৃথিবী থেকে বাতাস কমে যাচ্ছে, ফুসফুস দুটো প্রাণভরে বাতাস নিতে পারছে না, বুকের ভেতরটা কেমন যেন টান ধরেছে, নিশ্বাস প্রশ্বাস ভারি হয়ে উঠেছে।

একটুখানি বাতাসের জন্য ঐশ্বর্যবান শক্তিমান সম্রাট জাহাঙ্গীর হাহাকার করে উঠলেন। তিনি হাঁপাতে লাগলেন। দুর্দান্ত হাঁপানি রোগে জাহাঙ্গীর শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন।

ডাক্তার-বদ্যির ভিড় বাড়ল। সবাই একবাক্যে বললেন, সম্রাটের নেশার মাত্রা কমাতে হবে। নইলে শুধু বাতাস কেন, পৃথিবীর সব কিছুই চোখের সামনে থেকে সরে যাবে······

মদের পরিমাণ কমান হল।

কিন্তু কতটুকু!

এতদিন যার সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকা, তাকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যথা কি হাঁপানির হাহাকারের চাইতে কম!

শুধু কি বাতাসটুকুই সম্রাটের সঙ্গে অসহযোগিতা করল? অন্যদিকে আরেক বিপদ এল না! কোথা থেকে একরাশ রক্ত ছুটে এসে সম্রাটের চোখে জমাট বাঁধল। লাল-হয়ে-যাওয়া চোখে কী অসহ্য যন্ত্রণা!

শেষ পর্যন্ত হেকিম এসে চোখের একটি শিরা কেটে বেশ কিছুটা রক্ত বার করে দিলে খানিকটা শান্তি।

ডাক্তাররাই পরামর্শ দিলেন—সম্রাটের একবার হাওয়া বদল করা দরকার! শরীরটার ওপর যা ধকল গেছে!

সম্রাটের মন লাফিয়ে উঠল।

নিশ্চয়ই যাবেন।

যাবেন সেখানে, যেখানে ঈশ্বর এই মর্ত্যলোকে স্বর্গরচনা করেছেন। সে স্বর্গের নাম কাশ্মীর—Garden of Eternal Spring —ফুল, ফল, বরফ-চুড়ো পর্বত, নদী আর ঝরণা দিয়ে অতি সুন্দর করে সাজানো একখানা বাগান। সেখানে আছে ডাল লেক, আছে

শালিমার বাগ। সেখানে পাতা ঝরে না, পাখি কখনও গান থামায় না,—সেখানে চির বসন্ত।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একান্ত নিষ্ঠাবান ভক্ত ও সমজদার সম্রাট জাহাঙ্গীর কাশ্মীরে এসে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। গুজরাটের গরমে আর হাঁপানির টানে বুকের ভেতরটা একেবারে রুক্ষ মরুভূমি হয়ে গিয়েছিল। কাশ্মীরের স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে জাহাঙ্গীরের মনে আরাম এল, স্বাচ্ছন্দ্য এল।

কিন্তু ক' দিন ?

সম্রাট আবার হাহাকার করে উঠলেন।

সম্রাটের ভাণ্ডারে আবার বাতাসের টান পড়েছে। মণি মুক্তো রাজ্যপাট সব মিথ্যে, সত্যি শুধু খোলা আকাশের ঝরঝরে বাতাস।

বুক ভরে একটু নিশ্বাস নিতে দাও, ঈশ্বর···বুক ফেটে যাচ্ছে, আর যে বাতাস টানতে পারছি না···

কয়েক বছর আগে মৃত জন্তুর চারিদিক-বন্ধকরা চামড়ার খোলের মধ্যে বসে হুসেন বেগও তো ঐ রকমই মৃত্যুর কান্না কেঁদে কেঁদে মাথা কুটেছিলেন—'একটু বাতাস, শুধু একমুঠো হাওয়া···।'

চিকিৎসকেরা সম্রাটের কষ্ট লাঘব করার জন্য কত রকম চেষ্টাই না করলেন, কিন্তু কেউ পারলেন না সম্রাটকে একটু সহজ-ভাবে নিশ্বাস নেবার হদিস দিতে।

নিরুপায় সম্রাট যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচার জন্যে মদের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। হয়তো বা নেশায় অচৈতন্য হলে এ যন্ত্রণার চেতনা থেকে মুক্তি পাবেন।

কিন্তু, হা ঈশ্বর······অচৈতন্য হওয়া দূরে যাক, যন্ত্রণার অনুভূতি যে এত সচেতন হয়ে মানুষকে সহ্য করতে হয়, আগ্রার প্রাসাদে বসে তিনি কি কখনও কল্পনাও করতে পেরেছেন ?

একমাত্র সান্ত্বনা, পাশে নূরজাহান।

নূরজাহানের মমতা, নূরজাহানের সেবা, ওর কি কোন সীমা

আছে ? কৃতজ্ঞতায় জাহাঙ্গীরের চোখে জল আসে। নূরজাহানের রূপে তিনি মুগ্ধ, বুদ্ধিকৌশলে তিনি বিস্মিত। আর এখন ? তাঁর নিরলস সেবায় এখন তিনি কৃতজ্ঞ।

নূরজাহান না থাকলে কি সম্রাট দিনের সূর্য আর রাতের চন্দ্র দেখতে পেতেন ? নূরজাহানই তো কত যত্নে, কত সতর্কতায় সম্রাটের পানীয়ের মাত্রা সীমিত করে দিয়েছেন, পথ্যের তালিকা প্রস্তুত করেছেন। তাঁর অক্লান্ত সেবা ও সতর্ক যত্নেই তো সম্রাট মৃত্যুর থাবা থেকে কোন মতে ফিরে এসেছেন !

ফিরে ঠিকই এসেছেন, কিন্তু······

জাহাঙ্গীরের দিকে তাকিয়ে নূরজাহানের জগৎ থেকেও যেন সব বাতাস চলে যেতে লাগল। এতদিন পর্যন্ত কত অশ্বশক্তির অ্যাক্‌-সিলারেটারে পা রেখেছিলেন, ভেবে দেখেন নি তো !

দরকার পড়ে নি। জাহাঙ্গীর তখন সুস্থ ছিলেন।

আর এখন ?

নূরজাহানের চোখের সামনে ভেসে ওঠে শাহ্‌জাহান হবার পর খুররমের দৃপ্ত চেহারার উল্লাস, ক্যাম্বে সাগরতীরে তাঁর দুর্দান্ত অশ্বের দুর্জয় ক্ষুরধ্বনি। সম্রাট-পিতার সিংহাসনের নিকটতম হয়ে বসবার অধিকার লাভে খুররমের গর্বস্ফীত পদমর্যাদা, কথায় ব্যবহারে খুররমের কেমন যেন এক ঋজু ভঙ্গী !

নূরজাহানের বঙ্কিম ভ্রূর মাঝে আবার কয়েকটি কুঞ্চিত রেখা ফুটে উঠল। রোগশয্যায় শায়িত দুর্বল বিবর্ণ সম্রাটের ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে নূরজাহানের কপালের রেখা মনের মধ্যেও দাগ কাটল।

অলক্ষ্যের এক কুটিল কটাক্ষে নূরজাহান চমকে উঠলেন। নূরজাহান-চক্রে কোথা থেকে একটা কুটো উড়ে এল···সাবধান, ঝড় উঠতে আর বেশী দেরি নেই—সাবধান।

অটুট নিষ্ঠা নিয়ে নূরজাহান স্বামী-পরিচর্যায় মন দিলেন। সম্রাটকে সুস্থ হতেই হবে। তিনি যদি সিংহাসনের ওপর স্থির হয়ে

মাথা উঁচু করে না বসেন, তাহলে তাঁর পেছনে আড়াল থাকবে কি করে? আর আড়াল না থাকলে এত বড় মুঘল সাম্রাজ্যের সাহসিকা-পরিচালিকার আসন কোথায় পাতা হবে?

রূপসী, বুদ্ধিমতী, শক্তিময়ী জাহাঙ্গীর-প্রেয়সী নূরজাহানের সার্থক জীবনে এ কী বিড়ম্বনা! সিংহাসন নিয়ে, রাজ্য নিয়ে, যে বিরাট নাটক ঘটে চলেছে, তাতে তিনি শুধু আড়াল থেকেই আলোকসম্পাত করে যাবেন? সামনে দর্শক-মনকে সেই আলোর খেলায় বিভ্রান্ত করে রাখবেন, তারপর খেলা শেষে যেন সুইচ্‌টি অফ্‌ করে দিয়ে আবার আড়াল থেকেই তিনি সরে যাবেন?

গোটা নূরজাহান-চক্রটা যেন একটা চক্রায়িত অজগরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল, ক্ষণিকের জন্য নূরজাহান শিউরে উঠলেন।

আর অন্য দিকে শাহ্‌জাহান? ধীর স্থির গম্ভীর। কোন চাঞ্চল্য তাঁর মনে নেই, কোন অস্থিরতা তাঁর প্রকাশে নেই। হাসি-উচ্ছ্বাসের বালাই তো নেই-ই; না হলে বিদেশী সাহেব টমাস রো লিখবেন কেন—আমি এমন গম্ভীর গোমড়ামুখো অহঙ্কারী মানুষ আর দুটি দেখি নি!

মানুষ সম্বন্ধে শাহ্‌জাহানের অপার ঘৃণা আর অবজ্ঞা দেখেও টমাস রো বিস্মিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে খসরু সম্বন্ধে টমাস রো কিন্তু একেবারে উল্টো কথা লিখেছেন,—খসরু সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র, সব চাইতে জনপ্রিয়, সব চেয়ে শ্রদ্ধেয়, মহত্তমও বটে। খসরুর ধর্মনৈতিক উদারতা ও সবল দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধেও টমাস রো পঞ্চমুখ।

খসরুর স্বভাব, ব্যবহার ও চরিত্র সম্বন্ধে টমাস রো-এর চ্যাপলেন টেরী সাহেবও ঐ একই ভাষায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।

খসরু ও খুররম—ব্যক্তি হিসাবে এই দুজনের মধ্যে যে বিরাট তারতম্য ছিল তা এই বিদেশীদের দৃষ্টি এড়ায় নি।

এতদিন ধরে নূরজাহান-চক্র খুররমকে সযত্নে পোষণ করেছে, সর্ব

কাজে সমর্থন জানিয়েছে, কোন দিকে দৃক্‌পাত না করে তাঁকে সামনের দিকে লাফিয়ে চলতে সাহায্য করেছে। এখন সেই খুররমের দু'চোখে নূরজাহান যে বিদ্যুৎ চমকে উঠতে দেখছেন, তাতে কোন কৃতজ্ঞতার আলো নেই, তাতে আছে শুধু জাত-গোখরোর জ্বলন্ত ছোবল।

খুররম এবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাইছেন। এখন তিনি একাই একশ'। এখন তিনি শাহ্‌জাহান। নূরজাহান-চক্রের আনুকূল্যে আর তাঁর দরকার নেই। নূরজাহানের ব্যক্তিত্ব আর বুদ্ধিকে সমীহ করার কর্তব্য আজ ফুরিয়েছে। এখন 'দিন আগত ঐ'।

নূরজাহান বুঝতে পারলেন—বাঘের খেলা এবারই শুরু হবে।

স্বামীর রুগ্ন পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে নূরজাহানের বুকের রক্ত তোলপাড় করে উঠল······

এর পর ?

বুদ্ধির জয়, না শক্তির ?

নূরজাহান, না শাহ্‌জাহান ?

কবে থেকে শাহ্‌জাহান তাঁর সুড়ঙ্গ খুঁড়তে শুরু করেছিলেন, তার মুখটা এখন এসে ঠেকেছে প্রায় সিংহাসনের কাছে।

নূরজাহান সভয়ে তাকিয়ে দেখলেন, সিংহাসনের পাশে এক দীর্ঘ কালো ছায়া, সে ছায়া শাহ্‌জাহানের। ছায়ামূর্তি তার ভয়াল থাবা বাড়িয়ে দিয়েছে সিংহাসনের দিকে।

মেবার জয়ী খুররম, দক্ষিণ জয়ী শাহ্‌জাহান যেন ডান হাতের আঙুল উঁচিয়ে নূরজাহানকে প্রশ্ন করছেন, নূরজাহান-কাহিনীর এবার অবসান, না আবার নোতুন করে শুরু ? এতদিন যেখানে বসেছেন, নূরজাহান কি সে আসনেই স্থির হয়ে বসে থাকবেন, না আসন গুটিয়ে ফেলবেন ? কোন্‌টি বুদ্ধির কাজ হবে ?

নূরজাহান বুঝতে পারলেন, হয় চিরকালের মতো গভীর অন্তরালে চলে যাওয়া, না হয় রূপান্তর ঘটিয়ে নোতুন আশা উদ্যমে

নূরজাহান-চক্রের এগিয়ে চলা, এ দুটির মধ্যে একটি পথ তাঁকে বেছে নিতেই হবে। এতদিন ধরে পরস্পরের টানে সৌরমণ্ডলের যে পরিক্রমা অব্যাহত ছিল, আজ সে মণ্ডলের একটি গ্রহ এক বৃহত্তর আকর্ষণে গতি বদল করেছে, সৌরমণ্ডলের নির্ধারিত নিয়মে ব্যতিক্রম ঘটেছে। চারিদিকে আসন্ন বিপর্যয়ের পদসঙ্কেত।

নূরজাহান বারবার তাকিয়ে দেখেন জাহাঙ্গীরের মুখের দিকে। বয়স আর রোগের তাড়নায় সে মুখ ক্লান্ত বিবর্ণ। নূরজাহান শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ছায়াবৃতা নূরজাহান এবার কার ছায়া আশ্রয় করবেন?

মারিয়া আঁতোয়নেতের ঐশ্বর্য-বিলাসী অস্মিতা, মেরী কুইন অব স্কটস্-এর তীব্র মদির ফেনোচ্ছ্বসিত উদ্ধত যৌবন, রাণী এলিজাবেথের তীক্ষ্ণ কূটেষা ও শাসননৈপুণ্য, জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিনের অপূর্ব মেধা, তুষার-কঠিন অহমিকা আর আকাশস্পর্ধী আকাঙ্ক্ষা—এই সব কিছুর সমন্বয়ে তো নূরজাহান! তবু তিনি আড়ালেই থেকেছেন। এই তাঁর বিধিলিপি।

তাই জাহাঙ্গীরের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতিতে নূরজাহান শঙ্কিত, সতর্ক।

জাহাঙ্গীরের পরে সিংহাসনে কে বসবে? কার মাধ্যমে নূরজাহান নির্দেশ দেবেন, সবাইকে মাথা নীচু করে তাঁর আদেশ পালনে বাধ্য করবেন?

খসরু? প্রতিপক্ষ।

পরভেজ? ক্লেদময় জীবনে ক্লিন্ন ক্লিষ্ট।

খুরম! শাহ্জাহান? প্রতিদ্বন্দ্বী।

বাকি আছেন শাহ্রিয়র। সম্রাটের কনিষ্ঠ পুত্র।

নূরজাহানের ধারাল দৃষ্টি নিবদ্ধ হল শাহ্রিয়রের মুখে।

নির্বোধ, নিবিকার, নিরুদ্বিগ্ন শাহ্রিয়র।

এই ছেলেটিকেই তো নূরজাহান খুঁজছিলেন। এতদিনে সযত্ন-

সতর্কতায় গড়ে তোলা নূরজাহান-চক্রকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নূরজাহান এবার শাহ্‌রিয়রকে সামনে খাড়া করবেন।

অস্তাচলে নয়, উদয়াচলেই নূরজাহানের স্থির আসন, তাঁর দৃঢ় শাসন, অক্ষয় ক্ষমতা। এ থেকে তিনি একচুলও নড়বেন না। দেখা যাক শাহ্‌জাহানের কত শক্তি, নূরজাহানের কত বুদ্ধি।

টেলিপ্যাথিতে নূরজাহান আর শাহ্‌জাহান দু'জন দু'জনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন, বাইরের আকাশ তখনও নীল।

ষোল বছরের ছেলে শাহ্‌রিয়র। সুকুমার সরল মুখ। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। শাহ্‌রিয়রকে নিয়ে ঐতিহাসিক ও কাহিনীকারেরা বিশ্লেষণ করার মতো আর কোন উপাদান খুঁজে পান নি। তাঁরা শুধু লিখে রেখে গেছেন—'ন-সুদনী' শাহ্‌রিয়র। ভালো বা মন্দ কোন কাজ করার ক্ষমতাই ব্যক্তিত্বহীন শক্তিহীন বুদ্ধিহীন শাহ্‌রিয়রের ছিল না। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের ছেলে—শুধু এইটুকুনই তাঁর পরিচয়। তাই নামের বিশেষণ ছিল 'ন-সুদনী'। ন-সুদনী শাহ্‌রিয়র, অপদার্থ শাহ্‌রয়র—নূরজাহানের চক্রান্তে শেষ পর্যন্ত হয়েছিলেন—হতভাগ্য শাহ্‌রিয়র।

নূরজাহান এই শাহ্‌রিয়রকেই তো চেয়েছিলেন। যে শাহ্‌রিয়র ব্যক্তি নয়—বস্তু, আর যে বস্তুকে নিজের ইচ্ছেমতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে নূরজাহান তাঁর রাজনীতির জের অনেক দূর টেনেছিলেন।

কাশ্মীর থেকে সম্রাট সপরিবারে এলেন লাহোরে।

নূরজাহান তাঁর একমাত্র সন্তান কন্যা লাডলি বেগমকে কাছে টেনে নিলেন—প্রথম স্বামী শের আফকনের উপহার।

না, নূরজাহানের কিছু মনেপড়ছে না। কবে কোথায় মেহেরউন্নিসা নামে একটি বৌ নিভৃত গৃহকোণে মাতৃত্বের আস্বাদে উল্লসিত হয়ে

উঠেছিল, নূরজাহান-চক্রের অধিনায়িকা মুঘল সাম্রাজ্যের ক্রুর-রাজনীতি-পরিচালিকা নূরজাহান সে কাহিনী বিস্মৃত হয়েছেন। বিস্মৃত হবার মতো একযুগেরও বেশী সময় তো কেটে গেছে! রাজনীতিতে ভাবপ্রবণতার কোন স্থান নেই!

নূরজাহানের তৎপরতায় ১৬২০ খ্রীস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে লাডলি বেগম শাহ্রিয়রের বাগদত্তা হল। ১৬২১ খ্রীস্টাব্দে এপ্রিল মাসে রাজকীয় সমারোহে তুজনের বিয়ে হল।

লাডলি বেগমকে আশীর্বাদ করলেন মা আর সম্রাট জাহাঙ্গীর।

শাহ্রিয়রকে আশীর্বাদ করলেন বাবা আর সম্রাজ্ঞী নূরজাহান।

টমাস রো-এর বিবরণীতে এই সময়কার একটি খবরে মন কৌতূহলী হয়ে ওঠে। তিনি লিখেছেন—খুররমের সঙ্গে বিবাদ ও নূরজাহান-চক্রে ভাঙন ধরবার কিছু আগে থেকে নূরজাহানের দৃষ্টি পড়েছিল সর্বজনশ্রদ্ধেয় ভদ্র, সুশ্রী ছেলে খসরুর ওপর। প্রথমে খসরুর সঙ্গেই নাকি নূরজাহান তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন!

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের একেবারে গোড়ার দিকে খসরুর ঘাড়ে তুষ্ট ভূত চেপেছিল, বাপের বিরুদ্ধে সে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তাই বলে ছেলে হিসেবে খসরুর তুলনা কোথায়? খসরু সম্পর্কে জাহাঙ্গীরেরও যে অপার স্নেহ বিশ্বাস ছিল, টমাস রো সে সম্পর্কেও স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। সম্রাটের বড় ছেলে তাঁর স্নেহের পাত্র, তায় খসরু সম্বন্ধে নূরজাহানের নোতুন আগ্রহ—সব কিছু মিলিয়ে ইতিহাসের মোড় প্রায় ঘুরে যাচ্ছিল। কিন্তু বাদ সাধলেন ছোট ভাই খুররম আর খসরু নিজে।

একটু আগের থেকে আরম্ভ করা যাক।

বিদ্রোহ দমিত হবার পর খসরুকে ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বেশ কড়া পাহারায় রাখা হয়েছিল। তার পর তিনি শুধু ছিলেন নজরবন্দী। খসরুর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন রাজপুত সেনাপতি অনি রাও। বন্দী

খসরুকে কেন্দ্র করে প্রায় প্রথম থেকে একটি বিরোধী দল গড়ে উঠেছিল। এই দলে ছিলেন পাকা মাথাওয়ালা বেশ কয়েকজন অভিজাত আমীর ওমরাহ্। এই দলের অন্যতম প্রধান সমর্থক ছিলেন মহাবৎ খাঁ। যদিও খসরুকে অন্ধ করে দেওয়ার মতলব তিনিই দিয়েছিলেন, কিন্তু নূরজাহানের কর্তৃত্বে বিরক্ত হয়ে তিনি বিরোধী দলে যোগ দিয়েছিলেন। দিন দিন এই বিরোধী দলের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে দেখে নূরজাহান শঙ্কিত হলেন, সব চাইতে বেশী ভয় পেলেন খুরম। খসরুর জনপ্রিয়তাই খুরমকে ভাবিয়ে তুলল। আর বাপের মনটাও যে মাঝে মাঝে খসরুর দিকে ঝুঁকে পড়ে এও খুরম খুব ভালো করেই জানতেন। নইলে ঐ বিদ্রোহী ছেলেকে একেবারে অন্ধ করে না দিয়ে আবার সখ করে ডাক্তার ডেকে ছেলের একটি মাত্র চোখের একটুখানি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে সিংহাসনের পথে কাঁটা দেওয়া হল কেন? সিংহাসন প্রাপ্তির পথে একমাত্র বাধা তো খসরু! নইলে আর দু'ভাই পরভেজ ও শাহ্রিয়রকে খুরম পায়ের কড়ে আঙুল দিয়েও পোঁছেন না।

খুরম ছিলেন নূরজাহান-চক্রের নামী ও দামী সদস্য। তার ওপর খুরমের ভবিষ্যৎ-স্বার্থ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ও সতর্ক হয়ে উঠেছিলেন শ্বশুর আসফ খাঁ। সুতরাং খুরমের এই দুর্ভাবনার অংশীদার ছিলেন তিনিও।

প্রথম দিকে নূরজাহান-চক্রের প্রত্যেকেই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন।

খসরু সম্বন্ধে এবার একটু ব্যবস্থা করা দরকার। তাকে আর এ ভাবে ছেড়ে রাখা ঠিক নয়। এবার তাকে কৌশলে হাতের মুঠোয় আনতে হবে। তার পরের ব্যবস্থা পরে করা যাবে।

নূরজাহান-চক্রের কোন কাজে বিলম্ব হয় না। অতঃপর নূরজাহান জলভরা চোখে নেশাসক্ত জাহাঙ্গীরের কাছে এক আবেদন জানালেন,—খসরুকে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। সে

নূরজাহান-চক্রের কাছে থাক। তার কোন অসুবিধেই আমরা হতে দেব না। নূরজাহানের হরিণচোখে মুক্তো টলটল করে উঠল। জাহাঙ্গীরের নেশায়-আরক্ত দুটি চোখে স্বপ্নের ঘোর নেমে এল। টলমলে মাথা ঝাঁকিয়ে জাহাঙ্গীর সম্মতি দিলেন, তাই হোক, খসরুর দায়িত্ব নূরজাহানই নিন।

সে রাতেই আসফ খাঁ ছুটে গেলেন খসরুর দরজায়। অনি রাও-কে সম্রাটের আদেশের কথা জানালেন, খসরুকে তাঁদের হাতে তুলে দিতে হবে। বিশ্বস্ত রাজপুত এই ব্যবস্থা মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। বললেন, রাজার কাছ থেকে তিনি রাজার ছেলের ভার পেয়েছেন। সুতরাং রাজার ছেলেকে তিনি রাজার হাতেই দেবেন···

পরদিনই তিনি এই ঘটনা সবিস্তারে জাহাঙ্গীরকে জানালেন। রাতের নেশা কাটিয়ে জাহাঙ্গীর শরীর-মনে বেশ ঝরঝরে হয়ে বসেছিলেন। অনি রাও-এর কাছে সব শুনে জাহাঙ্গীর খুশী হয়ে বললেন, 'ঠিক করেছ, বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে তুমি তোমার কর্তব্য পালন করেছ। তুমি তোমার কাজ করে যাও, কারো কোন আদেশে কান দিও না। দেখা যাক ওরা কি করে।'

ওঁরা কিন্তু যা করবার করেইছিলেন। ১৬১৬ খ্রীস্টাব্দে খসরু হস্তান্তরিত হয়ে নূরজাহান-চক্রের কবলে পড়েছিলেন। জাহাঙ্গীরের সাধ্য ছিল না এই চক্রের কোন কার্যবিধিকে বানচাল করেন।

খসরুকে হাতে পেয়ে নূরজাহান-চক্রের মাহাত্ম্য আরও ফেঁপে উঠল, আর এর কিছু পরেই উল্টো দিকে হাওয়া বইতে শুরু করল। নূরজাহান খুরম বা শাহ্‌জাহানের দৃপ্ত ভঙ্গী আর মত্ত গর্বে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। আর নয়, খুরম তার ঊর্ধ্বগতির সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এবার অন্য প্যাঁচের খেলায় খুরমকে আটকাতে হবে। ছোবল মারবার আগেই খুরমের বিষদাঁত ভেঙে ফেলতে হবে।

টমাস রো তাঁর বিবরণীতে এই বছরেই এই চমকপ্রদ সংবাদটি

টুকে রেখেছিলেন—খসরু নূরমহলের (টমাস রো বরাবর 'নূরমহল'-ই বলেছেন) মেয়েকে বিয়ে করবেন বলে শোনা যাচ্ছে, বিয়ে করলেই মুক্তি। সব দলাদলিও মিটে যাবে।

পরের বছর টমাস রো আবার লিখলেন—পিতার আদেশ অনুযায়ী নূরমহল আর আসফ খাঁ খসরুর সঙ্গে শান্তি-মৈত্রী পাতানোর চেষ্টা করছেন, খসরুর মুক্তির বেশী দেরি নেই। নূরজাহানের মেয়ের সঙ্গে খসরুর বিয়ে দিয়ে প্রতিপক্ষকে দলে টানবেন, আর বিয়ের ফলে খসরু পূর্ণ স্বাধীনতা পাবেন। শুধু তাই নয়, এ বিয়ের ফলে অত্যন্ত দাম্ভিক উদ্ধত খুররমের পথে কাঁটা পড়বে। কাজেই যতটুকু তিনি এগিয়েছেন, ওখানেই তাঁর সব কিছুর অবসান হবে, তাঁকে আর মাথা চাড়িয়ে দাঁড়াতে হবে না। খুরম যেভাবে আশা ও অহঙ্কারের পাখায় ভর করে কাউকে গ্রাহ্য না করে উড়তে শুরু করেছেন, তাতে গোড়াতেই যদি তাঁর ডানা ভেঙে না দেওয়া যায়, তা হলে নূরজাহান-চক্রের কপালে অশেষ দুঃখ আছে।

সুতরাং নূরজাহান তৎপর হয়ে উঠেছিলেন খসরুকে নিজের মেয়ের সঙ্গে এক সূতোয় বেঁধে নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য।

কিন্তু ওখানেই তো মুশকিল হল।

বহু-বল্লভ শাহ্‌জাহানের মমতাজ-প্রেম নিয়ে মর্মরস্বপ্ন তাজমহল তৈরি হয়েছে। কবিরা কবিতা রচনা করেছেন, শিল্পীরা তুলি ধরেছেন—সবই হয়েছে শাহ্‌জাহানের সাম্রাজ্য-মূলধনের বলে।

কিন্তু বন্দী খসরুর তো কিছু ছিল না। তাই তাঁর একপত্নী-নিষ্ঠা, তাঁর নিঃসীম প্রেম নিয়ে কোন সৌধ গড়ে ওঠে নি, শ্বেতপাথরের গায়ে কোন কল্পনা রূপ পায় নি। তবু খসরু চিরমহান, একপত্নীতে তিনি পরম সুখী ছিলেন। নিজের স্বাধীনতা, নিজের নিরাপত্তার বিনিময়েও তিনি নূরজাহান-কন্যা লাডলী বেগমের পাণি গ্রহণ করেন নি, রাজনৈতিক স্বার্থের দিকে তাকান নি, নূরজাহান-চক্রের এই প্রস্তাবে সায় দেন নি,—আর দেন নি বলেই নূরজাহানের দৃষ্টি

পড়েছিল 'ন-সুদনী' শাহ্রিয়রের ওপর। যাহোক একজনকে তো ধরতে হবে। একজনকে সামনে দাঁড় করাতে না পারলে নূরজাহানের বুদ্ধি আর শক্তিতে যে কোন প্যাঁচ খেলে না।

শাহ্রিয়র-লাডলী বেগমের বিয়ের ফলে মুঘলরাজ্যে ক্ষমতালোভী তিনটি দল গড়ে উঠল। একটি শাহ্রিয়রকে নিয়ে নূরজাহানের দল, একটি খসরুকে নিয়ে আমীর-ওমরাহের দল, আর একটি দল শাহ্জাহানের নিজের। শাহ্জাহানের পেছনে ছিলেন আসফ খাঁ, অত্যন্ত বুদ্ধিমান কূটনীতিক লোক। তাই প্রকাশ্যে জামাইকে সমর্থন জানিয়ে জাহাঙ্গীরের জীবিতকালে বোনকে চটানো ঠিক রাজনীতিক সুলভ মনে করলেন না। আড়ালে থেকেই তিনি জামাইয়ের সুড়ঙ্গ-পথটি কংক্রিট দিয়ে গেঁথে দিতে লাগলেন। তাঁর কাজে কোন কাঁচা মাটির নির্বুদ্ধিতা নেই।

নূরজাহান যদি চলেন ডালে ডালে, তো আসফ খাঁ চলেন পাতায় পাতায়।

তাই যা ঘটে যাচ্ছিল, তাতে তিনি প্রকাশ্যে বোনকে সমর্থন করে সায় দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর আড়ালে মনে মনে তৈরি করেছিলেন নিজেকে, আর জামাইকে। বোন হল তাঁর বর্তমান, কিন্তু জামাই ? শাহ্জাহানের মতো জামাই ? সেই তো তাঁর ভবিষ্যৎ। সম্রাটের শরীরের যে অবস্থা······তাতে আর ক'দিনই বা···

থাকগে ওসব কথা। এখন মনে মনে আলোচনা করলেও, বোনটির যা বুদ্ধি, মনের কথা ঠিক ধরে ফেলবে।

আসফ খাঁ গভীর সমুদ্রে সাবমেরিন হয়ে ঘুরতে লাগলেন, জলের ওপর শুধু পেরিস্কোপটি জেগে রইল······

শাহ্রিয়র-লাডলী বেগমের বিয়েতে আসফ খাঁ মহানন্দে যোগ দিলেন, স্ফূর্তি করলেন—কোন কিছুতে আটকালো না।

এদিকে বিয়ের হুল্লোড়, ওদিকে দক্ষিণে মার-মার ব্যাপার। এর

আগের বার অবস্থা বুঝে মালিক অম্বর আর বিজাপুরের আদিল শাহ্‌ খুরম যা বলেছিলেন তাতেই খুশী হয়ে মুঘলদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন। কিন্তু মালিক অম্বর যেই দেখলেন জাহাঙ্গীর আর খুরম উত্তরমুখো হয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিজাপুর আর গোলকুণ্ডাকে নিয়ে এক মিত্রসঙ্ঘ গড়ে তুললেন, মারাঠী সৈন্যদের নিয়ে নোতুন করে এক ষাটহাজারী জঙ্গীবাহিনী তৈরি করলেন। সব শেষে ১৬২০ খ্রীস্টাব্দে পূর্বসন্ধি বিচ্ছেদ করে মুঘলদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। দাক্ষিণাত্যে আবার যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল।

দক্ষিণে মুঘলবাহিনীও সংখ্যায় বড় কম ছিল না, এমন কি প্রথম দু-চারটে ছুটকো ছাট্‌কা যুদ্ধে মুঘলেরা জিতেও গেল। কিন্তু জিতলে হবে কি, যুদ্ধ বাধার তিন মাসের মধ্যেই তো বেরার যুদ্ধে আহ্‌মদ-নগরের একটা মস্ত অংশ মুঘলদের হাতের বাইরে চলে গেল। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণীরা মুঘলদের বিরাট ঘাঁটি বুরহানপুর আক্রমণ করে চারিদিকে ঘিরে রাখল। শত্রু-সৈন্যের বেরোবার এতটুকু পথ রাখল না, আর শত্রুসৈন্যে যাবেই-বা কোথায়? চারদিকে সবকিছু তো দক্ষিণীদের হাতে। উপরন্তু তারা নর্মদা নদী পার হয়ে মাণ্ডু পর্যন্ত এগিয়ে এল। নেহাতই মুঘলদের অপর্যাপ্ত রসদ সঞ্চয় করা ছিল, নইলে তো সব উপোস করে শুকিয়েই মরত।

এহেন অবস্থায় আব্দুর রহিম খানখানা সমানে উত্তরে জরুরি খবর পাঠাতে লাগলেন—'শীগ্‌গির সৈন্য পাঠাও, রসদ পাঠাও—নইলে ধনেপ্রাণে খতম হব—শীগ্‌গির'...

জাহাঙ্গীর তখন লাহোরে, তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। দক্ষিণে আহ্‌মদনগর হাত ছাড়া হওয়া মানে মুঘলসম্রাটের সম্মান ও শক্তি একেবারে ফুটো হয়ে যাওয়া। ওখান থেকে পিছিয়ে এলে মালিক অম্বরের টিটকারিতে যে নর্মদার জল বিষিয়ে যাবে!

জাহাঙ্গীর অসুস্থদেহে গর্জন করে উঠলেন, সৈন্য সাজাও, সেনাপতিদের বাছাই কর।

অভিযানের অধিনায়ক হবেন সম্রাটের সেরা যোদ্ধা ছেলে শাহ্‌জাহান। শাহ্‌জাহান ছাড়া এর ঠ্যালা সামলাবার সাধ্য আর কার আছে!

শাহ্‌জাহান পিতার আদেশ শিরোধার্য করে সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে নিলেন। তারপর নিজে তৈরি হলেন।

কিন্তু দক্ষিণে যাত্রা করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে শাহ্‌জাহান ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

জাহাঙ্গীর বিস্মিত, সকলে বিস্মিত।

'কি হল?' জাহাঙ্গীর প্রশ্ন করলেন, 'যত দেরি করবে, ওদিকে অবস্থা যে তত কাহিল হবে……।'

'যাব বৈকি……যাবার জন্য তো তৈরি হয়ে আছি…' তেমনি ঘাড় বেঁকিয়েই শাহ্‌জাহান উত্তর দিলেন।

আকবর বেঁচে থাকতে সেলিম যেমন এককাট্টা একগুঁয়ে ছিলেন, ঠিক সেই একগুঁয়েমির ভাব ফুটে উঠেছিল শাহ্‌জাহানের মুখে।

একেবারে বাপের ব্যাটা!

জাহাঙ্গীর বললেন, 'তা যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছ ত যাও, থেমে গেলে কেন?'

'যাবার আগে আমার একটা আর্জি আছে……'

আর্জি পেস করার আর সময় পেলেন না বাপধন—মনে মনে তেরিয়া হয়ে উঠলেও জাহাঙ্গীর মুখে বললেন, 'যুদ্ধে যাবার মুখে আর্জি! কি ব্যাপার বল তো?' জাহাঙ্গীর কৌতূহলী হলেন।

'আমি খসরুকে সঙ্গে নিয়ে যাব…নইলে…'

জাহাঙ্গীর চমকে উঠলেন।

বিপদের মুখে ছেলের ঘাড় বাঁকানো আবদেরে ভাব দেখে বাপের মনে এই ধরনের আশঙ্কাই জেগে উঠেছিল। সব চাইতে ভালো ছেলে খসরু, সোনার ছেলে খসরু। অথচ ওকে নিয়েই যত টানা হ্যাঁচড়া!

'যুদ্ধে যাচ্ছ, অন্ধ ভাইকে নিয়ে গিয়ে কি করবে…?'

শাহ্‌জাহান চুপ করে রইলেন। মনে মনে বললেন, 'একেবারে অন্ধ হলে নিশ্চয়ই নিতাম না। সাধ করে ঐ চোখের চিকিৎসা করিয়ে যখন খানিকটা দেখতে পাওয়ার অধিকার দিয়েছ, তখন সঙ্গে করে নিয়ে যাব না তো কি আমার সিংহাসনকে গোর দেবার জন্য খসরুকে রেখে যাব?'

শাহ্‌জাহান তাঁর কুটিল রাজনীতিক বুদ্ধি আর আসফ খাঁর পরামর্শে একটা কথা ঠিকই বুঝেছিলেন।

জাহাঙ্গীরের শরীরের যে অবস্থা, যেভাবে তাঁর নিশ্বাসে টান পড়ছে, তিনি তো যে-কোনদিন যে-কোন সময়ে দু'চোখ বুজবেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে খুরম যদি থাকেন দক্ষিণে, আর খসরু থাকেন সম্রাটের পাশে, তা হলে—

রাজ্যের লোকগুলো পাগল, নইলে ঐ খসরুকে তারা এত ভালবাসে! আর তা ছাড়া একদল নির্বোধ আমীর ওমরাহ্‌ তো অপেক্ষাই করে আছে, সুযোগ পেলেই কি ভাবে খসরুকে চতুর্দোলায় করে সিংহাসনে বসাবে, কি করে খুরমের বাড়া ভাতে ছাই দেবে!

যুদ্ধ জয় করার বেলা ডাক্‌ খুরমকে, আর সিংহাসনের বেলায় নিয়ে আয় খসরুকে—যত সব বুড়ো-হাবড়া বোকার দল—আবদার আর ধরে না! যে লোকটা চোখে ভালো দেখে না, যে লোকটার বিরাট কিছু করার ক্ষমতা নেই, সে যত বড়ই বিজ্ঞ, মিষ্টভাষী, চরিত্রবান হোক না কেন, তার অন্তত মুঘল সিংহাসনে বসবার কোন অধিকার নেই।

সবার ওপরে—জোর যার, সিংহাসন তার। দেখি কে কি করে।

শাহ্‌জাহান ঘাড় বেঁকিয়েই রইলেন। খসরুকে না নিয়ে তিনি এক পাও দক্ষিণের দিকে এগোবেন না।

নিরুপায় জাহাঙ্গীর, অসুস্থ জাহাঙ্গীর তাকালেন নূরজাহানের দিকে, 'তোমারও কি তাই মত?'

'আপত্তির কি আছে? খসরু এখানে থাকলেও যা, ওখানে থাকলেও তাই। শাহ্জাহান অত করে বলেছে—আর ঐ বিপদের সময় ও ছেলেকে না চটানোই তো মঙ্গল।'

জাহাঙ্গীর নূরজাহানের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অত্যন্ত শ্রান্তিতে চোখ বুজলেন। তিনি যেন নূরজাহানের কাছে অন্য এক উত্তর আশা করেছিলেন। খসরুকে শাহ্জাহানের সঙ্গে পাঠাতে তাঁর মন চাইছে না—এটা কেন বুদ্ধিমতী নূরজাহান বুঝতে পারলেন না।

নূরজাহান বুদ্ধিমতী বলেই জাহাঙ্গীরের মনের কথা বুঝতে চান নি। শাহ্জাহানের কথায় সায় দিয়েছিলেন।

নূরজাহানের সামনে তখন শাহ্রিয়র। জাহাঙ্গীরের অসুস্থতার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তিনি তখন শাহ্রিয়রের পথ পরিষ্কার করছিলেন, সিংহাসনের ঘনিষ্ঠতম স্থানে তাঁকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছিলেন। সুতরাং দক্ষিণে এই যুদ্ধের তালে শাহ্জাহানের সঙ্গে যদি খসরুও যায়, তা হলে এর চাইতে শুভ ঘটনা আর কি ঘটতে পারে? শাহ্রিয়রের ওপরে পরভেজ ছাড়া আর এই দুটি ভাই—ভাই নয়, সিংহাসনের পথে দুটি কাঁটা। সে দুটি যদি ঘটনাচক্রে দক্ষিণে চলে যায়, তা হলে উত্তরে সিংহাসন খালি হলে তো পাকা আমের মতো সেটি শাহ্রিয়রের মুখে পড়বে। আর তখন নূরজাহানের পক্ষে ইচ্ছে মতো স্প্রিং টিপে শাহ্রিয়রকে ওঠানো, বসানো, ডিগবাজি খাওয়ানো তো একেবারেই কঠিন হবে না। নইলে জাহাঙ্গীরের মতো নূরজাহানও কি বুঝতে পারছেন না, খসরুর এই যাওয়াই শেষ যাওয়া! শাহ্জাহান পিঁপড়ের মতোই মানুষ মারতে পারেন! নূরজাহান খুশি, খুব খুশি। ঈশ্বর সহায়, নইলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার এমন সুযোগটি এল কি করে? একটি কাঁটা সরে গেলে অন্যটিও তুলে ফেলবেন—নূরজাহান কাউকে পরোয়া করেন না।

নূরজাহান পরোয়া করেন নি ঠিকই। কিন্তু এটাও বুঝেছিলেন

যে, শাহ্জাহানের যা কিছু ভয় ছিল খসরুর জন্য—খসরু ব্যক্তিটির জন্য নয়—তাঁর জনপ্রিয়তার জন্য। শাহ্জাহান জানতেন তিনি দক্ষিণে থাকাকালে পিতার মৃত্যু হলে খসরুর সিংহাসনপ্রাপ্তি অবধারিত। আর একটা কথাও তিনি আন্দাজ করেছিলেন—সেটি হল তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁকে জব্দ করার জন্য নূরজাহান হয়তো বা খসরুর সঙ্গে সাময়িকভাবে হাত মেলাতেও পারেন—সে চেষ্টা যখন একবার করেইছিলেন। রাজনীতির খাতিরে ঐ মহিলাটির অকরণীয় কিছু নেই। নূরজাহান-জুন্‌তার প্রতি পদক্ষেপে শাহ্জাহান পরিচয় পেয়েছেন নূরজাহানের অদ্ভুত সংগঠনী প্রতিভা, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার। বলতে গেলে খুরমের যে এতখানি ঊর্ধ্বগতি, সে-ও তো ঐ নূরজাহানের বুদ্ধির রশি ধরেই। তবে নূরজাহান এবার যাকে ধরেছেন—ঐ শাহ্রিয়র, তাকে আর কিছু করে খেতে হবে না। শাহ্জাহান তাকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেবেন। যাঁকে নিয়ে ভয়, তাঁকে তো শাহ্জাহান সঙ্গে নিয়েই যাবেন। বাকি রইলেন পরভেজ। তাঁর তো আবার কণ্ঠনালীতে এমন মদের তোড়, কবে যে বুকের টিপ্‌টিপ্‌-ঘড়িটি চিরকালের মতো দম বন্ধ হয়ে চুপ মেরে যাবে, তার ঠিক নেই। পরভেজ যে বাপের আগে মাটি নেবেন এতে আর কারও কোন সন্দেহ নেই।

অসহায় বিপদগ্রস্ত জাহাঙ্গীর খসরুকে অবশেষে খুরমের হাতে তুলে দিলেন। কি করবেন? খসরুকে না নিয়ে খুরম যে কিছুতেই দাক্ষিণাত্যে যাবেন না। মালিক অম্বর ওদিকে মুঘলদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন—যা খুশি তাই করছেন। খসরুকে বিদায় দিতে জাহাঙ্গীরের দুটি চোখ ভিজে উঠল! ভাই নয়, ঘাতকের হাতে তিনি তাঁর অসহায় ছেলেটিকে তুলে দিলেন। ক্ষমতা, সিংহাসন আর ঐশ্বর্যের কাছে পিতৃস্নেহ কোন থই পেল না। খসরুর বিদায়ে হারেমে কান্নার রোল উঠল। রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা হাহাকার করতে লাগল, আড়ালে অভিশাপ দিল জাহাঙ্গীর, নূরজাহান আর

খুররমকে। সবাই বুঝল খসরুর এ যাত্রা অন্তিম যাত্রা। মুগ্ধ জাহাঙ্গীর অসুস্থ জাহাঙ্গীর ব্যক্তিত্ব হারিয়েছেন বলেই এই যাওয়ায় বাধা দিতে পারলেন না। রাজা-অধীশ্বর হয়েও একটি মহৎ প্রাণকে বাঁচানোর ক্ষমতা তাঁর হল না।

দেহের মৃত্যু না হলেও জাহাঙ্গীরের আত্মার মৃত্যু হয়েছিল কয়েক বছর আগেই—যখন নূরজাহানের সজল দাবি উপেক্ষা করতে না পেরে তিনি খসরুকে অনি রাওয়ের কাছ থেকে এনে নূরজাহান-চক্রের হাতে আসফ খাঁয়ের তত্ত্বাবধান ছেড়ে দিয়েছিলেন।

লাহোরে পিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শাহ্জাহান এতদিনে দক্ষিণে যাত্রা করলেন, সঙ্গে রইলেন খসরু।

এক বিরাট দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী নিয়ে শাহ্জাহান নর্মদা নদী পার হলেন, আহ্মদনগরে ঢুকে বুরহানপুর আক্রমণ করলেন। দাক্ষিণাত্যে শাহজাহানের আগেকার অভিযান থেকে এই অভিযানে অনেক তফাত ছিল। এবারকার অভিযানের পেছনে শাহ্জাহানের ভবিষ্যৎ-পরিক্রমার ভাগ্য নির্ভর করেছিল। শাহ্জাহান কতখানি শক্তির অধিকারী, তা জানান দিতে হবে যেমন দক্ষিণীদের, তেমনি উত্তরে সিংহাসন নিয়ে যাঁদের গুজগুজ ফুসফুসের অন্ত নেই, তাঁদের। দক্ষিণ জয় করে তারই জয় পতাকা নিয়ে শাহ্জাহান নূরজাহান আর তাঁর জামাই শাহ্রিয়রের নাকে ঝামা ঘষে বুঝিয়ে দেবেন যে, সিংহাসন নেওয়া অত সোজা নয়। অনেক বীরত্ব দেখালে তবেই ঐ রাজতখ্‌তে বসতে পারা যায়।

শাহ্জাহানের মনে আগুন জ্বলছিল। তাই এবারকার দাক্ষিণাত্য আক্রমণে ভয়াবহ তীব্রতা ছিল—যার ধাক্কা দক্ষিণীরা সহ্য করতে না পেরে বুরহানপুর ছেড়ে দিয়ে একেবারে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। মুঘলরাও পালিয়ে-যাওয়া পিছুহটা সৈন্যদের ধাওয়া করে ছুটে গেল। এইভাবে তারা উঠল গিয়ে আহ্মদনগরের নোতুন রাজধানী 'খিড়কী'তে। সেখানে দুর্গ, প্রাসাদ, বাড়ি-ঘর-দোর ভেঙে একেবারে তছনছ করে

দিল। অবিশ্যি মালিক অম্বরের তৎপরতায় ঠিক এর আগের দিন রাত্রি বেলাতেই নিজামশাহী রাজা আর তাঁর পরিজনবর্গকে দৌলতাবাদ দুর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নইলে তাঁদের যে কী পরিণাম হত, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু পালিয়ে গিয়ে কি আর নিস্তার আছে ? মুঘলসৈন্যরাও একেবারে মারমুখী হয়ে উঠল গিয়ে সেই দৌলতাবাদেই।

মুঘলদের এই মরণপণ লড়াই দেখে, উপরন্তু শাহ্জাহানের যুদ্ধনীতি আর তাঁর পিলে-চমকে-দেওয়া সশস্ত্রবাহিনীকে দেখে মালিক অম্বর বুঝলেন, আর বৃথা চেষ্টা। আপাতত এই মারণ-আঘাত থেকে বাঁচতে হলে আত্মসমর্পণ করে শান্তি-চুক্তি করাই শ্রেয়, অনর্থক পড়ে পড়ে শুধু মার খাওয়ার কোন মানে হয় না। একটু সামলে নিয়ে সুযোগসুবিধে মতো পরে না হয় আবার দেখা যাবে।

মালিক অম্বর শাহ্জাহানের কাছে আত্মসমর্পণের চুক্তিতে শান্তির প্রস্তাব করে পাঠালেন। প্রস্তাব পেয়ে শাহ্জাহান লাফিয়ে উঠলেন। তিনিও তো ক'দিন ধরে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে এই প্রস্তাব পাওয়ার আশাতেই বসেছিলেন আর নয় যুদ্ধ-যুদ্ধ করে ছ'মাস কেটে গেল। এই সময়ে ছ'মাস চলে যাওয়ার মানে ছ'টি বছর চলে যাওয়া। আবার উত্তরে এই ক'মাসে নূরজাহান কি ঘুঁটির চাল চালছেন কে জানে। অবিশ্যি আসফ খাঁ আছেন। শাহ্জাহানের এতটুকু ক্ষতির সম্ভাবনা দেখলেই তিনি সংবাদ পাঠাতে ভুলবেন না।

শাহ্জাহানের সঙ্গে দক্ষিণীদের বেশ সম্মানজনক সর্তে সন্ধি হল। স্থির হল গত দু'বছরের মধ্যে দক্ষিণে মুঘলসাম্রাজ্য থেকে দক্ষিণীরা যতখানি নিয়ে গিয়েছিল তা তো ফিরিয়ে দেবেই, এ ছাড়া এর লাগোয়া চৌদ্দক্রোশ পরিমিত জায়গাও উপরি ফাউ হিসেবে দেবে। সকলের ওপর, কর দিতে হবে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা—বিজাপুর আঠারো, আহ্মদনগর বারো, আর গোলকুণ্ডা দেবে কুড়িলক্ষ টাকা।

দাক্ষিণাত্যে এবারকার অভিযানে শাহ্জাহান সত্যিই বিজয়ী বীর।

এই বিরাট বিজয়বার্তা তাড়াতাড়ি পাঠানো হল সম্রাটের কাছে। সম্রাট আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাপতিদের তিনি যথেচ্ছ সম্মানে সম্মানিত করলেন।

শাহ্জাহানকে পাঠানো হল একটি বিশেষ পুরস্কার—চুনিপাথর সেটকরা একটি পাখির পালক—দাক্ষিণাত্য বিজয়ীর একটি বিশেষ সম্মানচিহ্ন। জাহাঙ্গীরকে এই পালকটি দিয়েছিলেন পারস্যের শাহ্। শাহ্জাহান আর একটি জিনিস পেলেন—সেটি হল একটি তেজিয়ান ঘোড়া, নাম—রামরতন।

এর পর কয়েকটি মাস শাহ্জাহান বুরহানপুরে থেকে দক্ষিণে মুঘল রাজ্যগুলির সংগঠন ও সুশাসনের জন্য বিধিব্যবস্থা করলেন। এখন যত ব্যবস্থা করবেন, আখেরে সিংহাসনে বসবার পর ততই ভালো ফল দেবে।

শাহ্জাহান যখন দক্ষিণ ভারতে মুঘলশাসননীতি ও সংস্কার নিয়ে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে, ১৬২১ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে খবর এল, সম্রাট জাহাঙ্গীর গুরুতর পীড়ায় অসুস্থ—বেঁচে ওঠার আশা কম।

খবরটি পেয়ে শাহ্জাহান সোজা হয়ে বসলেন। এইবার······ এইবারই যথার্থ সময় হয়েছে।

শক্তির বিধানে রাজদণ্ড যার প্রাপ্য, তাকে তো অপ্রিয় কাজ করতেই হবে, করতে হবে বলেই······

শাহ্জাহান দূর থেকে খসরুর দিকে একবার তাকালেন। রাজনীতিতে উচ্ছ্বাস আবেগের স্থান নেই, শাহ্জাহানের মনেও নেই। কিন্তু তবু কেন জানি খসরুর মুখের দিকে শাহ্জাহান বেশ

খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। এই মুখের দিকে তাকালে মনে হয় না পৃথিবীর কোথাও হিংসা আছে, দ্বেষ আছে, মানুষের মধ্যে পিশাচ আছে, শয়তান আছে। এই মুখ দেখে শুধু মনে হয়, এ জগৎ সুন্দর, জগদীশ্বর সুন্দর, সুন্দর তাঁর সৃষ্টি। এ মধুর পৃথিবীতে কেউ দোষ করে না, কেউ পাপ করে না· ····

তোমারও কোন দোষ নেই, দোষ শুধু তোমার ভাগ্যের। নইলে সম্রাট-পিতার বড় ছেলে হয়েই-বা জন্মালে কেন? অন্ধ হয়ে গিয়েও একটু আলোর হদিস পেলে কেন? নূরজাহানের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে চরিত্রবলের মহত্ত্ব দেখালে কেন·····? দোষ তোমার নয়, দোষ তোমার নসিবের! কিসমত তোমাকে যে দিকে টানবে, তোমাকে সে দিকেই চলতে হবে বৈকি······ শাহ্‌জাহান চোখ ফিরিয়ে নিলেন। আর দেরি নয়, এইবারই যথার্থ সময় হয়েছে······

১৬২২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাস।

শাহ্‌জাহান খানখানাকে ডাকলেন, আরও কয়েকজন অন্তরঙ্গ কর্মচারীদের ডাকলেন। অতি গোপনে, প্রায় ইঙ্গিতে শাহ্‌জাহান ওঁদের কি যেন বললেন। তাঁরা মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন। ওঁদের উত্তরে শাহ্‌জাহান নিশ্চিন্ত হলেন। নিশ্চিন্ত হয়েই শাহ্‌জাহান হাঁক দিলেন—শীগগির সব গুছিয়ে নাও, শিকারে যাব। যুদ্ধ করে অনেক হিম্মত খরচ হয়েছে, এখন একটু মনের বাসনা পুরিয়ে শিকার করব, ফুর্তি করব। শিকারের মতো উল্লাস আর কোথায় মেলে?

লোক লস্কর নফর বাঁদী নিয়ে শাহ্‌জাহান শিকারে রওনা দিলেন। মাত্র কয়েকদিনের জন্য তার পরেই ফিরে আসবেন। আর এই ফাঁকে······শাহ্‌জাহান তাকালেন খানখানার দিকে, খানখানা তাকালেন শাহ্‌জাহানের অন্তরঙ্গদের দিকে······

কিছু চিন্তা নেই, শাহ্‌জাদা ফিরে এসে দেখবেন, কাজ ফতে হয়েছে। উনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

'আর বেতমিজ, তুই? সব কিছু বুঝে নিয়েছিস তো?' শাহ্জাহান আঙুল উচিয়ে রেজা নামে এক দানব সদৃশ ক্রীতদাসের দিকে তাকিয়ে গর্জন করে উঠলেন।

ক্রীতদাসের নারকীয় মুখটাতে কুতকুতে চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠল। বুঝে আবার নেয় নি? শাহ্জাদা তাকে যে আদেশ দিয়েছেন, তাতে আনন্দ কত, উল্লাস কত!

রাত বেড়ে চলেছে। চারদিক প্রায় নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে প্রহরীদের সাবধানী হাঁক, আর মত্ত মানুষের জড়িত অর্ধোচ্চারিত অর্ধস্ফুট কথা······এ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না।

খসরুর ঘর। পালঙ্কের ওপর খসরু শুয়ে আছেন। ঘুম আসছে আবার ভেঙে যাচ্ছে। একটা অসোয়াস্তি। কি যেন এক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন তিনি। দুটি চোখে পুরনো ক্ষতচিহ্ন। তার ওপর সাদা পুরু পর্দা পড়ে গেছে। একটা চোখ দিয়ে সামান্য হদিস মেলে সামনে যা কিছু থাকে, বা নড়েচড়ে বেড়ায়······

খসরুর কান হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল। কে যেন দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে—টুক্ টুক্ করে শব্দ করছে!

এত রাতে দরজা নাড়াবে কে! দরজায় আস্তে ধাক্কা পড়ল। গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—'দরজা খুলুন······'

এক অজানা আশঙ্কায় খসরু ভীত হয়ে উঠলেন—'এত রাতে আমি দরজা খুলব না।'

'ভয় নেই, সম্রাটের আদেশ নিয়ে এসেছি, আপনি মুক্তি পেয়েছেন। আপনার জন্য সম্মান-বস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, দরজা খুলুন······'

মুক্তি! এতদিন পরে সত্যিই কি তাঁর স্বাধীনভাবে ঘুরে ফিরে বেড়াবার, স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার হুকুমনামা এসেছে!

মুহূর্তের জন্য খসরুর বুকের রক্ত মত্ত হয়েই আবার জমে নিথর

হয়ে গেল। এ কোন শত্রুর ছলনা নয় তো? ভাগ্য তাঁকে নিয়ে রসিকতা করছে না তো?

'আমি খুলব না দরজা—কিছুতেই না……' খসরু আর্তনাদ করে প্রতিবাদ জানালেন।

'দরজা খুলতেই হবে—দরজা আমি খুলবই……'

দরজার গায়ে চাড় পড়তে লাগল। খসরুর অর্থহীন ঘোলাটে চোখের সামনে করাল ছায়া নেমে এল। দরজা খুলে গেল। খসরু চমকে উঠলেন। সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ালদর্শন ক্রীতদাস রেজা। পেশীবহুল দুটি হাতে হিংস্র নখর-লাঞ্ছিত দুটি মৃত্যু-থাবা,—থাবা নেমে এল খসরুর মুখের ওপর, তাঁর নীল রক্তে বয়ে-যাওয়া শুভ্র কণ্ঠনালীর ওপর চেপে বসল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু, বিজ্ঞ চরিত্রবান খসরু, সর্বস্নেহধন্য মহৎ খসরু প্রাণপণে একবার নিশ্বাস নিতে চাইলেন, পারলেন না। রেজার থাবার মুঠি আরও শক্ত, আরও কঠিন হয়ে উঠল।

খসরু ঘুমিয়ে পড়লেন। নাক দিয়ে হয়তো বা দু'ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে এল, নিশ্চল হাত দুটি দুপাশে ঝুলে পড়ল।

এতদিনে খসরু শান্তি পেলেন, সব ভয় ভাবনা উৎকণ্ঠা থেকে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

ভোর হল, খসরুর স্ত্রী দোর ঠেলে ঘরে ঢুকলেন দেখলেন স্বামী পালঙ্কের ওপর শুয়ে আছেন, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘুমেভরা স্বামীর সুন্দর মুখখানা দেখে স্ত্রীর বুকে মোচড় দিয়ে ওঠে, এমন একটা মহৎ প্রাণকে এই পৃথিবী কিছুই দিল না, দিল শুধু অন্ধকার, আর বন্দী জীবন……

কিন্তু সকালবেলা এত ঘুম কেন? স্বামীর মুখের ওপর ঝুঁকে এল স্ত্রীর মুখ। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো স্ত্রী চমকে উঠলেন, স্বামীর শুভ্রকণ্ঠে সাঁড়াশির মতো নীল নীল দাগ! ও কিসের দাগ! ও কোন্ আঘাতের চিহ্ন?

স্বামীর নিশ্চল বরফঠাণ্ডা শরীরটিকে মৃত্যুর যন্ত্রণায় জড়িয়ে ধরলেন দুর্ভাগা স্ত্রী, তাঁর বুকভাঙা আর্তনাদ খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল বুরহানপুরের প্রাসাদে, পাহাড়ে, জঙ্গলে।

শাহ্জাহান এবার শিকার করতে গিয়ে তাঁর নিপুণ হাতের লক্ষ্যভেদী কৃতিত্বে নিজেকে তারিফ করলেন। শিকারে তাঁর এত নৈপুণ্য! কই তিনি তো এতদিন জানতে পারেন নি! রাজার ছেলে বটে! সিংহাসনের ভাবী অধিকারীর গুণপনার তুলনা নেই।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে কিছুদিন পর খবর গেল—খসরু নেই, দুরারোগ্য শূলব্যথায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

জাহাঙ্গীর তাঁর ক্লিষ্ট ক্লান্ত চোখ দুটি তুলে একবার মহাকাশের দিকে তাকালেন, তার পর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন······।

প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে নূরজাহানও হঠাৎ ছটফটিয়ে উঠলেন, কিছুক্ষণ সামনের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে সরে এলেন। তাঁর মনে আজ ব্যথার বন্যা, বুকভরা আজ অশান্তির দাহ। কে তাঁকে আজ সান্ত্বনা দেবে? কে তাঁকে আজ মনে শক্তি দেবে?

মা আর বাবা, আসমৎ বেগম আর ইতিমদ-উদ-দৌলা, তাঁরা দু'জন যে এপারের দেনা মিটিয়ে পর পর চলে গেলেন ওপারে। আসমৎ বেগম গেলেন ১৬২১ খ্রীস্টাব্দে, কয়েক মাস পরে ইতিমদ-উদ-দৌলা—১৬২২ খ্রীস্টাব্দে।

মাঝে মাঝে অস্থির-হয়ে-ওঠা মেয়েকে আসমৎ বেগম আর সান্ত্বনা দেবেন না।

রাজনীতির পিছল পথে আলোর নির্দেশ দিতে ইতিমদ-উদ-দৌলা আর কথা বলবেন না।

নূরজাহান কি আর উঠতে পারবেন? নূরজাহান-'জুনতা' যে ভেঙে টুক্রো টুক্রো হয়ে গেল। মা-বাবা নেই, শাহ্জাহান আজ প্রতিপক্ষ দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর পেছনে আসফ খাঁ। এদিকে

দুর্বলবাহু নূরজাহান, আর 'ন-সুদনী' শাহ্রিয়র। নূরজাহান-চক্রের এবার কি গতি হবে?

নূরজাহান হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কেন তিনি দুর্বল হয়ে পড়বেন? কেন দুর্বলতা দেখাবেন? লোকে যে অন্যরকম বুঝবে! শাহ্জাহান আর আসফ খাঁ উল্লসিত হবেন। ভয় কি? সম্রাট জাহাঙ্গীর তো এখনও বেঁচে আছেন! সিংহাসনের ওপর তাঁর আসন তো এখনও স্থির। তবে? নূরজাহানের কোন ভয় নেই। তিনি পিছিয়ে আসবেন না। নূরজাহান-'জুন্‌তা' ভেঙে গেলেও তিনি ভাঙবেন না।

শক্তির খেলা আবার শুরু হল।

রাজনীতির খেলায় নূরজাহান এবার সীমা ছাড়ালেন। কিছু দিন পরে যে ঘটনাটি ঘটবেই, সেই অমোঘ বিধানকে খণ্ডন করবার জন্য নূরজাহান রুখে উঠলেন—জাহাঙ্গীরের পর মুঘল-সিংহাসনে শাহ্জাহানকে কল্পনা করা অসম্ভব।

আবার শুরু হল……।

খসরুর মৃত্যুতে নূরজাহানের একটি উদ্দেশ্য সফল হল—একটি বাধা সরে গেল। কিন্তু এবারকার যে বাধা, সে যে ঐরাবত-বাধা। নূরজাহান-চক্রের একদা প্রিয়তম সহযোগী শাহ্জাহান আজ নূরজাহানের তিক্ততম প্রতিযোগী। নূরজাহান তৎপর হলেন নিজের শক্তিবৃদ্ধির জন্য।

ইতিমদ্-উদ-দৌলা মারা যাবার পর তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি ঐশ্বর্য সম্মান মর্যাদা জাহাঙ্গীর নূরজাহানের হাতে হস্তান্তরিত করে দিয়েছিলেন, এছাড়া আরও বহু জায়গীর নূরজাহানের অধিকারে ছিল। ঐশ্বর্য, সম্মান ও সৈন্যবাহিনী—এর জন্য তো নূরজাহানের

ভাবনা নয়, তাঁর ভাবনা হল কি করে কোন্ সুযোগে জাহাঙ্গীর ও শাহ্জাহান, পিতা ও পুত্র, এই দু'জনের মাঝখানে একটা স্থায়ী চিড় খাওয়ানো যায়। এমন চিড় যার ঘা জীবনে মিলোবে না। জাহাঙ্গীর দুচোখে দেখতে পারবেন না শাহ্জাহানকে, কাছে এলে দূরে তাড়িয়ে দেবেন। এই কাজে যদি নূরজাহান সার্থক হন, তবেই তো তাঁর এতদিনের সাধনা, সতর্কতা ও একাগ্রতা সফল হবে, তাঁর জীবন সফল হবে—সফল হবে তাঁর এতদিনের কূটকচালি!

ঈশ্বর মুখ তুলে তাকালেন। পারস্যরাজ শাহ্ আব্বাস ১৬২২ খ্রীস্টাব্দে আচমকা কান্দাহার দুর্গ আক্রমণ করলেন। এতবড় গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটি হাতের মুঠোয় পুরলেন।

ওদিকে এই খবরে জাহাঙ্গীরের বুকের পাঁজর ক'খানা যেন খসে গেল। কান্দাহার হাত ছাড়া হওয়া মানে তো নিজের দেহের একটা পাশ কেটে যাওয়া। এতবড় একটা বিপদ যে এগিয়ে আসতে পারে এ তো তিনি বা নূরজাহান চিন্তা করা দূরে থাক, কখনো কল্পনা করতে পারেন নি।

সেই কবে ১৬০৬ খ্রীস্টাব্দে শাহ্ আব্বাস একবার কান্দাহার আক্রমণ করে ব্যর্থতার লজ্জায় ক্ষমা ভিক্ষা করে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে এতদিন ধরে যে তিনি মনের মধ্যে বিষ পুরে রেখে দিয়েছিলেন তা কে জানত! অথচ কী ভালোমানুষের মতোই না দূতের পরে দূত পাঠিয়েছেন মুঘল দরবারে, চোখ-ধাঁধানো মনমাতানো অগুণ্‌তি জিনিস ভেট দিয়েছেন মুঘল সম্রাটকে! চতুর শাহ্ আব্বাস একদিকে ভেট পাঠিয়েছেন, অন্যদিকে সব কিছু ভণ্ডুল করে দেবার সুযোগ খুঁজেছেন। মিছরির ছুরি তো একেই বলে! পারস্যের ভালোমানুষীতে মুগ্ধ হয়ে জাহাঙ্গীর যখন কান্দাহার সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিন্ত ও উদাসীন হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে কান্দাহারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল শাহ্ আব্বাসের সেনাবাহিনী।

জাহাঙ্গীর-নূরজাহান দুজনেই তখন কাশ্মীরে। মুলতানের গভর্নর

খবর পাঠালেন—শুধু কান্দাহারই নয়, তট্টার ওপরেও শাহ্ আব্বাসের দৃষ্টি পড়েছে। যা করবার তাড়াতাড়ি না করলে পস্তাতে হবে।

জাহাঙ্গীর আর নূরজাহান তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন। কান্দাহার উদ্ধারের জন্য সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। শাহ্জাহানের কাছে সম্রাটের নির্দেশ গেল……শীগগির তৈরি হয়ে নাও, কান্দাহার বিপন্ন, উদ্ধার করতে হবে……

সৈন্য, সেনাপতি, অস্ত্রাদি ছাড়াও রাজ-কোষাগারের একটা মোটা অংশ ধার্য করা হল এই সীমান্ত অভিযানের খরচ মেটানোর জন্য……।

এত বড় বিরাট অভিযানের সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হল স্বভাবতই শাহ্জাহানকে।

যাত্রার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ, শাহ্জাহান বুরহানপুর ছেড়ে দিয়ে মাণ্ডুতে এলেন, এসেই বললেন,—'এখন আর এগুবো না। বর্ষাটা এখানেই কাটাবো……'

শাহ্জাহান আরও বললেন—একটু চিবিয়ে চিবিয়েই বললেন, কান্দাহার উদ্ধারে তাঁর আপত্তি নেই, বরং আগ্রহই আছে। কিন্তু তিনটি সর্তে; প্রথম—তাঁকে কান্দাহার অভিযানের একক কর্তৃত্ব দিতে হবে, দ্বিতীয়—গোটা পাঞ্জাবের ওপর তাঁর আধিপত্য স্থাপিত হবে। তৃতীয়—পরিবার পরিজনবর্গকে নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় রাখবার জন্য রণথম্ভর দুর্গটি তাঁর হাতে তুলে দিতে হবে।

শাহ্জাহানের চালে এখানে মস্ত একটা ভুল হয়ে গেল। তিনি ভেবেছিলেন দাক্ষিণাত্যে যাবার সময় খসরুকে সঙ্গে নেবার জন্য যেমন তিনি ঘাড় বাঁকিয়ে নিজের কাজ হাসিল করে নিয়েছিলেন, তেমনি বুঝি এবারেও হবে। সুতরাং—আমাকে ঐ দিতে হবে, তাই দিতে হবে, আমি এখানে থাকব, ওখানে যাব—বিপদের মুখে এই চালে কিস্তি মাত করতে চাইলেন। কিন্তু দিনকাল পাল্টেছে, জাহাঙ্গীরের মত-ও পাল্টিয়েছে। নূরজাহানের অনুরোধকে তিনি

আদেশ বলে পূজো করেন, তাঁর কথায় সম্রাট খান-দান, ঘুমোন। আর এটাই বা শাহ্‌জাহান কেন বুঝতে পারছেন না যে, খসরু চলে যাওয়াতে তাঁর যেমন পথের একটা মস্ত বাধা দূর হয়েছে, তেমনি বাধা দূর হয়েছে নূরজাহানেরও! আর সেই জন্যই নূরজাহান শাহ্‌জাহানের প্রথম বারের ঘাড় বাঁকানোতে সায় দিলেও এবার আর দেবেন না! এখন তিনি তাঁর পথের বৃহত্তম বাধাকে সরাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন!

এই সময়ে নূরজাহানের চিন্তার ঝড়ে দু'দিক দিয়ে কুটো উড়ছিল। নূরজাহানের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল জাহাঙ্গীরের মন থেকে শাহ্‌জাহান সম্বন্ধে সবটুকু স্নেহ, সবটুকু ভালো উঁচু ধারণাকে নিঃশেষে ধুয়ে মুছে ফেলা। কান্দাহার অভিযানে তাঁর সেই সুযোগটি এসে গেল।

প্রথমতঃ শাহ্‌জাহান যদি পিতার আদেশ শুনে কান্দাহারে যান—ঐ দূর আর দুর্গম পথ, ভয় বিপদসঙ্কুল অভিযান, যে অভিযান প্রচুর সময়, শক্তি ও বহু মানুষের প্রাণ সাপেক্ষ—নূরজাহানের পক্ষে তা ভালই হবে। শাহ্‌জাহানের বহুদিন অনুপস্থিতিতে তিনি অনেকখানি সময় পাবেন শাহ্‌রিয়রের পক্ষ নিয়ে সম্রাটের কাছে কাজ গুছানোর।

আর অন্য দিকে যদি শাহ্‌জাহান কান্দাহার অভিযানে যেতে গাঁইগুঁই করেন, নানা বায়নাক্কা তোলেন—যার নমুনা এখন থেকেই দেখা যাচ্ছে—তা হলে তো আরো সুবিধে। জাহাঙ্গীরের কাছে তা হলে বেশ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিরসমুখে বলা যাবে, ছেলের রকম সুবিধের দেখছি না, বাপের কথা মানতে গিয়ে যেমন নানা আব্দার ধরেছে, বাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে কতক্ষণ! এ তো বিদ্রোহী হল বলে!

নূরজাহান দুদিকেই ধার দিতে লাগলেন। শাহ্‌রিয়রের 'ন-সুদনী' নামটা ঘোচাতে হবে, নূরজাহান যার পেছনে তার ভাবনা কি? পেছনে নূরজাহান না থাকলে খুরমই কি এত সহজে শাহ্‌জাহান হতেন নাকি?

নূরজাহান কি মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছিলেন? নইলে কেন তিনি বুঝতে পারলেন না যে, আগেকার নূরজাহান-চক্রের নূরজাহান, সুস্থ সবল সম্রাটের মহীয়সী স্ত্রী নূরজাহান, আর ১৬২২ খ্রীস্টাব্দের ভাঙা হাটের নূরজাহান, অসুস্থ অশক্ত সম্রাটের চক্রহীন নূরজাহানে অনেক তফাত? তবু নূরজাহান কাজ করে চললেন।

'শাহ্‌জাহানকে একটু টেনে ধরতে হবে, সম্রাট। নইলে বিপদের সীমা থাকবে না। এই বিপদে বাছাই করা সেনাপতিদের নিয়ে উনি খুশি-মতো মাণ্ডুতে বসে থাকবেন, এ-ই বা কেমন কথা? উপযুক্ত ছেলের এই কি কর্তব্য······! অবাধ্য ছেলের হাতে এত লোকলস্কর, এত ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, সম্রাট।'

নূরজাহানের ক্রমাগত আশঙ্কার বাণীতে জাহাঙ্গীর সত্যিই আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তিনি দক্ষিণে খবর পাঠালেন, শাহ্‌জাহান যদি বর্ষাটা ওখানে কাটাতে চান তো কাটান। কিন্তু যে ক'জন দক্ষ সেনাপতি সেখানে আছেন, দলবল নিয়ে তাঁরা যেন শীগগির চলে আসেন রাজধানীতে। কান্দাহার অভিযানে তাঁদের প্রস্তুত হতে হবে। দেশের এই বিপদে তাঁদের চুপ করে থাকলে চলবে না, এ কথা যেন তাঁরা মনে রাখেন।

সম্রাটের এই কড়া আদেশ শাহ্‌জাহান খানিকটা ভাবলেন তারপর আবার এক নতুন দাবি করে বসলেন। অবিশ্যি কিছুদিন আগেই সম্রাটের কাছে এই দাবিটি পেশ করেছিলেন। দাবিটি হল ঢোলপুর পরগনার জায়গীর-স্বত্ব লাভ করা। শাহ্‌জাহান এই জায়গাটি চাইলেন। শুধু তাই নয়, এই জায়গীরটি নিশ্চয় পাবেন এই মনে করে তিনি কিছু লোকজন শুদ্ধ আফগান সেনাপতি দরিয়া খাঁকে ওখানে পাঠিয়ে দিলেন ওখানকার শাসনভার নেবার জন্য। কিন্তু ইতিমধ্যে নূরজাহান যে আগে থেকে সব কাজ সেরে রেখেছেন, সে কি আর তিনি বুঝতে পেরেছিলেন! দরিয়া খাঁ ঢোলপুরে পৌছেই দেখলেন নূরজাহানের লোক সরিফ-উল্‌-মুল্‌ক্‌ তরোয়াল বাগিয়ে

দাঁড়িয়ে আছেন। ঢোলপুর শাহ্জাহানের নয়, ঢোলপুর শাহ্রিয়রের। সরিফ-উল্-মুল্ক্ তাঁর ফৌজদার।

সব কিছু শুনে দরিয়া খাঁ হুঙ্কার ছাড়লেন, 'কভি নেহি'! এ জায়গা আমার প্রভুর,—শাহ্জাহানের······'

সরিফ-উল-মুল্ক্ গর্জন তুললেন, 'কভি নেহি, এ জায়গা আমার প্রভুর—শাহ্রিয়রের··· ··'

ঘটনা গড়ালো অনেক দূর। রীতিমতো একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল। বিস্তর লোক আহত হল, প্রচুর লোক মারা গেল। চোখে তীর লেগে সরিফ-উল্ মুল্ক্ নিজে আহত হলেন।

খবর চলে গেল খাসমহলে। নূরজাহান মনে মনে উল্লসিত হয়ে বিরসমুখে জাহাঙ্গীরকে বললেন, 'যা আশঙ্কা করেছিলাম, একেবারে বর্ণে বর্ণে ফলে গেল। এই ছেলেকে যতই কেন না দেওয়া হোক, যতই কেন না উঁচুতে তোলা হোক, এর মনের ময়লা দূর করার সাধ্য কারো নেই। যে ছেলেকে বাপ রাজার সম্মান দিয়েছেন, শক্তি দিয়েছেন, সেই ছেলে কিনা বাপের মুখের ওপর কথা বলে, তাঁর কাজের প্রতিবাদ করে! এমন দুর্বিনীত ছেলে কি কোন আদরের যোগ্য, না তাকে কোন বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়?'

নূরজাহানের মুখের দিকে তাকালেন জাহাঙ্গীর। এক নাগাড়ে সম্রাটের সেবা পরিচর্যা করে তাঁর রাজকার্য চালিয়ে খুঁটিনাটি সব কিছু ঠিক রেখে নূরজাহান সত্যিই আশ্চর্য খেলা দেখিয়ে যাচ্ছেন। জাহাঙ্গীর কৃতজ্ঞ, খুব কৃতজ্ঞ নূরজাহানের কাছে। নূরজাহান না থাকলে এই সব বিপদের মুখে আঙুল দেখিয়ে সম্রাটকে কে সাবধান করতেন, কে পরামর্শ দিতেন?

নূরজাহানের পরামর্শে জাহাঙ্গীর কান পাতলেন, শাহ্জাহানের ওপর আর আস্থা রাখলে সাম্রাজ্যের মহা অমঙ্গল। শাহ্জাহানের যে মতিগতি, তাতে ওর ওপর কোন দায়িত্বভার চাপানো মানে সব কাজ বানচাল হয়ে যাওয়া···'

নূরজাহান সম্রাটের রেখালাঞ্ছিত কপালে পদ্মহাতের স্পর্শ দিলেন। চারবছর আগে নূরজাহান চল্লিশ পার হয়ে গেছেন। তবু নূরজাহানের দেহে সতেজ চামড়ায় টান ধরে নি, মুখলাবণ্যে এতটুকু ক্ষয়ের আশঙ্কা জাগে নি। নূরজাহান—স্থিতযৌবনা উর্বশী, বুদ্ধির দ্যুতিতে অপরূপা।

জেড পাথরের সবুজ পানপাত্রে লাল পানীয়, জাহাঙ্গীর তাতে চুমুক দেন। নেশায় আবিষ্ট হয়ে নূরজাহানের কথায় সায় দেন, 'তাই হবে, তোমার কথাই ঠিক। শাহ্রিয়রের মতো লক্ষ্মী বাধ্য ছেলেকেই আমি কান্দাহার অভিযানের সব দায়িত্ব দেবো। সঙ্গে মির্জা রুস্তম থাকবে, ভাবনা কি? সে আর ইতিকদ্ খাঁ তো লাহোর আগেই চলে গিয়েছে। শাহ্রিয়রের কোন অসুবিধেই হবে না। দক্ষিণের ঐ বেটাচ্ছেলেকে দিয়ে আর দরকার নেই। ভারী তো···হুমকি দিয়ে দিয়ে কেবল ভয় দেখাচ্ছে···!'

নূরজাহান সম্রাটের প্রায় কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'দক্ষিণ ছেড়ে শাহ্জাহান আবার উত্তরে না ঘাঁটি গাড়ে সম্রাট!'

'উত্তরে কোথায় পা দেবে শুনি?'

'কেন সম্রাট, উত্তরে শাহ্জাহানের যে জায়গীরগুলো আছে, সেখানে তো অনায়াসে আমাদের বিরুদ্ধে এক-একটা কেল্লা গড়ে উঠতে পারে!'

'তা পারে···' জাহাঙ্গীরের মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। শাহ্জাহানের এককাট্টা স্বভাবে তিনি বিরক্ত, আবার ঐ ছেলের বাহুবলে তিনি শঙ্কিতও তো বটে। ইচ্ছে করলে ঐ ছেলে বাপকে অন্তত নাজেহাল তো করতে পারে!

'এক কাজ করলে হয় না?' নূরজাহানের মুখ আবার সম্রাটের কানের কাছে নেমে এল, 'শাহ্জাহানের নামে যে জায়গীরগুলো আছে, সেগুলো শাহ্রিয়রের নামে লিখে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। শাহ্জাহানকে তা হলে আর এখানে কোথাও ঠাঁই পেতে হবে না···'

জাহাঙ্গীর নূরজাহানের ধারালো চোখের দিকে একবার তাকালেন, তারপরে বললেন, 'তাই হোক, ব্যাটাচ্ছেলের একটু শিক্ষা হোক।'

চামেলি ফুলের উগ্র গন্ধে তখন চারিদিক ভরে গেছে, নূরজাহান চামেলি ফুল বড় ভালবাসেন।

'শুধু উত্তরেই নয়, দক্ষিণেও শাহ্‌জাহানের যেখানে যতটুকু জমিদারী আছে তারও কিছুটা শাহ্‌রিয়রকে যেন দিয়ে দেওয়া হয়··· শাহ্‌জাহানকে একটু বোঝানো দরকার যে, সিংহাসনে বসবার আগে তার শক্তির সীমা কতটুকু···'

নূরজাহানের মুখে রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল। নাই বা থাকল নূরজাহান-চক্র, নূরজাহান একাই যথেষ্ট।

শাহ্‌জাহানের কাছে খবর গেল, তিনি তো গোঁ ধরে মাণ্ডুতে বসে আছেন—ওদিকে তো সব ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। একের পর এক সম্পন্ন জায়গীরগুলো বেহাত হয়ে চলে যাচ্ছে ঐ শাহ্‌রিয়রের হাতে।

'নূরজাহানের মেয়েকে বিয়ে করে রাতারাতি আকাশে উঠতে চাইছেন ভাই আমার···' শাহ্‌জাহান মুখে রাগ-রাগ দেখালেন বটে, কিন্তু মনে মনে ভয়ও পেলেন। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। এখনও সিংহাসনে বসে আছেন যে-বাপ, তাঁকে এত তাড়াতাড়ি চটানো ঠিক হয় নি। তার ওপর বাবা তো এখন আর নিজের বুদ্ধিতে চলছেন না। যাই হোক আপাতত বাবাকে ঠাণ্ডা করা দরকার, তারপর ঠিক জায়গায় ঠিক আঘাতটি দিলেই হবে।

শাহ্‌জাহান তাড়াতাড়ি করে তাঁর বিশ্বস্ত ও কূটনৈতিক সেক্রেটারী আফজল খাঁকে তলব করলেন। তাঁর হাত দিয়ে বাবাকে সম্বোধন করে একখানা চিঠি লিখে পাঠালেন, 'আমি তো চিরকাল অত্যন্ত আনুগত্যের সঙ্গেই সাম্রাজ্যের সেবা করে এসেছি; তবে আজকে কেন বিনা দোষে সম্রাটের স্নেহ-অনুগ্রহ থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে? নূরজাহানের নির্দেশে যদি এই ভাবে আমার

জায়গীর থেকে আমাকে উৎখাত করা হয়, তাহলে চারদিকে শত্রু-বেষ্টিত হয়ে আমি কি করে বাঁচব? তার চাইতে সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে দক্ষিণ থেকে বিদায় নিয়ে আমি মক্কায় চলে যাই না কেন! সেখানে যাহোক করে ফকিরী নিয়ে দিন কাটাব…'

আফজল খাঁ চিঠি নিয়ে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে ছেলের চিঠিখানা দিলেন, নিজেও নানারকমে সম্রাটকে বোঝাতে চাইলেন। কিন্তু অসম্ভব। দূতকে নেহাতই একটি সম্মানবস্ত্র দিতে হয়, তাই দিয়ে কোন কথা না শুনে সম্রাট আফজল খাঁকে দূর-দূর করে বিদায় দিলেন। শুধু তাই নয়, এর পরে উত্তর ভারতে শাহ্‌জাহানের নামে আর বাকি যে সব জায়গীর ছিল, মায় উত্তরাধিকারীর জন্য নির্দিষ্ট হিসার-ফিরোজ নামে মস্ত বড় জায়গীরটা পর্যন্ত—শাহ্‌জাহানের নাম তুলে দিয়ে শাহ্‌রিয়রের নামে লিখে দিলেন।

নূরজাহান যেন একেবারে মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন, কি করে শাহ্‌জাহানের হাত পা প্রত্যেকটি খোঁড়া করে তাঁকে একেবারে রাস্তার ধুলোয় বসিয়ে দেওয়া যায়।

নূরজাহান শুধু শাহ্‌জাহানকে বিষনজরে দেখলেন না, তিনি বাঁকা চোখে তাকালেন ভাই আসফ খাঁর দিকেও। নূরজাহান-চক্রের আর একটি শক্তিশালী বুদ্ধিমান সদস্য আসফ খাঁ—শাহ্‌জাহানকে জামাই করে আরও শক্তিমান। কিন্তু কার জন্যে সব হল শুনি! বোন নূরজাহানের জন্য নয়? তিনি তাঁর যোগ্যতা আর রূপ দিয়ে জাহাঙ্গীরকে মুগ্ধ করেছিলেন বলেই না জাহাঙ্গীর তাঁর বাপ ভাইকে দেখে মুগ্ধ হওয়ার এতটা বাড়াবাড়ি দেখিয়েছিলেন? ভাইয়ের যোগ্যতা আছে মানতেই হবে। কিন্তু সব যোগ্য লোকেই কি স্বর্গের সিঁড়ি খুঁজে পায়? যে বোনের জন্য এতখানি, এখন কিনা সেই বোনকে বাদ দিয়ে জামায়ের গুণে মশগুল! জন-জামাই-ভাগনা, তিন নয় আপনা—এই কথাটা কেন আসফ খাঁ বুঝতে পারছে না?

আসফ খাঁ কিন্তু এ পর্যন্ত মুখে বা ব্যবহারে নূরজাহানের কোন কাজের মৃদুতম প্রতিবাদটুকুও করেন নি। তবে বাইরে কিছু প্রকাশ না করলেও মনের মধ্যে যে বোন-ভগ্নীপতির বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যাচ্ছে এ কথাটা কি নূরজাহানের বুঝতে আর বাকি আছে? সে বুদ্ধিটুকুর অভাব থাকলে নূরজাহান আকবরের এমন মেজাজী রাশভরী সদা-উদ্ধত ছেলে সম্রাট জাহাঙ্গীর আর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যকে চালাতে পারতে ননা।

নূরজাহান আসফ খাঁকে আর একান্ত বিশ্বস্তজন বলে মনে করতে পারলেন না। তাই তাঁকে কোথাও যেতে দিলেন না, চোখে চোখেই রাখলেন।

নূরজাহান বুঝতে পেরেছিলেন, অনেক ত্যাক্ত করে শাহ্‌জাহানকে তিনি যে ঢিলটি মেরেছেন, তা পাটকেলটি হয়ে ফিরে আসবে। অত সম্মান-সম্পত্তি হারানোর পর শাহ্‌জাহান ছেড়ে কথা কইবেন না।

এইবার ডাক পড়ল আর একটি লোকের। ইনি নূরজাহানের ইতিহাসে এতদিন উপেক্ষিত সেনাপতি মহাবৎ খাঁ। একদা যে মহাবৎ খাঁ ছিলেন নূরজাহান-চক্রের ঘোর প্রতিবাদকারী এক শত্রুবিশেষ, এখন নূরজাহান-জাহাঙ্গীরের বিপদে তিনিই হলেন প্রধান সহায়, প্রধান সম্বল।

রাজনীতির হাওয়া বড় এলোমেলো।

মহাবৎ খাঁ এতদিন পর্যন্ত বলতে গেলে একঘরে হয়ে ছিলেন কাবুলে। নূরজাহান জানতেন রাজ্য শাসনে তাঁর খবরদারী মহাবৎ খাঁ একেবারে পছন্দ করতেন না, নূরজাহান-'জুন্‌তার' প্রতি কাজ ও রীতিনীতিকে তিনি প্রতিবাদ করতেন। সুতরাং জাহাঙ্গীর সিংহাসনে বসবার পর তিনি মহাবৎ খাঁকে নতুন খেতাব ও মর্যাদায় সম্মানিত করেছিলেন বটে, কিন্তু নূরজাহানের অভ্যুদয়ে মহাবৎ খাঁ রাজধানী থেকে বহু দূরে প্রায় নির্বাসিত হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় যখন হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, ঠিক এমনি সময়ে এলো

সুযোগ। মহাবৎ খাঁকে ডেকে পাঠান হল। একদিকে কান্দাহার অবরোধ, অন্যদিকে শাহ্‌জাহানের বৈরী-ভাব—এই দুই বিপদের যাঁতাকলে মহাবৎ খাঁর মতো সাহসী সেনাপতি ছাড়া মুঘলসাম্রাজ্যের হাল আর কে ধরবেন? রাতারাতি সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে মহাবৎ খাঁকে উচ্চতর সৈন্যাধ্যক্ষের পদে উন্নিত করা হল। নূরজাহান নিজের শিলমোহরের ছাপ দিয়ে মহাবতের কাছে ফরমান পাঠালেন—মহাবৎ যেন পত্রপাঠ রাজদরবারে চলে আসেন, একটুও যেন দেরি না করেন।

এদিকে দেড় মাস অবরোধ করে রাখার পর কান্দাহার দুর্গের পতন হল, কান্দাহার চলে গেল পারস্যের সম্রাট শাহ্‌আব্বাসের হাতে। কিছুদিন পর একখানা চিঠি নিয়ে পারস্যের দূত হায়দার বেগ এলেন মুঘল দরবারে। মুঘলসম্রাটের কাছে শাহ্‌আব্বাসের লেখা চিঠিখানা পেশ করলেন—'…কান্দাহার পারস্যের অন্তর্ভুক্ত। এর ওপর চিরকাল পারস্যের রাজাদেরই অধিকার। মুঘলদের হাতে চলে যাওয়ার পর জাহাঙ্গীরেরই উচিত ছিল কোনরকম অশান্তি না করে কান্দাহার যাঁদের, তাঁদেরই হাতে তুলে দেওয়া। তা হয় নি বলেই শাহ্‌আব্বাস একটু জোর দেখিয়ে কান্দাহার নিয়ে নিয়েছেন। এতে তো কোন দোষ নেই! যাই হোক, তাঁদের বন্ধুত্ব কিন্তু কোন দিন ছিন্ন হবে না, বসন্তের ফুলের মতোই তা চিরপ্রস্ফুটিত থাকবে…'

এমন বসন্তবাহারের চিঠি পড়ে জাহাঙ্গীর কিন্তু দাঁতে দাঁত ঘষে বলে উঠলেন, 'বিশ্বাসঘাতক…নীচ…ছোটলোক…' ঐ ভাষা ব্যবহার করেই চিঠিখানার উত্তর দিলেন।

জাহাঙ্গীর হাঁক মারলেন, 'শীগগির সবাই তৈরী হও, কান্দাহার উদ্ধার করতেই হবে…।'

শাহ্‌রিয়রকে কান্দাহার অভিযানের অধিনায়ক করা হল, অবশ্য শুধু নামে। সঙ্গে রইলেন প্রচুর নামকরা সেনাপতি। বিহার থেকে পরভেজকে ডেকে পাঠানো হল, যতটা পারেন সৈন্য দিয়ে এক্ষুনি

যেন বাপের পাশে এসে দাঁড়ান। বড় বিপদ। আর ঠিক এমনি সময়ে খবর এল শাহ্‌জাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, অগণিত সেনাবাহিনী নিয়ে মাণ্ডু ছেড়ে উত্তরের দিকে আসছেন। অভিযানের লক্ষ্য—আগ্রা।

আসলে মুঘল-দরবার থেকে ফিরে গিয়ে আফজল খাঁ সমস্ত ব্যাপারটা বলে শাহ্‌জাহানকে বুঝিয়েছিলেন—বাকি আছে শুধু যুদ্ধ। জাহাঙ্গীর আর তাঁর সাম্রাজ্যের ওপর নূরজাহানের যে প্রভাব তা চরমে পৌঁছেছে। একমাত্র যুদ্ধ ছাড়া এই সমস্যার কোন সমাধান হবে না।

শাহ্‌জাহান সবই বুঝলেন। নূরজাহানের অদম্য শক্তিকে চুরমার করে দেওয়ার জন্য তিনি এবার রুখে দাঁড়ালেন। কান্দাহার এখন থাক, এখন শুধু নূরজাহান।

জাহাঙ্গীর দুঃখে আর রাগে বললেন, 'হতভাগা, কোথায় সৈন্য নিয়ে কান্দাহারে এগিয়ে যাবে, তা নয়—আমাকে নীচে ফেলবার জন্য যত তোড়জোড়। ছেলেটা একেবারে ভেবে দেখল না কান্দাহার উদ্ধার না করা মানে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা…'

জাহাঙ্গীরের রাগ আরও বেড়ে গেল যখন দেখলেন, শাহ্‌জাহান একা নন, তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন দক্ষিণের প্রায় সব সেনাপতি—এমন কি মেবারের রাণা করণের ছেলে কুনোয়ার ভীম আর আবদুর রহিম খানখানা পর্যন্ত।

ছেলে বিগড়োলো, আবার তাঁর সঙ্গে ঐ সত্তর বছরের বুড়ো খানখানা পর্যন্ত!

'কি করে এমন হল বল তো?' অসুস্থ জাহাঙ্গীরের কথায় যেন একটা হতাশার সুর ফুটে বেরুলো।

নূরজাহান মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'কেমন করে আবার? যেমন করে অকৃতজ্ঞ কুপুত্র বাপের মান রাখে না, বাপের ধার ধারে না—এও তেমনি! নইলে শাহ্‌জাহানকে না দিয়েছিলে কি?'

স্ত্রীর কথায় জাহাঙ্গীর চোখ বুজলেন বটে, কিন্তু মনে হল সব কিছুর মধ্যে কোথায় যেন একটা গলদ রয়ে গেছে—কিছুতেই ধরতে পারছেন না।

জাহাঙ্গীর সত্যিই গলদ ধরতে পারেন নি। অসুস্থ জাহাঙ্গীরের দুটি চোখ আড়াল করে নূরজাহান দাঁড়িয়ে থাকতেন, সম্রাটকে কিছু দেখতে দিতেন না। তাই সম্রাট বুঝতে পারেন নি, নূরজাহানের একক শক্তিচালনার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় কবে থেকে তিল তিল করে বিষ জমে উঠেছিল প্রতিপক্ষ রাজনীতিক-রাজকর্মচারীদের মনে। শক্তি সামর্থ্যে তাঁরা কেউ কম যান না, বিশেষ করে খসরুর হত্যার পর নূরজাহানের বিরুদ্ধে বিষকুম্ভ যেন ভরে উঠেছিল। এর ওপর যখন নূরজাহানের চক্রান্তে শাহ্‌জাহানের আসনে শাহ্‌রিয়রকে বসানো হল, তখন বিষ আর কুম্ভের মধ্যে রইল না, চারদিকে গড়িয়ে পড়ল।

শাহ্‌জাহান বিদ্রোহী হলেন, বিদ্রোহী হল একদা-বিশ্বস্ত অনুগত সৈন্যাধ্যক্ষদের এক বিরাট অংশ। এই বিরোধিতা সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে নয়, সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের বিরুদ্ধে। নারীর শাসনে সম্রাট অন্ধ হতে পারেন, তাঁরা নন। সুতরাং সশস্ত্র প্রতিবাদ তো আসবেই!

ওদিকে নূরজাহান শাহ্‌জাহানকে বিদ্রোহী হিসাবেই দেখতে চেয়েছিলেন। নইলে তাঁর এত চক্রান্ত, শাহ্‌জাহানকে এত খোঁচাখুঁচি করার তো কোন দরকার ছিল না। বিনা কারণে শাহ্‌জাহানকে সরানো যাবে না, কিন্তু বিদ্রোহী শাহ্‌জাহানকে সরানোর জন্য নূর-জাহান যতই কেন না শক্তির প্রয়োগ করুন, কেউ কিছু বলবে না—এতে কেউ কোন দোষ দেখবে না!

স্বামীর মৃত্যুর পর সিংহাসনে শাহ্‌জাহানকে কিছুতেই বসতে দেওয়া চলবে না, সেখানে বসবেন শাহ্‌রিয়র। শাহ্‌রিয়র বসলে তবেই না সিংহাসনের আড়াল থেকে সবাই আবার দৈববাণী শুনবে! শিরোধার্য করবে দৈববাণীর আদেশ!

আমরণ শক্তির উপাসিকা নূরজাহান। তাঁকে তাঁর অধিকার থেকে একচুল কেউ নড়াতে পারবেন না।

আক্রমণোদ্যত শাহ্‌জাহানের অগ্রগতিকে বাধা দেওয়ার জন্য নূরজাহানও তৈরি ছিলেন। বিরাট এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবার জন্য তিনি দৃঢ়তা সঞ্চয় করলেন। এই ব্যাপারেই এস্‌পার ওস্‌পার যা হয় একটা কিছু হবে!

কান্দাহার এখন থাক, এখন শুধু শাহ্‌জাহান।

নূরজাহান রুখে দাঁড়ালেন।

বাঁধভাঙা জলের মতো এগিয়ে আসতে লাগলেন শাহ্‌জাহান, এসে থামলেন ফতেপুর সিক্রীর বুলহন্দ দরোজায়—সে দরোজা বন্ধ। শাহ্‌জাহানের পক্ষে অসম্ভব হল ফতেপুর সিক্রীতে কোন সুবিধে করা। তিনি অবশ্য দমলেন না, দমলেন না তাঁর বিশ্বস্ত অকুতোভয় সেনাপতি রাজা বিক্রমজিৎ। তিনি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে আক্রমণ করলেন আগ্রা শহর। বড় বড় জায়গীরওয়ালা জমিদারদের কাবু করে তাঁদের যাবতীয় টাকাপয়সা লুঠ করে নিলেন। একা লস্কর খাঁয়ের কাছ থেকেই পাওয়া গেল নগদ ন'লক্ষ টাকা।

শাহ্‌জাহান আরও এগিয়ে গেলেন। অবশেষে পৌঁছলেন বিলোচপুরে—দিল্লীর কাছাকাছি একটি জায়গায়। শাহ্‌জাহান ঠিক করলেন, সম্রাটের বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি নয়, যে 'গেরিলা' নীতিতে মুঘল বাহিনী দক্ষিণীদের হাতে তছনছ হয়েছিল, বিপদসমুদ্রে হাবুডুবু খেয়েছিল, সেই ধরনের যুদ্ধ এখানে চালাবেন। সরবরাহের পথ বন্ধ করে দেবেন, আড়াল থেকে আচমকা আঘাত হানবেন। সম্রাটের বাহিনী পালাবার পথ পাবে না।

কিছুদিন কেটে যাওয়ার পরেই শাহ্‌জাহান বুঝলেন, পাহাড়-পর্বত, নদী-জলপ্রপাতে ঘেরা শুধু দক্ষিণ ভারতেই ঐ যুদ্ধের লুকোচুরি

চলে, উত্তর ভারতের উদার প্রান্তরে ঐ চোরাগোপ্তা আক্রমণ চলতে পারে না।

না চলুক, শাহ্‌জাহানকে তবু দাঁড়াতেই হবে।

ওদিকে নূরজাহান পাঠিয়েছেন মহাবৎ খাঁ ও অন্যান্য দুর্ধর্ষ সেনাপতিদের অধীনে এক দুর্দান্ত সেনাবাহিনী।

নূরজাহান আসফ খাঁকেও এই সুযোগে ছাড়লেন না। চোখের কোণ দিয়ে এক পলক তাকিয়ে হুকুম দিলেন, 'তুমিও বেরিয়ে পড়। যত বড় আপনার জনই হোক না কেন, সে যখন সম্রাটের শত্রু তখন তোমারও শত্রু।'

আসফ খাঁ—অত্যন্ত চতুর আসফ খাঁ আপত্তি করেন নি, বীরবিক্রমে আট হাজার সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ওদিকে সেনাপতি খাজা আবুল হাসানের অধীনেও ছিল আট হাজার সৈন্য, আর দশহাজার সৈন্য নিয়ে এগিয়ে এলেন আবদুল্লা খাঁ—মোট ছাব্বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে এল সম্রাটের দল।

আবদুল্লা খাঁ ছিলেন সর্বাধিনায়ক। তিনি সবার আগে এগিয়ে গেলেন, অথচ নূরজাহানের বিরুদ্ধে সবচাইতে বেশী বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা করলেন তিনি। ভাগ্যক্রমে নূরজাহান বিশ্বাসঘাতক শত্রুর এই ফাঁদ এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

যাই হোক ১৬২৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে বিলোচপুরে দুই পক্ষে যুদ্ধ হল, যুদ্ধে শাহ্‌জাহানের ডান হাত বিক্রমজিৎ মারা গেলেন। বিলোচপুরের যুদ্ধে শাহ্‌জাহানের পরাজয় হল। বিক্রমজিতের মাথাটি কেটে শুধু ধড়টি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জাহাঙ্গীরের সামনে। জাহাঙ্গীর শত্রুর এই বীভৎস কবন্ধরূপ দেখে উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন; অধীনস্থ সেনাপতিদের মধ্যে হরির লুঠের বাতাসার মতো সম্মান, খেতাব আর খেলাত বিলিয়েছিলেন।

কিন্তু শাহ্‌জাহানের শত্রুতা তো বিলোচপুরেই শেষ নয়। তাই তাঁকে একেবারে কাবু করতে হলে তাঁর পিছু ধাওয়া করতে হবে।

ওদিকে আবদুল্লা খাঁ যে খেল্ দেখালেন তাতে তো আসফ খাঁ এবং আরও কয়েকজন সেনাপতি সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখাই দায়। নতুন করে আক্রমণ শুরু করার আগে পুত্র পরভেজের জন্য কয়েকদিন অপেক্ষা করা হল। বিহার থেকে যত সংখ্যক সম্ভব সৈন্য নিয়ে তিনি শীগ্‌গিরই আসছেন। তিনি এলেই শাহ্‌জাহানের পেছনে পেছনে তাড়া করে এগিয়ে যাবে মুঘল সৈন্যবাহিনী।

কয়েকদিনের মধ্যে পরভেজ এসে গেলেন। ইচ্ছে করেই তিনি কিছু দিন দেরি করেছিলেন। পিতা ও বিমাতার প্রয়োজন যখন সঙিন হয়ে উঠবে, তখনই তিনি এসে উপস্থিত হবেন, সম্রাট পিতাকে শক্তি যোগাবেন, পুত্রদের মধ্যে তিনিও যে কম প্রয়োজনীয় নন, এটাই পিতাকে বোঝাবেন—এ রকম একটা প্ল্যান তিনি আগের থেকেই করে রেখেছিলেন। কেমন করে জানি পরভেজের মাথায় একটুখানি রাজনৈতিক বুদ্ধি খেলে গিয়েছিল!

পরভেজ আর তাঁর সৈন্যসামন্তকে দেখে জাহাঙ্গীর আর নূরজাহান মহাখুশি। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা পরভেজের এক বিরাট সংবর্ধনা সভার আয়োজন করলেন।

দক্ষিণে যাওয়ার আগে শাহ্‌জাহানকে যেমন যেমন সম্মান, পদমর্যাদা, খেলাত ও জড়োয়া-অস্ত্র, পোশাক, হাতীঘোড়া ইত্যাদি দেওয়া হয়েছিল, ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি করা হল পরভেজের সংবর্ধনা সভায়। পরভেজ তো খুশীতে টইটম্বুর। আহ্লাদে আবার আটখানা হলেন, জাহাঙ্গীর যখন তাঁকে শাহ্‌জাহানের ওপরে স্থান দিলেন, তাঁর সৈন্যসংখ্যা শাহ্‌জাহানের অধীন সৈন্যসংখ্যার চাইতে অনেক বেশি হল। পরভেজ হলেন শাহ্‌জাহানকে শায়েস্তা করার জন্য তাঁর বিরোধী দলের অধিনায়ক। অবশ্য মহাবৎ খাঁকে টিপে দেওয়া হয়েছিল—পরভেজ শুধু নামে, আসল কাজে মহাবৎ। যুদ্ধ-কৌশলে মহাবতের সমান দক্ষতা ক'জনের আছে?

ওদিকে খসরুর ছেলে দাওয়ার বক্স বা বুলাকীর ওপর ভার

পড়ল গুজরাট উদ্ধারের। সঙ্গে রইলেন আজিজ কোকা। জাহাঙ্গীর নিজে সদলবলে গিয়ে বসলেন আজমীরে।

এই ফাঁকে শাহ্জাহানও মাণ্ডুতে ফিরে এসে কম সাজগোজ করেন নি। হাতী রে, ঘোড়া রে, বন্দুক-কামান, সৈন্য-সামন্ত, লোক-লস্কর,—সে এক এলাহি ব্যাপার!

দেখা যাক বাপ হারেন, কি ছেলে হারে।

শাহ্জাহান খবর পেলেন, মহাবৎ আর পরভেজ এগিয়ে আসছেন। শাহ্জাহানও এগিয়ে গেলেন, আরও আগে গেলেন, সেনাপতি যদুরায় ও উদয়রাম; সঙ্গে একদল মারাঠি অশ্বারোহী। শাহ্জাহান উত্তরের বাহিনীকে দক্ষিণে 'গেরিলা' যুদ্ধ দিয়ে আটকাতে চাইলেন—ঠিক যেমনটি মালিক অম্বর করেছিলেন।

কিন্তু এই 'গেরিলা' নীতিতে শাহ্জাহান যে যে প্যাঁচ দিতে লাগলেন, মহাবৎ খাঁ উল্টো প্যাঁচ দিয়ে তার প্রত্যেকটা কাটিয়ে দিলেন। তাঁর সব চাইতে প্রাণঘাতী প্যাঁচ ছিল ভুজুংভাজুং দিয়ে ও-দল থেকে লোক ভাঙিয়ে নিজের দলে নিয়ে আসা। মহাবতের কৌশলে শাহ্জাহানের দল ছেড়ে চলে গেলেন সেনাপতি রুস্তম খাঁ আর বরকন্দাজ খাঁ—শাহ্জাহানের বুকের দুটি পাঁজর। এঁরা তো গেলেনই, এঁদের পেছনটানে আরও কিছু ওদিকে চলে গেল। সবচাইতে মারাত্মক ব্যাপার—শাহ্জাহানের হাতে একখানা চিঠি পড়ল, যার মধ্যে একেবারে স্পষ্ট লেখা রয়েছে, খানখানা আর তাঁর ছেলেরাও মহাবতের দলে চলে যাচ্ছেন।

'কী আশ্চর্য, আমি বেঁচে আছি তো!' সত্যিই কাণ্ডকারখানা দেখে শুনে শাহ্জাহান নিজেকেই যেন আর বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। যে ক'জনকে পারলেন, যাকে যাকে সন্দেহ হল তাদের সবাইকে গারদে পুরলেন বটে, কিন্তু অশান্তি আর দুশ্চিন্তায়

মন ভরে রইল। কারণ অন্যদিকে মহাবতের সঙ্গে তো কিছুতেই পেরে উঠছিলেন না।

শাহ্‌জাহান এবার নর্মদা পার হয়ে খান্দেশের দুর্ভেদ্য দুর্গ অসিরগড়ের দিকে ছুটলেন।

বিলোচপুরের যুদ্ধের পর শাহ্‌জাহান যে অসিরগড়ে গিয়ে হাঁপ ছাড়তে চাইবেন, এটা নূরজাহান আগেই বুঝেছিলেন। তাই যুদ্ধের পরেই তিনি তাঁর ভাইঝি-জামাই, দুর্গের অধ্যক্ষ মীর হাসামুদ্দিনকে চিঠি লিখেছিলেন, 'সাবধান, খুব সাবধান। আর যাই কর, যে 'বেদৌলত', যে অতি হতভাগা, তাকে বা তার লোকজনকে খবরদার দুর্গের ধারে কাছেও আসতে দিও না······'

হাসামুদ্দিন দুর্গকে সুরক্ষিত করে রাখলেন বটে, কিন্তু যাঁহাতক শাহ্‌জাহান দুর্গের দরজায় গিয়ে হাজির হলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাসামুদ্দিন দুর্গের দরজা খুলে দিলেন, শাহ্‌জাহান সগৌরবে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলেন। শুধু প্রবেশ করলেন না, হাসামুদ্দিনকে চারহাজারী মনসবদার করে তাঁকে আবার মুর্‌তজা খাঁ—এই উপাধিতে বিভূষিত করলেন।

শাহ্‌জাহান অসিরগড়ের মতো একটা দুর্ভেদ্য জায়গায় আশ্রয় পেয়ে যেন বেঁচে গেলেন। তিনি তো শুধু একা নন, গোটা পরিবার, আর সেই অনুপাতে জিনিসপত্র। কিন্তু অসিরগড়েও বেশী দিন থাকতে পারলেন না। বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র আর মহাবতের পিছু ধাওয়ার ফলে শাহ্‌জাহান তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গুটিয়ে তাপ্তী নদী পার হয়ে চলে এলেন গোলকুণ্ডায়—সেখান থেকে পূবমুখো যাত্রা করে একেবারে উড়িষ্যায়। মাঝে একবার মালিক অম্বরকে যাচাই করে দেখেছিলেন সেখানে কোন সুবিধে হয় কি না। সেখানে ব্যর্থ হয়ে শাহ্‌জাহানের দূত গেল বিজাপুরে। সেখানে আদিলশাহ্‌ শাহ্‌জাহানের দূতকে এমন বকুনি বকে দিলেন যে, সে বেচারী ফিরে আসবার পথ পায় না।

উড়িষ্যায় যে সব রাজকর্মচারী ছিলেন, তাঁরা হঠাৎ শাহ্‌জাহানের আবির্ভাবে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন—ছুটে পালালেন বাংলাদেশে। সেখানে তখন ছিলেন নূরজাহানের ভাই ইব্রাহিম খাঁ। শাহ্‌জাহান হুগলীর পর্তুগীজদের কাছেও একবার আবেদন করে পাঠালেন—বড় বিপদ, তারা যদি একটু সাহায্য করে তো ভবিষ্যৎ সম্রাটের প্রাণটুকু বাঁচে। কিন্তু পর্তুগীজরা এ কথায় কানই পাতল না। তবে কিছু ফল হয়েছিল, কিছু কিছু জায়গীরদার, কিছু রাজকর্মচারীরা শাহ্‌জাহানের দলে যোগ দিয়েছিলেন। ইব্রাহিম খাঁ তাড়াতাড়ি গিয়ে রাজমহলে উপস্থিত হলেন। এটি গেলে আর দেখতে হবে না—গোটা বাংলাদেশ উড়ে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে বিপদে পড়বে উড়িষ্যা আর বিহার।

ইব্রাহিম খাঁ প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন রাজমহল রক্ষা করার, কিন্তু পারলেন না। শাহ্‌জাহানের বাহিনীর সঙ্গে মুঘল সৈন্যের যে সংঘর্ষ হল তাতে তিনি পরাজিত ও নিহত হলেন। অন্যদিকে আবদুল্লা খাঁ আর রাজা ভীম—দুজনেই শাহ্‌জাহানের বশংবদ—বর্ধমান ও পাটনা নিয়ে নিলেন। অনেকেই সম্রাটের পক্ষ ছেড়ে আবার শাহ্‌জাহানের পক্ষ নিল। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা—মোটামুটিভাবে শাহ্‌জাহানের হাতে এসে গেল। শাহ্‌জাহান এবার চেষ্টা করলেন এলাহাবাদ আর অযোধ্যা নিয়ে নিতে। এ দুটি হলেই তাঁর এ দিকটা বেশ একটা শক্ত ঘাঁটি তৈরি হ । কিছুদিন ঝড় ঝাপটার পর শাহ্‌জাহানের মন খুশি খুশি হয়ে উঠল।

ঐ হাসিখুশি মনেই তিনি আবদুল্লা খাঁ আর রাজা ভীমকে এক নৌবহর দিয়ে পাঠালেন এলাহাবাদের দিকে। আবদুল্লা খাঁ এলাহাবাদ অবরোধ করলেন। ভীম খানিকটা দূরে রইলেন। শাহ্‌জাহান নিজে গিয়ে দখল করলেন জৌনপুর। দরিয়া খাঁ গেলেন অযোধ্যার মানিকপুরে।

এদিকে পরভেজ আর মহাবৎ চুপ করে বসে নেই। তাঁরা যেই

শুনলেন শাহ্জাহান তাপ্তী নদী পার হয়ে একেবারে পূবের মানুষ বনেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও বুরহানপুর ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পথে কী বৃষ্টির তোড়! তবে নদীনালা ডিঙিয়ে তাঁরাও এসে হাজির হলেন এলাহাবাদের কাছে। এলাহাবাদ তখন প্রাণপণে রক্ষা করেছিলেন সম্রাট পক্ষের রুস্তম খাঁ। নূরজাহান হুকুম দিয়ে পাঠালেন —শাহ্জাহানকে ছেড়ে কথা বলো না—হয় জ্যান্ত বন্দী করে, না হয় তাড়িয়ে তাড়িয়ে বেড়াও।

আবদুল্লা খাঁ যখন শুনলেন, দক্ষিণের শত্রুরা এসে পড়েছে, তাদের সৈন্য ও অস্ত্রসংখ্যা ভয়াবহ রকমের বেশী, তখন আর তিনি এলাহাবাদে থাকা বিবেচনা বোধ করলেন না, ঠিক করলেন তাড়াতাড়ি অবরোধ উঠিয়ে চলে যাবেন।

ওদিকে শত্রুসৈন্য যাতে সহজে কাছে না আসতে পারে, সে জন্য শাহ্জাহানের লোক আগের থেকেই প্রায় সব কটি নৌকা আটকে ফেলেছিল, নদীর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল।

মহাবৎ খাঁ ব্যাপার দেখে আবার তাঁর পুরোনো কৌশল প্রয়োগ করলেন, শত্রুর দলের লোক ভাঙাতে লাগলেন। প্রথম স্থানীয় জমিদারদের বশ করে তাঁদের কাছ থেকে খান ত্রিশেক নৌকা বাগালেন, তারপর দৃষ্টি ফেললেন খাস শত্রুর নৌবহরের দিকে। শাহ্জাহানের নৌ-অধ্যক্ষ নৌবাহিনীর মধ্যে একে তো বিশ্বস্তার খুব একটা বন্ধন ছিল না, তার ওপর মহাবৎ খাঁর কৌশল তাদের মধ্যে এমন এক ভাঙন ধরিয়ে দিল যে, গোটা নৌবহরটাই এলাহাবাদ ছেড়ে দিয়ে চলে এল বাংলাদেশে! যারা এলাহাবাদের দুর্গ অবরোধ করে রইল, তারা কি খাবে, কি পরবে, সে দিকে তারা কোন চিন্তাই করল না। শাহ্জাহান অকূল সমুদ্রে পড়লেন। সরবরাহের পথ একেবারে বন্ধ, দলের লোকগুলো হাওয়া। কী আশ্চর্য, মানুষের মধ্যে এত বিশ্বাসঘাতকতাও থাকতে পারে!

চিন্তা করে আর লাভ কি? শাহ্জাহান বুক বেঁধে দাঁড়ালেন।

যুদ্ধ করতেই হবে। এক ফাঁকে সেনাপাত দারিয়া খা তার নৈন্যসামন্ত নিয়ে হাজির হলেন। শাহ্জাহান আর দরিয়া খাঁয়ের সৈন্য মিলে হল দশ হাজার। অপর পক্ষে তাকিয়ে তো চক্ষু স্থির! সম্রাটপক্ষে সৈন্যসংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। অর্থাৎ শাহ্জাহানের প্রতি একজন সৈন্যের মাথাপিছু ছিল সম্রাটপক্ষের চার-চার জন সৈন্য।

তা হোক। শাহ্জাহান যুদ্ধ চালালেন। রাজা ভীম সামরিক কায়দায় নিপুণ ছিলেন। তাঁর সাহায্যে শাহ্জাহান উৎসাহিত হলেন। ওদিকে আবদুল্লা খাঁ সমানে বোঝাতে লাগলেন—যাতে শাহ্জাহান কিছুতেই সামনা-সামনি যুদ্ধ না করেন। তিনি শাহ্জাহানকে পরামর্শ দিলেন, হয় অযোধ্যার ভেতর দিয়ে দিল্লীতে চলে যান, না হয় সোজা দক্ষিণে ফিরে যান……

ভীম কিন্তু এ নীতির একেবারে বিরুদ্ধে গেলেন। শাহ্জাহানও চাইলেন না, কাপুরুষের মতো যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে দিল্লীতে কিংবা, দক্ষিণে ফিরে যেতে।

শাহ্জাহান তাড়াতাড়ি কামান বন্দুক দিয়ে সৈন্য সাজিয়ে ফেললেন। কিন্তু আর কিছু বন্দোবস্ত করার আগেই সম্রাটের সৈন্যবাহিনী তিনদিক থেকে শাহ্জাহানকে ঘিরে ধরল, বৃষ্টির ধারার মতো গুলি আর তীব্র বর্ষণ হতে লাগল। রাজা ভীম অদম্য সাহসের সঙ্গে এর জবাব দিতে লাগলেন, সামনে রক্তগঙ্গা বয়ে গেল, আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হল নিজের শরীর তবু চোখের সামনে পৃথিবীর সবটুকু আলো নিভে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অস্ত্র হাতে প্রতিপক্ষকে আঘাত হানলেন, তারপর ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়লেন।

রাজা ভীমের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শাহ্জাহানের বাহিনী টুকরো টুকরো হয়ে গেল। যুদ্ধক্ষেত্রের শৃঙ্খলা ভুলে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। শাহ্জাহান কোনরকমে প্রাণে বেঁচে একটি আহত ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন।

মহাবৎ খাঁ যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করলেন।

শাহ্জাহান প্রথমে গেলেন রোটাসে। সেখানে তখন জন্ম হয়েছিল সবচেয়ে ছোট ছেলে মুরাদের। স্ত্রী মমতাজ ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল ও অশক্ত।

শাহ্জাহান রোটাসে মাত্র তিন দিন রইলেন। চার দিনের দিনই তিনি সেখান থেকে রওনা দিলেন। আবদুল্লা খাঁয়ের তত্ত্বাবধানে মমতাজ আর ছেলেরা রোটাসেই রইলেন। শাহ্জাহান রওনা হবার আগে তাঁর নিজের লোক বাংলাদেশের গভর্নর দরাপ খাঁকে চিঠি লিখে পাঠালেন, তিনি যেন সৈন্যসামন্ত লোকলস্কর নিয়ে শীগগির ঘুরি বলে একটা জায়গায় তাঁর সঙ্গে যোগ দেন।

দরাপ খাঁ ছিলেন খানখানার ছেলে। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শাহ্জাহান একবার বাপ-ছেলেকে গারদে পুরেছিলেন বটে, তারপর অবস্থা বুঝে দরাপ খাঁয়ের স্ত্রী-ছেলে-ভাইপোকে জামিন রেখে ওঁদের মুক্তি দিয়ে আবার কাজের ভার দিয়েছিলেন।

দরাপ খাঁ চিঠি পেয়ে মুখ বাঁকিয়ে হাসলেন। নিজের মনে বিড়বিড় করে বললেন, 'ভাঙবেন, তবু মচ্‌কাবেন না···মুরোদ কত সে তো বোঝাই যাচ্ছে। শুধ্ এখান থেকে ওখানে ছোট, ওখান থেকে এখানে এস। আমার ঘাড়ে শয়তান চাপে নি যে, বাংলাদেশের আরামের গদি ছেড়ে তোমার সঙ্গে ছেঁড়া কাপড়ের মতো ফরফর করে কেবল উড়তেই থাকব······'

দরাপ খাঁ উত্তর দিলেন—'এখান থেকে কি আমার এক পা নড়বার উপায় রেখেছে এখানকার হতভাগা জমিদারগুলো? আমাকে আটকে—বলতে গেলে প্রায় বন্দী করে রেখেছে না! এরা তো সমানে আমাকে আপনাকে চোখ রাঙিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় আপনিই বলুন না কেন, যাওয়া কি সম্ভব?'

শাহ্জাহান সবই বুঝলেন, তবে দরাপ খাঁয়ের বিশ্বাসঘাতকতা এবার আর তেমন আঘাত দিল না। মনুষ্য চরিত্রের যে খেলা তিনি

এই কাজে নামার পর থেকে দেখতে পাচ্ছেন! কী বেইমান বেআদব লোকগুলো! ঠিক আছে। আমারও একদিন সময় আসবে। সেদিন সব কটাকে দেখে নেব······

দরাপ খাঁয়ের দলত্যাগে কিন্তু শাহ্‌জাহানের বেশ খানিকটা অসুবিধে হয়ে গেল। পুব দিক থেকে আবার নোতুন উদ্যমে জেগে ওঠার আশা একেবারে ডুবে গেল। শাহ্‌জাহান বুঝলেন, আর এখানে নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে—আবার দক্ষিণে। তার আগে গেলেন, রাজমহলে, সেখানে কিছু জিনিসপত্র পড়েছিল, সেগুলি গুছিয়ে নিয়ে চলে এলেন দক্ষিণে।

এই ফাঁকে দক্ষিণের আবহাওয়া গরম হয়ে উঠেছিল। বিজাপুরের আদিল শাহ্ আর আহ্‌মদ নগরের মালিক অম্বর দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে দূর থেকে সমানে ঘুষি বাগাচ্ছিলেন, আর দুজনে একই সময়ে ভাবছিলেন—এই সময় যদি মুঘলদের একটু সাহায্য পাওয়া যেত! দুজনেই লোক পাঠিয়েছিলেন মহাবতের কাছে। মহাবতের কূটকচালি বুদ্ধির অভাব ছিল না। তিনি প্রথমে দুপক্ষকেই তা' দিয়ে দিয়ে গরম রাখবার চেষ্টা করলেন। কারণ তিনি জানতেন, যে-কোন এক পক্ষে যোগ দিলেই অপর পক্ষ শাহ্‌জাহানের দল নেবে। শাহ্‌জাহান যখন গোলকুণ্ডায় পালিয়ে গেলেন, সেখান থেকে আবার বাংলায়—তখন নিশ্চিন্ত হয়ে মহাবৎ খাঁ বিজাপুরের সঙ্গে হাত মেল'লেন, মালিক অম্বরকে চ্যালেঞ্জ করলেন। মালিক অম্বর এই দুই শত্রুর মৈত্রীতে আশঙ্কিত হলেন। পরিবার পরিজনদের দৌলতাবাদ দুর্গে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে চলে গেলেন একেবারে গোলকুণ্ডার সীমানায়। এমন ভাব দেখালেন যেন তিনি কিছুতেই তৈরি হতে পারছেন না তৈরি হবার কোন সম্বলও তাঁর নেই। এদিকে মহাবৎ খাঁ তাঁর দলবল নিয়ে প্রস্তুত হলেন, বিজাপুরও তাই। মালিক অম্বর যে এবার সরাসরি মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়বেন, এতে আর কারও কোন সন্দেহ থাকল না। কিন্তু হায় রে অদৃষ্ট,

কোথা থেকে ম্যাজিকের মতো কি যেন একটা হয়ে গেল। মালিক অম্বর ঝড়ো হাওয়ার মতো বিদরে বিজাপুরের সৈন্যদের একেবারে ধরাশায়ী করলেন। সুলতান আদিল শাহ্ প্রাণের ভয়ে বিজাপুর দুর্গে আশ্রয় নিলেন, মালিক অম্বর সেই দুর্গ অবরোধ করে সুলতানকে আটকে ফেললেন, ভাতুড়ির যুদ্ধে বিজাপুর সৈন্যদের আর একবার মাথা ঘুরিয়ে দিলেন।

ঠিক এমনি সময় শাহ্জাহান উড়িষ্যা, তেলিঙ্গানা পার হয়ে হাজির হলেন নিজাম-উল্-মুল্‌কের রাজ্যে, আর বলা বাহুল্য মালিক অম্বর দুহাত বাড়িয়ে তাঁকে আহ্বান জানালেন। শাহ্জাহান সেই আহ্বানে সাড়া দিতে বিন্দুমাত্র দেরি করলেন না। এতদিন শাহ্জাহান আর মালিক অম্বর দুজন দুজনের দিকে ক্ষুধার্ত নেকড়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে এসেছেন। রাজনীতির রসিকতায় তাঁরা এখন হলেন প্রাণের দোস্ত, এক কাজের বন্ধু।

শাহ্জাহান যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করলেন বুরহানপুর। আক্রমণের তোড় সামলানো সেদিন বুরহানপুরের কর্মকর্তাদের অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে উপস্থিত হলেন পরভেজ ও মহাবৎ খাঁ, সঙ্গে অগণিত দুর্ধর্ষ সেনা ও সেনাপতি।

ব্যাপার বুঝে শাহজাহান চলে গেলেন বালাঘাটের রোহানপুরে, আর সেখানে গিয়েই তিনি সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়লেন, আর সেই মুহূর্তেই প্রধান সহায় আবদুল্লা খাঁ—যিনি সম্রাটের পক্ষ ছেড়ে এ দলে চলে এসেছিলেন, হঠাৎ সংসারধর্ম ছেড়ে দিয়ে ইন্দোরে চলে গেলেন, সেখানে সাধন-ভজনে মেতে উঠে একেবারে ফকির বনে গেলেন। তার আগে, একদা দলত্যাগ করে আসার জন্য অনুতাপ ও দুঃখ করে সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে খানকয়েক চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলেন।

আবদুল্লা খাঁ তো নোতুন সাধনায় মেতে উঠলেন। ওদিকে সম্রাটের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করার জন্য শাহ্জাহানের এতদিনের সাধনা কিন্তু

বানচাল হবার যোগাড় হল। অবশ্য সম্রাটের সেনাবাহিনীর সংখ্যা ও দুর্ধর্ষতা দিন দিনই বেড়ে চলছিল, উপরন্তু দক্ষিণের বিজাপুর, গোলকুণ্ডা সবই ছিল ওদের হাতে। কেবল বিহারের রোটাস আর খান্দেশের অসিরগড় ছিল তাঁর হাতে। কোথাও স্বস্তিতে এতটুকু বিশ্রাম করার সুযোগ শাহ্জাহানের ছিল না। সেনাপতিদের মধ্যে কেউ যুদ্ধে ফৌত হয়েছে, কেউ অপর পক্ষে যোগ দিয়েছে। সর্বোপরি রোগের আক্রমণে শাহ্জাহান বুঝলেন, এই মুহূর্তে আর কিছু করা অসম্ভব—জয়-পরাজয়, মরণ-বাঁচন—যাই হোক না কেন।

জয় না হোক, বাঁচতে হবেই।

শাহ্জাহান জাহাঙ্গীরকে চিঠি লিখলেন, আমার সব কাজের জন্য আমি দুঃখিত, অনুতপ্ত—সম্রাট আমাকে ক্ষমা করুন……

ক্ষমা জাহাঙ্গীর করবেন না, করবেন নূরজাহান। নূরজাহান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চিঠিখানা পড়লেন, অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন, গভীর ভাবে চিন্তা করলেন। চিন্তা ভাবনা তো শাহ্জাহানের চিঠিখানা পাওয়ার পরে করছেন না, কিছু দিন আগের থেকেই নূরজাহানের রাতের ঘুম দিনের বিশ্রাম চলে গেছে। চলে তো যাবেই। একটা বিরাট সন্দেহ যে মনের মধ্যে কেঁচোর মতো কিলবিল করছে—কদিন ধরেই করছে। মহাবৎ খাঁ আর পরভেজের বন্ধুত্বটা যেন বড় বেশী গাঢ় হয়ে উঠেছে! ওঁরা যেন একটু বেশী মেতে উঠেছেন দক্ষিণের ব্যাপার নিয়ে! জয়ের উল্লাসের ওপরে আবার বাড়তি কেন উল্লাস ওঁদের মনে বাসা বাঁধছে না তো? দক্ষিণী অভিযানের সুযোগে আজ তাঁদের শক্তি সামর্থ্যের তো কোন সীমা নেই।

নূরজাহানের চোখের সামনে যেন একটা কালো পর্দা ঝুলতে লাগল। আর দেরি করা নয়—যা-হোক করে পাশা উল্টোতে হবে।

নূরজাহান শাহ্জাহানকে চিঠির উত্তর দিলেন—দৃঢ় ভাষায় সংযত চিঠি। মনের সন্দেহ-উত্তাপের কোন চিহ্নই তাতে ছিল না……।

আগ্রহের সঙ্গে শাহ্জাহান চিঠিখানা পড়লেন……ক্ষমা নিশ্চয় করা হবে। কিন্তু তার আগে রোটাস ও অসিরগড় ছেড়ে দিতে হবে, আর পাঠাতে হবে পুত্র দারাশিকো ও আওরঙ্গজেবকে। তারা এখন থেকে জাহাঙ্গীর-নূরজাহানের কাছেই থাকবে ……।

শাহ্জাহান আর কিছু ভাবলেন না, চিঠির দুটি প্রস্তাবই তিনি মাথা পেতে নিলেন। এখন আর কিছু নয়, এখন মাথা নিচু করে শুধু শুনে যাওয়া।

শাহ্জাহান সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠালেন, অসিরগড় ও রোটাসে। সেখানে আর যেন তাঁর নিজের লোক না থাকে, ও দুটোই তুলে দেওয়া হোক সম্রাটের হাতে।

শাহ্জাহান এর পরে তাকালেন দারাশিকো আর আওরঙ্গজেবের দিকে। একটির সবে দশ বছর পূর্ণ হয়েছে, অন্যটির আট চলছে। কচিমুখে মুঘল রাজবংশের সম্ভ্রম। তবু……

শাহ্জাহান আর দেরি করলেন না, সম্রাট-পিতাকে উপহার দেবার জন্যে প্রায় দশ লাখ টাকার জিনিসপত্র দিয়ে দারাশিকো আর আওরঙ্গজেবকে লাহোরে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। শাহ্জাহান আর বাকি সবাইকে নিয়ে নাসিকে চলে যাবেন বলে স্থির করলেন। প্রচুর অর্থ আর বিরাট সামর্থ্যের জলাঞ্জলি দিয়ে ভাগফলের কোঠায় শূন্য বসিয়ে অবশেষে শাহ্জাহান দক্ষিণের পর্ব শেষ করলেন।

আর ঠিক এমনি সময়ে উত্তরের একটা খবরে শাহ্জাহান ভীষণ চমকে উঠলেন।

-

জাহাঙ্গীর আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন, নূরজাহান আরও ব্যস্ত হলেন। কিছুদিন ধরে যে সন্দেহটা মনের মধ্যে কিলবিল করছিল, সেটা এখন হিলহিলিয়ে উঠল। মহাবৎ খাঁ আর পরভেজের এত গলাগলি নূরজাহানের মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না। খসরু নেই,

শাহ্জাহান মুখ লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন, তবু নূরজাহান চিন্তায় ঝড়ে নাজেহাল হয়ে গেলেন।

জাহাঙ্গীরের কাছে ওপারের ডাক এসে গেছে। সবাই বুঝতে পারছে সম্রাটের মেয়াদ আর বেশীদিন নয়। কিন্তু নূরজাহান? কে বলবে পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই! আটচল্লিশ পার হয়ে যাচ্ছেন, তবু সতেজ সটান চামড়ায় এতটুকু জরা আসে নি, পদ্মমুখে প্রবীণতার এতটুকু কলঙ্ক রেখা ফোটে নি। চলনে বলনে আসে নি এতটুকু স্থবিরতা, দীপ্তিময় চোখদুটি ঢেকে যায় নি কালের ম্লান ছায়ায়।

বেগম নূরজাহান সর্বকালের উর্বশী—Eternal she.

একা নূরজাহান হাজারটি হয়ে প্রতিফলিত হন শিস্‌মহলের দেওয়ালের অসংখ্য টুক্‌রো-আয়নায়। বুদ্ধিমতী নূরজাহান বুঝতে পারেন, এই পৃথিবীতে সুদীর্ঘজীবনের আশীর্বাদ নিয়েই তিনি জন্মেছেন, তাঁর ঐ নিখাদ সৌন্দর্যে, অটুট স্বাস্থ্যে মৃত্যুর আহ্বান আসবে অনেক পরে, সম্রাট চলে যাওয়ার অনেক বছর বাদে। সে ক'টি বছর তো নূরজাহানকে বাঁচতে হবে মহীয়সী হয়ে, শক্তিময়ী হয়ে······তা হলে? সেই জন্যই তো সন্দেহটা মনের মধ্যে অমন করে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ওপর দিকে ভেসে ওঠার চেষ্টা করছে।

মহাবৎ আর পরভেজ—দুটো যেন নাম নয়, গন্‌গনে লাল দুটো গরম শিক—যেখানে লাগছে ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে।

পরভেজ এতদিন ছিলেন নির্বিকার নিশ্চিন্ত। তিনি জানতেন খসরু-খুররমের সঙ্গে তিনি পারবেন না। তাই এতদিন তিনি সামনে আসেন নি, কোন কিছু চেষ্টা করেন নি। বোধ করি খুব বড় রকমের কিছু একটা স্বপ্নও দেখেন নি। বাপের সিংহাসন এতদিন পর্যন্ত তো কত দূরে কত অস্পষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পরভেজ তখন নেশা করতেই ব্যস্ত ছিলেন, সিংহাসন কতদূরে খতিয়ে দেখবার তো সুযোগ হয় নি।

কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল, পাশা উল্টে ভাগ্য পরভেজকে টেনে নিয়ে এল একেবারে সিংহাসনের কাছে। এক পাশে দাঁড়িয়ে

পরভেজ দেখলেন, সিংহাসনের আর এক পাশে অপেক্ষা করছে শাহ্রিয়র। পেছনে রয়েছেন ইঙ্গিতময়ী নূরজাহান।

পরভেজের মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। ঐ শাহ্রিয়র; 'ন-সুদনী' শাহ্রিয়র! কেবল ফ্যালফ্যাল করে বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। নূরজাহানের চেষ্টার ত্রুটি নেই। তাই বুঝি এর পরে সেই হবে রাজা। মুঘল-সিংহাসন বৈধ অধিকারী! আর পরভেজ বুঝি এসেছেন বানের জলে ভেসে? এতদিন তো তিনি চুপ করেই ছিলেন! এতদিন শুধু শাহ্জাহান হৈ-চৈ করেছেন, বীরত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু এখন আর কাকে ভয়?

পরভেজ গজগজ করতে লাগলেন। মদের নেশাটা ছুটে গিয়ে তাঁকে এখন অন্য নেশায় পেয়েছে—সে নেশা আশার নেশা। সিংহাসনের নেশা।

'ঐ সিংহাসন আমার, আমিও কারো চাইতে কম যাই না···' পরভেজ মদের পান পাত্রে চুমুক দিতে দিতে আরও উত্তেজিত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

মহাবৎ এসে পাশে দাঁড়ালেন—'বটেই তো, মুঘল সিংহাসন আপনার নয় তো কার? খসরু যখন মৃত, শাহ্জাহান যখন পরাজিত, তখন আর ভয়টা কাকে? আর সম্রাট তো একবার আপনাকে উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণাই করেছিলেন······'

মহাবৎ খাঁকে সামনে দেখতে পেয়ে, তাঁর কথা শুনে পরভেজ যেন অনেকটা স্বস্তি পেলেন, মহাবৎ খাঁয়ের বন্ধুত্ব যেন স্বর্গের আশীর্বাদ।

'ঐ শাহ্রিয়র বসবে রাজতখ্‌তে, আপনি আবার ফিরে যাবেন বিহারে কিংবা এলাহাবাদে—এ কখনও হয় না, হতে পারে না—' পরভেজের কানের কাছে মহাবৎ যেন ভ্রমর গুঞ্জনের সুর খেলিয়ে যান। পরভেজ পরম আশ্বাসে মহাবৎ খাঁয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তিনি শুধু একা নন, মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিটি মানুষ শ্রদ্ধা আর ভক্তি নিয়ে তাকিয়েছিল মহাবতের দিকে। তাঁর বীরত্ব যুদ্ধ

কৌশলেই তো সম্রাট জাহাঙ্গীরের সিংহাসন রক্ষা পেয়েছিল, সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল। শাহ্‌জাহানের মতো ধারালো অস্ত্রকেও কিছু দিনের জন্য ভোঁতা বনে যেতে হয়েছিল। সেই মহাবৎ খাঁ বন্ধু হয়ে দাঁড়ালেন পরভেজের পাশে।

একদা নূরজাহান-'জুনতার' ঘোর বিরোধী ছিলেন এই মহাবৎ খাঁ! নিজেও ছিলেন 'জুনতা'-পার্টির দুচোখের বালাই, আর এই বিরোধিতার পরোক্ষ ফল হিসেবে বহু দিন পর্যন্ত মহাবৎ ছিলেন রাজদরবারে অবজ্ঞেয় ও একঘরে। এমন এক সময় গেছে যখন তাঁর সর্ব যোগ্যতাকে নূরজাহান ঠেলে একপাশে সরিয়ে রেখেছিলেন, রাজ্যের কোন ব্যাপারে তাঁকে গুরুত্ব দেন নি, দিতে শঙ্কিত হয়েছেন, নিজের শক্তির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আরও সতর্ক হয়েছেন। শাহ্‌জাহানকে দমন করবার জন্য সেই মহাবৎকেই তো ডাকতে হল। নূরজাহান যে নিরুপায় হয়ে মহাবৎকে ডেকেছিলেন। নইলে তিনি কি জানতেন না যে, মহাবতের সাহায্য আহ্বান করা মানে তাঁকে আকাঙ্ক্ষার মগডালে উঠিয়ে দেওয়া!

তার ওপর আবার ঐ পরভেজ। মহাবতের ছায়ায় কিছু দিন থেকে সেও যেন কেমন সাহসী হয়ে উঠেছে। সেও ভাবতে শুরু করেছে যেন কেউকেটা হয়েছে, এখন সিংহাসন নিলেই হয়। সুযোগ পেলে হেলে সাপও তা হলে ফণা তুলতে পারে!

নূরজাহানের মুখে একটু মৃদু হাসি খেলে গিয়ে পরমুহূর্তে আবার মিলিয়ে গেল। কাঁটার বিরুদ্ধে তিনি কাঁটা লাগিয়েছিলেন। একটি কাঁটা নরম হয়েছে, কিন্তু আর একটি কাঁটা যেন নূরজাহানকে বিঁধবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

সত্যিই তাই। মহাবৎ খাঁ এতদিন পরে সুযোগ পেয়ে সত্যিই নূরজাহানকে শিক্ষা দেবার তালে আছেন। শাহ্‌রিয়রকে সামনে রেখে নূরজাহান যেমন পুতুলনাচের দড়ি ধরেছেন, পরভেজকে সামনে নিয়ে মহাবৎও তেমনি পুতুলনাচের দড়ি মাপছেন।

পরভেজের কানে কানে মহাবৎ মন্ত্র আওড়ালেন, কোথায় অকর্মণ্য শাহ্রিয়র, আর কোথায় ব্যক্তি-পরভেজ! সিংহাসনে অধিকার জ্যেষ্ঠের, কনিষ্ঠের নয়।

মহাবৎ খাঁ জানতেন নূরজাহানের পৃষ্ঠপোষকতায় শাহ্রিয়রের সিংহাসনে বসা মানেই নিজের ভাগ্যটি মুড়িয়ে খাওয়া—আবার সেই একপাশে সরে থাকা।

এর যদি উল্টোটা হয়? যদি পরভেজকে সিংহাসনে বসানো যায়? তা হলে তো নূরজাহানের ক্ষমতার চাবিকাঠি আসবে মহাবতের হাতে। এত দিনের অবজ্ঞা অনাদর সুদসুদ্ধ উঠে আসবে! জীবনে মনস্তাপ করার তা হলে আর কিছু থাকবে না।

মহাবৎ ভাবতে শুরু করলেন—সামনে পরভেজ।

নূরজাহান ভাবতে শুরু করলেন—সামনে শাহ্রিয়র।

আর সবার আড়ালে অতি গোপনে ভাবতে শুরু করলেন আসফ খাঁ—সামনে শাহ্জাহান।

অসুস্থ জাহাঙ্গীরের সামনে রইল শুধু দিগন্তবিস্তৃত মহাকাশ—মহাশূন্যে ভরা।

•

নূরজাহান আবার বাধা পেলেন—বাধা দিলেন মহাবৎ খাঁ। বিশালদেহ দৈত্যের মতো মহাবৎ খাঁ নূরজাহানের পথ আটকালেন। এবার আর নূরজাহান-চক্র নয়, এবার নূরজাহান একা। তবু তিনি ভয় পেলেন না, ভয় পেলে চলবে না।

নূরজাহান বুদ্ধির ধারে আবার শাণ দিতে বসলেন। প্রথম কাজ মহাবতের আওতা থেকে পরভেজকে সরিয়ে ফেলা। একাজে আগ্রহ, সাহায্য ও সমর্থন জানালেন আসফ খাঁ। তাঁর মনের তারে মৃদু টুং টাং শব্দে যাঁর নামই বাজুক না কেন, বাইরে কিছু প্রকাশ না করলেই

হল। বিদ্রোহী শাহ্‌জাহানের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে যেতে তিনি কোন আপত্তি দেখিয়েছিলেন কি? কিচ্ছু না। কাজেই এই ব্যাপারেও বোনকে সাহায্য করতে তিনি আগ্রহই দেখিয়েছিলেন, দ্বিরুক্তি করেন নি। তা ছাড়া এই সময়টাতেই তো তাঁকে সবচাইতে বেশী কাজ করতে হবে। সব ক'টি কাঁটা, ঢিল, পাটকেল ঝাঁট দিয়ে ফেলে এখনই তো রাস্তা পরিষ্কার করতে হবে। নইলে আর সময় কোথায়? জাহাঙ্গীরের চোখের সামনে পৃথিবী রঙ যে ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসছে!

পরভেজ আর মহাবৎ খাঁ এই সময় যাত্রা করেছিলেন বুরহানপুরের দিকে, পথে সরংপুরে কয়েক দিনের জন্য থেমেছিলেন। এখানেই মহাবৎ খাঁ সম্রাটের শিলমোহরকরা একখানা ফরমান পেলেন—তাঁকে বাংলার সুবাদার করা হয়েছে, তিনি যেন এক্ষুণি সেখানে গিয়ে কাজ বুঝে নেন। আর তাঁর বদলে পরভেজের সঙ্গে থাকবেন খানজাহান লোদি। তিনি পরভেজের কাজে সাহায্য করবেন, তাঁকে পরামর্শ-উপদেশ দেবেন। ওখানে মহাবতের আর কোন দরকার নেই······

পরভেজ বেঁকে বসলেন। মহাবতের সঙ্গে কিছুদিন মিলে মিশে সবে সিংহাসনের মাহাত্ম্য বুঝতে শিখেছেন, নিজের ভালমন্দ সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন, মহাবতের সাহায্যে নিজের কাজে আরও এগিয়ে যাবেন বলে ঠিক করছেন, আর সেই মুহূর্তেই কিনা এই ফরমান!

পত্রবাহককে পরভেজ বলে দিলেন—মহাবৎকে তিনি ছাড়তে পারবেন না, অতএব খানজাহান লোদিকে শুধুমুদু পরামর্শ দিতে আসতে হবে না।

পত্রবাহক ফিরে গেলেন, সম্রাট আর সম্রাজ্ঞীর কাছে সব খবর পেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ফরমান গেল পরভেজের কাছে। এবারকার ফরমানের ভাষা ছিল কড়া—মহাবৎ যদি বাংলায় যেতে অনিচ্ছুক, তো তাড়াতাড়ি চলে আসুন সম্রাটের দরবারে। শাহ্‌জাদা

তাঁর আমীরদের নিয়ে থাকুন বুরহানপুরে। এর যেন অন্যথা না হয়……।

এবার পরভেজ ভয় পেলেন, তিনি তাড়াতাড়ি খানজাহান লোদিকে অভ্যর্থনা করলেন। অন্যদিকে মহাবৎ চলে এলেন বাংলা দেশে।

এই সংবাদে নূরজাহান আর আসফ খাঁ দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হাসলেন! পরভেজ ও মহাবতে যে জুটি বেঁধে উঠছিল, শেষপর্যন্ত যে ছাড়াছাড়ি হল, ঐ যথেষ্ট।

'এখন আসল কাজ বাকি', নূরজাহানের কথায় আসফ খাঁ বোনের মুখের দিকে তাকালেন,—'মহাবৎকে এবার সরিয়ে ফেলতে হবে। পাঁচজনের সামনে নাজেহাল করে লাঞ্ছনা দিয়ে মহাবৎকে তলায় ফেলতে হবে। নইলে ওর হাত থেকে আমি তুমি কেউ রক্ষা পাব না…'

অতএব মহাবতের কাছে আবার লোক গেল এবারকার আদেশ ছিল শাহ্‌জাহানের বিদ্রোহের সময় বাংলা-বিহার থেকে মহাবৎ খাঁ যে হাতীগুলি পেয়েছিলেন সে সব ক'টি যেন সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, আর জায়গীরদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে যে অগুণতি টাকা পয়সা পেয়েছিলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারও যেন একটা হিসেব পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এত দিন হিসেব না দেওয়াটাই তো মস্ত ক্রটি হয়ে গেছে…।

বটে! মহাবৎ বুঝলেন তাঁর চারদিকে জাল বিছানো হচ্ছে। 'আশ্চর্য, এঁরা একবার মনেও রাখলেন না, রাজ্যের কত বড় বিপদে এসে আমি দাঁড়িয়েছিলাম! বিদ্রোহী শাহ্‌জাহান যেভাবে ফুঁসে উঠেছিলেন, আর কারো সাধ্য ছিল তাঁকে দাবিয়ে রাখা! কাজের বেলায় আদর করে ডেকে এনে এখন বিপাকে ফেলার চেষ্টা! কাজ ফুরোলে পাজি? কি গুণের বালাই নিয়েই না মহারাণী সম্রাটকে অন্ধ করে রেখেছেন……উঃ… …'

মর্মাহত মহাবৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

নূরজাহানকে তিনি কি আজকে চিনেছেন? চিনেছেন প্রথম থেকে। নূরজাহান-চক্রের সূত্রপাত থেকে। সেই নূরজাহান এখন সময় বুঝে তাঁকে ধনেপ্রাণে মারবার চেষ্টা করবেন, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

মহাবৎ খাঁ মনের মধ্যে কি যেন এক স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন, মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল।

মহাবৎ অতি শান্তভাবে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করার জন্য যাত্রার আয়োজন করলেন। একা গেলেন না। স্ত্রীপুত্র পরিজনকে নিয়েই গেলেন, আর নিয়ে গেলেন হাজার পাঁচেক রাজপুতের এক সেনাবাহিনী। অতবড় এক সেনাপতি শাহ্‌জাহান-জয়ী মহাবৎ খাঁ, জাঁকজমক করে লোকলস্কর নিয়ে যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

সম্রাট জাহাঙ্গীর এই সময়ে কাশ্মীর থেকে ফিরে লাহোরে এসেছিলেন। সেখানে কয়েক মাস বিশ্রাম করে কাবুলের দিকে যাত্রা করলেন; পথে কয়েক দিনের জন্য ঝিলাম নদীর তীরে সম্রাটের তাঁবু পড়ল। আর এইখানেই মহাবৎ খাঁ সদলে উপস্থিত হয়ে সম্রাটের সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন।

অত সৈন্যসামন্ত নিয়ে জঙ্গী বেশে মহাবতের আবির্ভাবকে কেউই খুব শান্তচিত্তে মেনে নিতে পারল না। অথচ কারও সাহসও হল না এবিষয়ে মহাবৎকে কিছু জিজ্ঞাসা করার। তবে মহাবৎকে একথা জানানো হল, সম্রাট নিজে যতক্ষণ না তাঁকে ডেকে পাঠান ততক্ষণ যেন তিনি দরবারের বাইরে থাকেন। আর যে হাতীগুলির বিষয়ে খোঁজ করা হয়েছিল সেগুলি যেন অবিলম্বে সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য মহাবৎ খাঁ এ আদেশের আগেই হাতীগুলি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, হাতে ঝামেলা রাখতে চান নি।

মহাবৎ সত্যিই কোন ঝামেলা চান নি। গোড়া থেকে নূরজাহানের ওপর তাঁর রাগ ছিল ঠিকই, কিন্তু সম্রাটের ওপর ছিল

অভিমান। নূরজাহানের ব্যবহারে মনের মধ্যে জমে-ওঠা ক্ষোভের ব্যথাটা তিনি একবার সম্রাটকে জানাতে চেয়েছিলেন, আর জানতে চেয়েছিলেন তাঁর দোষটা কোথায়, কেন তাঁকে এমনভাবে নাজেহাল করার চেষ্টা হচ্ছে? তিনি তো চিরকাল সম্রাটকে আনুগত্যই দেখিয়ে এসেছেন। কখনও তো কোন অবিশ্বাসের কাজ করেন নি!

মহাবতের মুখখানা থমথমে হয়ে উঠল। নূরজাহান-জুনতার জন্ম থেকে তিনি সম্রাটকে এই ডাকসাইটে বেগমটির কবল থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি জানতেন, না হলে সম্রাটেরই অপবাদ হবে, অবনতি হবে।

'বেগম সাহেবাও চোখ রাঙাচ্ছেন, সম্রাটও অমনি বকুনি দিয়ে দিয়ে লোক পাঠাচ্ছেন। একবার ভেবে দেখলেন না, শাহ্‌জাহানকে কাত করতে আমার কত মেহনত খরচা হয়েছে। সম্রাট শুধু স্ত্রীর কথাটাই শুনলেন, আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখবার অবসরটুকুও পর্যন্ত তাঁর হল না!'

মহাবৎ সম্রাট জাহাঙ্গীরের ওপর সত্যিই অভিমান করেছিলেন।

কিন্তু এই ফাঁকে এমন এক ঘটনা ঘটল যার জন্য মহাবতের সমস্ত অভিমান বাষ্প হয়ে উড়ে গিয়ে অন্য রূপ নিল।

মহাবৎ তাঁর মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছিলেন বর্‌খর্‌দার নামে একটি ছেলের সঙ্গে। তবে মুঘলযুগের নিয়ম অনুযায়ী আগে সম্রাটকে জানানো ও তাঁর অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মহাবৎ তার কিছুই করেন নি। ফলে নূরজাহান সুযোগ পেয়ে গেলেন, সম্রাটকে সংগোপনে বললেন, 'দেখছ, মহাবতের সাহস কত বেড়েছে! মেয়ে-বিয়ে দেওয়ার জন্য সম্রাটের অনুমতিটুকু পর্যন্ত নেয় নি! একজন সেনাপতির এতখানি ধৃষ্টতা সম্রাটের পক্ষে কত বড় অপমান!'

সম্রাট জাহাঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠলেন—নিয়ে আয় সেই ছেলেটাকে, দেখি মহাবৎ খাঁয়ের কতখানি হিম্মত তাকে রক্ষা করে।

একটি নিরাপরাধ ছেলে বর্‌খর্‌দার—সাতে নেই পাঁচে নেই,

তাকে ধরে নিয়ে আসা হল। দুটি হাত পেছনের ঘাড়ের দিকে মুচড়ে শক্ত করে বেঁধে তারপর পা খালি করে দিয়ে পায়ের তলায় যথেচ্ছ বেত মারা হল। বেতের ঘায়ে পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, রক্তের ধারা বয়ে চলল, আর সেই অবস্থাতেই আহত ছেলেটিকে আটকে রাখা হল বন্দীঘরে।

খবরটি যথাসময়ে মহাবৎ খাঁর কানে গেল। বেত তাঁর জামাইকে মারা হয় নি, মারা হয়েছে তাঁকে, তাঁর সত্তাকে, তাঁর আভিজাত্যকে। মহাবতের মনের অভিমান এবার হিস্ হিস্ করে জ্বলে উঠল। এই অপমানের প্রতিশোধ শক্ত হাতেই নিতে হবে।

বাইরের দিকে কিন্তু কেউ টের পেল না। পাথরের মতো শক্ত স্থির ও অচঞ্চল হয়ে মহাবৎ শুধু অপেক্ষা করতে লাগলেন। পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে লেগে ঝিলামের অশান্ত জল ঘূর্ণি হয়ে ঘুরতে লাগল……

ঝিলাম নদীর ওপর পাশাপাশি নৌকো সাজিয়ে ব্রিজ তৈরি করে তার ওপর দিয়ে সম্রাট সদলবলে ওপারে যাওয়ার যোগাড় করলেন। ক্রমে ক্রমে সব কিছু ওপারে পাঠানো হল। অস্ত্রপাতি, সৈন্যসামন্ত, ধনরত্ন, গৃহস্থালির যাবতীয় জিনিসপত্র—সব ক'টি কর্মচারী, লোকজন—সব। এপারে খুব অল্পই অবশিষ্ট রইল। সম্রাট-সম্রাজ্ঞী রইলেন, আর থাকল কিছু চাকর-বাঁদী, খোজাপ্রহরী, অন্তরঙ্গ কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্মচারী। পরদিন সকাল বেলাতেই সম্রাট এঁদের সবাইকে নিয়ে ওপারে চলে যাবেন বলে স্থির করলেন। ততক্ষণ তো ওপারে সব গুছিয়ে বসুক।

পূব আকাশ লাল হয়ে পরদিন ভোর হল। মহাবৎ তৈরি হলেন। আজকের সকাল তাঁর জীবনে নোতুন প্রভাত। সূর্যের কিরণ আরও

প্রখর হবে, না তার আগেই অমানিশা নেমে আসবে—জানেন না। তবু তিনি তৈরি হয়েছেন, তাঁর সৈন্যেরাও তৈরি হয়ে আছে। মহাবৎ খাঁ যথাসময়ে করণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁদের উপদেশ দিয়ে রেখেছেন, চারদিককার ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব নিখুঁত।

মহাবৎ খাঁ প্রথমে দু'হাজার অশ্বারোহীর একটি দলকে পাঠালেন ঝিলাম নদীর পারে, ব্রিজের মুখে। একটি লোকও যেন ওপার থেকে এপারে না আসতে পারে। আর যদিই ওপার থেকে সম্রাটের সৈন্য এপারে আসার চেষ্টা করে, তা হলে কোন ইতস্তত, কোন দ্বিরুক্তি না করে সঙ্গে সঙ্গে যেন আগুন ধরিয়ে ব্রিজ পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়—এ আদেশের যেন অন্যথা না হয়।

মহাবৎ খাঁ এবার গুছিয়ে নিলেন, চকচকে তেজিয়ান প্রিয় ঘোড়াটির পিঠে লাফিয়ে উঠলেন, ছুটে চললেন সম্রাটের তাঁবুর দিকে। সঙ্গে বাছাইকরা একদল রাজপুত ঘোড়সওয়ার।

মহাবৎ খাঁ নিজের মনেই মাথা নাড়লেন—'এছাড়া উপায় ছিল না সম্রাট। নইলে আপনার সম্মান তো আমি কখনও ক্ষুণ্ণ করতে চাই নি, কখনও না······'

মহাবৎ জোরে ঘোড়া ছোটালেন, ঘোড়া ছোটাল রাজপুত সৈন্যেরা।

'ক্যু দ্য' েতত' (coup d'etat) বা সামরিক শক্তি দিয়ে চলমান শাসনতন্ত্রের আকস্মিক অবসান ইতিহাসে বিরল নয়।

রাজনীতিতে এমনভাবে আচমকা পাশা ওল্টানোর নজির যথেষ্ট আছে।

রাজনীতির ইতিহাসে এই 'ক্যু' বড় সাংঘাতিক, বড় ভয়াবহ, মেঘহীন নীল আকাশ থেকে হঠাৎ বজ্র গর্জে ওঠে। একটু চিন্তা করার অবসর দেয় না।

মহাবৎ খাঁ ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য ঠিক 'ক্যু দ্য তেত' নয়, 'ক্যু দ্য মেঁ' (Coup de main)—সম্রাটকে শুধু একটু বোঝাপড়ার মধ্যে নিয়ে আসা,—একটু খোলাখুলি আলোচনা করে এই বিশ্রী অবস্থার অবসান করা। নইলে জোর ফলিয়ে সিংহাসন থেকে সম্রাটকে সরিয়ে ফেলার কোন সুদূর উদ্দেশ্যও মহাবতের মনে সেদিন ছিল না।

মহাবৎকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখে সম্রাটের শিবিরে ভয়ের আর্তনাদ জেগে উঠল। অন্তত একশ অশ্বারোহী নিয়ে কোন দিকে গ্রাহ্য না করে মহাবৎ প্রধান দরজা দিয়ে শিবিরে ঢুকে পড়লেন। একবার শুধু জিজ্ঞেস করলেন, সম্রাট কোথায়।

মহাবৎ ঘরের মধ্যে ঢুকলেন, ঘোড়া থেকে নামলেন, লক্ষ্য করলেন কয়েকজন খোজা বিবর্ণমুখে দাঁড়িয়ে আছে ভেতরের দিকে একটা ঘরের সামনে। গোসলখানা। সম্রাট তখন গোসলখানায় ছিলেন।

জাহাঙ্গীরের জীবনীকার মুতাবিদ খাঁ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। মহাবৎ খাঁয়ের এতখানি ভেতরে ঢুকে আসাটা তিনি পছন্দ করলেন না। মহাবতের সামনে গিয়ে বলবেন—'ধৃষ্টতা আর দুঃসাহসের বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি সম্রাটকে খবর দিচ্ছি।'

আর সম্রাটকে খবর দেওয়া! মহাবতের মাথায় তখন টাটার ব্লাস্ট্‌ফারনেস জ্বলছে। মুতাবিদ খাঁয়ের কোন অনুরোধ কোন কথাই তাঁর কানে গেল না। সঙ্গীদের মধ্যে কয়েকজন ছুটে গিয়ে গোসলখানার সামনে দাঁড়-করানো কতকগুলো তক্তা তরোয়াল দিয়ে টুকরো টুকরো করে ঘরের মেঝেতে ফেলে দিল. আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন সম্রাট, মুখে রাজোচিত গাম্ভীর্য। তিনি সবই জানতে পেরেছিলেন, সবই বুঝতে পেরেছিলেন। কোন অস্থিরতা তিনি দেখালেন না, ধীরে অচঞ্চল মুখে দরজার বাইরে অপেক্ষমান পাল্কিতে গিয়ে উঠলেন।

মহাবৎ খাঁ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, বিনীতভাবে বললেন, 'আসফ খাঁর ঘৃণা থেকে আমি কিছুতেই রক্ষা পেতাম না, চরম লাঞ্ছনা অপমানের ভেতর দিয়ে তাঁর হাতে একদিন না একদিন আমার প্রাণ যেতই। তাই আপনার শরণ নেওয়ার এই দুঃসাহস। আপনি যদি মনে করেন, আমাকে মৃত্যুদণ্ড বা যে-কোন শাস্তি দিতে পারেন। আপনার আদেশ পালনে আমি কোন দ্বিধা করব না…'

ইতিমধ্যে রাজপুত সঙ্গীরা সম্রাট ও তাঁর লোকজনদের ঘিরে ফেলেছিল।

জাহাঙ্গীর চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন, বুঝতে পারলেন। কী ভুল করেছেন। মহাবৎ খাঁ যেদিন থেকে এখানে শিবির ফেলেছিলেন, সেদিন থেকে তাঁদের আরও কত সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। নূরজাহান ও আসফ খাঁ দিনের পর দিন মহাবতের সঙ্গে শত্রুতা পাকিয়েছেন, অথচ শত্রুর আবির্ভাবে এতটুকু সাবধানতা অবলম্বন করেন নি!

এমন বেকুব অবস্থায় পড়ে লজ্জায় অপমানে সম্রাটের মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করল। ইচ্ছে করল খাপ থেকে তরোয়ালখানা সাঁই করে বার করে ধাঁই করে মহাবৎ খাঁয়ের মাথায় বসিয়ে দিতে। কিন্তু বাধা দিলেন কর্মচারী মনসুর বাদাখসি, সম্রাটকে তুর্কী ভাষায় বললেন, 'আপাতত ধৈর্য ধরুন সম্রাট, পরে একদিন সময় আসবেই। সেদিন ভগবানই এই দুরাত্মাকে শাস্তি দেবেন……'

ভাগ্যিস মহাবৎ খাঁ তুর্কী ভাষা জানতেন না!

সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজেকে শত্রুসৈন্যের ঘেরাটোপের মধ্যে দেখে তরোয়াল থেকে হাত সরিয়ে নিলেন।

মহাবৎ খাঁ নিজের ঘোড়াটি এগিয়ে দিয়ে মাথা নীচু করে সম্রাটকে অনুরোধ জানালেন, 'উঠে বসুন সম্রাট, আপনি যেমন স্বচ্ছন্দভাবে আপনার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়িয়ে আসেন, এখানেও ঠিক তাই করুন, নইলে হয়তো আশেপাশের প্রজারা ভাববে তাদের

প্রিয় সম্রাটকে আমরা বুঝি কোন আঘাত করেছি। আপনি ভাল করে স্বাভাবিকভাবে উঠে বসুন। আপনার সঙ্গে আপনার বান্দারাও যাবে…'

জাহাঙ্গীর একবার তাকিয়ে দেখলেন মহাবতের দিকে…বুদ্ধির খুব যে জোর।…আমাকে বাগে পেয়ে বুদ্ধির গাছে আরও পাতা খুলেছে দেখছি! বাহবা…

মুখে বললেন, 'আমার ঘোড়া নিয়ে এস, সম্রাট যে অন্য কারো ঘোড়ার পিঠে বসেন না, এ খবর অন্ততঃ জানা উচিত ছিল।'

সম্রাট আরও জানালেন, তাঁর একবার ভেতরে গিয়ে পোশাকটা পাল্টে আসা উচিত।

মহাবৎ খাঁ কঠোরভাবে সম্রাটের অনুরোধ অগ্রাহ্য করলেন। অসম্ভব, সম্রাটকে আর কিছুতেই ভেতরে যেতে দেওয়া হবে না। মনে মনে বললেন, পাগল, না মাথা খারাপ! ভালোমানুষী করে ভেতরে যেতে দিই, আর অমনি নূরজাহানের সঙ্গে দেখা করে তাঁর বুদ্ধির প্যাঁচে আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাও—আমি ওরকম বোকা বনবার পাত্তর নই—

সম্রাট বুঝলেন, কঠিন ফাঁদে পড়েছেন, ধৈর্য ধরতেই হবে।

সম্রাটের ঘোড়া আনা হল, মহাবৎ খাঁ এতে আর আপত্তি করলেন না, তবে সম্রাটকে একেবারে ঘিরে রেখে দিলেন। খানিকটা গিয়েই মহাবৎ সম্রাটকে হাতীর পিঠে চাপতে বললেন। সম্রাট রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, উঁচু জায়গায় না বসলে চারদিকের সবাই সম্রাটের দর্শন পাবে কি করে?

নিরুপায় সম্রাট নির্বিকারভাবে কথা শুনলেন, হাতীর পিঠে হাওদায় উঁচু হয়ে বসলেন। সামনে পেছনে বসল মহাবতের বিশ্বস্ত লোক।

সমাটের অনুগত মক্‌রব খাঁ সম্রাটের একান্ত কাছে বসবার একটু জায়গা চাইলেন, প্রার্থনা না-মঞ্জুর হওয়াতে জোর খাটাতে গেলেন,

ফলে গায়ের পোশাক রক্তরঞ্জিত হয়ে উঠল। শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে কপালে ক্ষতের সৃষ্টি হল। তবু তাঁর সকাতর মিনতিতে শেষ পর্যন্ত তাঁকে হাওদার একপাশে একটু ঠাঁই দেওয়া হল।

সম্রাটের শিবির থেকে ছুটতে ছুটতে এল একটি ভৃত্য, হাতে তার প্রভুর পানপাত্র। সে যদি পাত্র পূর্ণ করে পানীয় না এগিয়ে দেয় তা হলে সম্রাটের কি উপায় হবে?···তিনি কি করে নির্দিষ্ট সময়ে পান করবেন তাঁর অত সাধের তরল মনোহরা!

বর্শা হাতে রাজপুতরা তাকে ঠেলে দিল, ফেলে দিল। তবুও সে হাওদার একটুখানি চেপে ধরে প্রায় ঝুলতে ঝুলতে চলল।

এক মাইলটাক যাওয়ার পর দেখা গেল রাজকীয় সাজ-পরানো আর একটি হাতী পেছন পেছন আসছে—সম্রাটের নিজস্ব হাতী। নিয়ে আসছেন পিলখানার অধ্যক্ষ গজপত খাঁ। নিজে বসেছেন সামনে, পেছনে বসিয়েছেন ছেলেকে।

মহাবৎ ভ্রূ কুঁচকে একবার তাকালেন গজপতের দিকে। সম্রাটের হাতীতে সম্রাটকে বসিয়ে পালানোর মতলব বুঝি? মহাবৎ রাজপুত সৈন্যদের কি যেন ইশারা করলেন। নিমেষে লুটিয়ে পড়ল বাপ-ছেলের প্রাণহীন দেহ।

বাকি পথটুকু আর কিছু হল না। বন্দী সম্রাটকে নিয়ে আসা হল মহাবতের শিবিরে। ক্রোধে আর দুঃখে জাহাঙ্গীর একবার নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেন।

সম্রাট সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে মহাবতের এবার মনে পড়ল নূরজাহানের কথা। প্রথমেই যে কেন নূরজাহানের কথা মনে পড়েনি আশ্চর্যের বিষয়! তবে মহাবৎ এটা নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন যে, সম্রাটকে কেন্দ্র করেই যখন নূরজাহানের অপরিমিত বাসনা আর ক্ষমতার খেলা, তখন সম্রাটকে হাতের মুঠোয় পুরলেই নূরজাহানের ক্ষমতার সীমা সঙ্কীর্ণ হবে, সঙ্কুচিত হবে তাঁর উচ্চাভিলাষের মাত্রা।

তবু মহাবৎ সম্রাটকে সঙ্গে নিয়ে আবার গেলেন সম্রাটের

শিবিরে—এর ওপর যদি নূরজাহানকেও হাতের মুঠোয় আনা যায় তা হলে বুঝতে হবে মহাবতের বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে—সব কিছু মিলে সোনায় সোহাগা।

কিন্তু সব স্বপ্নই তো ফলে না! মহাবৎ সম্রাটের শিবিরে নূরজাহানকে বন্দী করতে গিয়ে দেখলেন—সব ফাঁকা, সব শূন্য। মহাবতের আশার ফানুসকে ফুটো করে দিয়ে নূরজাহান পালিয়েছেন। শিবিরের আনাচে-কানাচে কোথাও সম্রাজ্ঞীর চিহ্নমাত্রও নেই।

মহাবৎ সম্রাটকে নিয়ে ফিরে এলেন। এবার আর নিজের শিবিরে নয়, সোজা শাহ্‌রিয়রের শিবিরে। মহাবৎ সেখানে গিয়ে আর একবার অবাক হলেন। আশ্চর্য, শাহ্‌রিয়রও পালিয়ে গেছেন! চারদিকে খুঁজে তাঁরও কোন পাত্তা পাওয়া গেল না! অথচ নদীতে ব্রিজের মুখে এত কড়া পাহারা, কি আশ্চর্য! যাক আর কী করা যাবে।

জাহাঙ্গীর সারারাত থাকলেন শাহ্‌রিয়রের শিবিরে।

যে-নূরজাহানের জন্য মহাবৎ খাঁয়ের এত আতিপাতি, এত অনুসন্ধান, তিনি কিন্তু ইতিমধ্যে ছদ্মবেশে গা ঢাকা দিয়ে একজন খোজাকে সঙ্গে নিয়ে ব্রিজ পার হয়ে ওপারে চলে গিয়েছিলেন।

মহাবৎ খাঁ ব্রিজের মুখে দু'হাজার সৈন্য মোতায়েন রেখেছিলেন ওপার থেকে কেউ এদিকে এলে তাকে বাধা দেবার জন্য; কিন্তু তিনি এদিক থেকে ওদিকে যাওয়াতে কোন নিষেধ জারী করেন নি। ফলে যে বিরাট ভুলটি হয়েছিল তারই ওপর পা দিয়ে নূরজাহান দিব্যি ওপারে চলে গেলেন।

নদীর ওপারেই যখন শত্রু, তখন এপার থেকে ওপারে যাওয়ার পথও তো বন্ধ করা উচিত ছিল। সেটি বন্ধ করা হয় নি বলেই নূরজাহানের সামনের পথ খুলে গিয়েছিল। মহাবতের সৈন্যেরা

ভেবেছিল দুটি একটি মানুষ গেলে আর কি হবে? একটা গোটা সেনাবাহিনী তো আর কুচকাওয়াজ করতে করতে যাচ্ছে না। ভয়টা কিসের?

ভয়টা কিসের, সেটা মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই বোঝা গেল। নূরজাহান ওপারে গিয়েই প্রথমে ভাই আসফ খাঁকে একহাত নিলেন—কেন তিনি সম্রাট-ভগ্নীপতির নিরাপত্তার দিকে না তাকিয়ে শুধু নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলেন? ভীরু, কাপুরুষ! আসফ খাঁ বকুনি খেলেন, বকুনি খেয়ে চুপ করে থাকলেন।

নূরজাহান সমস্ত প্রধান রাজকর্মচারী ও আসফ খাঁকে নিয়ে একটি মন্ত্রণা সভা ডাকলেন। সম্রাটের উদ্ধার ও মহাবৎ খাঁকে আক্রমণ—এই দুই পরামর্শই হল। স্থির হল পরদিন সকালেই ওপারে শত্রুদের আক্রমণ করে সম্রাটের উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করতে হবে।

'মনে থাকে যেন, তোমার দায়িত্ব সব চাইতে বেশী। তোমার অমনোযোগিতার জন্যই আজ সম্রাট মহাবৎ খাঁয়ের হাতে বন্দী। যে ত্রুটি ঘটে গেছে সেটা যত দূর সম্ভব শোধরাবার চেষ্টা করাই এখন সব চাইতে বড় কর্তব্য…' নূরজাহান তীব্র ভাষায় আসফ খাঁ ও তাঁর সৈন্যবাহিনীকে তৈরি হবার হুকুম দিলেন। শুধু এই রাতটুকু। কালকে দিনের আলো ফুটতে না ফুটতেই ঝাঁপ দিতে হবে ঝিলামের জলে। ওপারে গিয়ে ছিনিয়ে আনতে হবে সম্রাট জাহাঙ্গীরকে—মুঘল-মর্যাদাকে। মনে থাকে যেন, শুধু আজকের রাতটুকুতে কোনমতে বিশ্রাম…।'

এই সামরিক প্রস্তুতির ব্যাপারটা আগেভাগেই পৌঁছে গেল জাহাঙ্গীরের কানে। সব কিছু চিন্তা করে পরিণতি ভেবে জাহাঙ্গীর আশঙ্কায় শিউরে উঠলেন। উনি তো এপাশে থেকে বুঝতে পারছেন, মহাবতের দুর্ধর্ষ রাজপুত বাহিনীর তুলনায় ওপারের রাজকীয় বাহিনী কত দুর্বল, কত অপ্রস্তুত! উপরন্তু এপারে আসবার যে ব্রিজ, সেটাও তো মহাবৎ খাঁ পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছেন! কি আশ্চর্য,

সাক্ষাৎ যমের মুখে আসার জন্য নূরজাহানের মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে এত ছটফট করছে কেন? আসফ খাঁই বা কি করছেন? তাঁরও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল!

জাহাঙ্গীর অস্থির হয়ে উঠলেন—একটু অস্থির হলেন মহাবৎ খাঁও। যুদ্ধের ভয়ে নয়, তাঁর নিজের আদর্শ হারানোর ভয়ে। তাঁর আদর্শ তো 'ক্যু দ্য' তে', নয়, তাঁর আদর্শ 'ক্যু দ্য মেঁ'। তিনি রাজসিংহাসন চান নি, রাজ্য চান নি। আকস্মিক দক্ষতা দিয়ে তিনি সম্রাট-সম্রাজ্ঞী-আসফ খাঁ-শাহ্‌রিয়র ইত্যাদিকে শুধু বন্দী করতে চেয়েছিলেন—শাস্তি দেবার জন্য নয়, সম্রাটের কাছে মনের পুঞ্জীভূত অভিযোগ জানিয়ে তার প্রতিকার করার জন্য। নইলে দুনিয়াসুদ্ধ লোক যদি ভুল বোঝে যে, মহাবৎ খাঁ সম্রাটকে সরিয়ে দিয়ে সব কিছু উল্টে দিতে চাইছেন, তা হলে তো তাঁরই লজ্জা বেশী!

মহাবৎ খাঁর পরামর্শে জাহাঙ্গীর মক্‌রব খাঁকে দিয়ে ওপারে খবর পাঠালেন—'তোমরা কোন্ সাহসে যুদ্ধ-যুদ্ধ করে লাফাচ্ছ? বিশেষ করে আমি যখন এপারে রয়েছি! নদী পার হয়ে যদি যুদ্ধের চেষ্টা কর, তা হলে দুঃখ আর অনুতাপের কিন্তু শেষ থাকবে না, আগের থেকেই বলে রাখছি…'

এই সংবাদের সততা সম্বন্ধে যাতে কারো কোন সন্দেহ না হয় সে জন্য জাহাঙ্গীর নিজের নাম খোদাই-করা আঙটিটা পর্যন্ত পাঠিয়ে দিলেন।

সম্রাট এত করলেন বটে, কিন্তু ওদিকে সব 'উল্টো বুঝলি রাম' হয়ে গেল। নূরজাহান থেকে আরম্ভ করে সব বড় বড় মাথাওয়ালা লোকেরা ভেবে নিলেন, এই সংবাদ ভুয়ো, একেবারে মিথ্যে। সম্রাটের ওপর জোর ফলিয়ে ঐ আঙটি আর খবর পাঠানো হয়েছে। এ সব মহাবতের চাল। সুতরাং যুদ্ধ তাঁরা করবেনই। নইলে লোকে তাঁদেরই কাপুরুষ বলে ধিক্কার দেবে। আর যুদ্ধ ছাড়া সম্রাটকেই-বা উদ্ধার করবেন কি করে? সুতরাং যা একবার স্থির হয়েছে, তাই

হবে। কাল সকালেই যুদ্ধ শুরু হবে, এই ব্যবস্থার আর কোন হেরফের হবে না।

পর দিন যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগেই একটা দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা করেছিলেন ফেদাই খাঁ। ফেদাই খাঁ আগে ছিলেন মহাবতের অনুচর, এখন হয়েছেন নূরজাহানের একান্ত অনুগত বিশ্বাস-ভাজন।

রাতের অন্ধকার থাকতেই ফেদাই খাঁ কিছু সঙ্গী সাথী নিয়ে ঘোড়াসুদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়লেন ঝিলামের জলে। যুদ্ধের সোরগোল বাধবার আগেই ফেদাই খাঁ নিভৃতে সম্রাটকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জলে পা দিয়েই বুঝলেন, কাজটা কঠিন। অসংখ্য ঘূর্ণি সৃষ্টি করে পাহাড়ী নদী ঝিলামের জল পাথরের গায়ে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে খরস্রোতে বয়ে যাচ্ছে। ফেদাই খাঁ দলবল নিয়ে জলে ঝাঁপ দেওয়া মাত্রই জনকয়েক লোক ঘোড়াসুদ্ধ ভেসে চলে গেল। কিছু লোক নাকানিচোবানি খেয়ে আধমরা হয়ে ফিরে এল। বাকি ফেদাই খাঁ আর অল্প কয়েকজন। তাঁরা দেখলেন এই পা-কেটে-যাওয়া স্রোতে ঘোড়া নিয়ে পার হওয়া অসম্ভব। অগত্যা ঘোড়াগুলি ভাসিয়ে দিয়ে সাঁতার কেটে কোন মতে ওপারে গিয়ে পৌঁছলেন। কিন্তু দেখতে পেলেন না ওপারে শত্রুসৈন্য সার দিয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবে তাঁদের লক্ষ্য করছে। সুতরাং যেই তাঁরা ওপারের মাটিতে পা দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চারজন প্রাণ হারালেন। বাকি ক'জনকে নিয়ে ফেদাই খাঁ তীরবেগে নদী সাঁতরে ফিরে এলেন আবার নিজেদের শিবিরে। অনর্থক ক'টি মানুষের প্রাণ গেল, কাজের কিছুই হল না।

ভোর হল, মুঘল শিবির চঞ্চল হয়ে উঠল। আজকের যুদ্ধ কোন সেনাপতি পরিচালনা করবেন না, করবেন স্বয়ং সম্রাজ্ঞী নূরজাহান। আজ নূরজাহানের চরম বিকাশ, আকাঙ্ক্ষার চরম উত্থান। উপায় নেই। প্রাণের চাইতে সম্মান অনেক বড়।

সব চাইতে বড়, সব চাইতে উঁচু একটি হাতীর পিঠে যুদ্ধবেশে মহীয়সী হয়ে বসলেন নূরজাহান। তবে সে মহিমাচিহ্ন এখানে ছিল

না, ইতিহাসের পাতায় যে মহিমার আলো দেখা গেছে যোদ্ধৃবেশিনী চাঁদসুলতানা, রাণী দুর্গাবতী বা রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের চেহারায়। তাঁরা লড়াই করেছিলেন স্বাধীন মাটির জন্য, নূরজাহান লড়াই করতে নেমেছিলেন নিজের একক ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য। গৃহবিবাদে, নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটিতে বীরত্ব ও বুদ্ধি দেখানোর সুযোগ থাকলেও মহত্ত্ব দেখাবার কোন উপায় নেই—বিশেষ করে নূরজাহানের তো ছিলই না। মহাবতের মতো বিশ্বস্ত বীর সেনাপতিকে বিদ্রোহী করে তোলার মধ্যে তো তাঁরই ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল। নূরজাহান তাঁর বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তার একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন বৈকি!

তবু নূরজাহান যুদ্ধে নেমেছিলেন, অজেয় শত্রুর সামনে এগিয়ে যেতে ভয় পান নি। নূরজাহানের হাতে অস্ত্র ছিল, আর কোলে ছিল ছোট্ট নাতনীটি—শাহ্‌রিয়র ও লাডলী বেগমের শিশুকন্যা।

একদিকে যুদ্ধবেশ, হাতে অস্ত্র, অন্যদিকে কোলে শিশু—কারো কারো মতে শিশুটি হাতীর হাওদার ওপরে ধাত্রীক্রোড়ে ছিল—এ দৃশ্যকে যেন মেলান যায় না। নূরজাহানের প্রতি কাজে ক্ষমতার দম্ভ ছিল। বুদ্ধির খেলাও ছিল তীক্ষ্ণ। স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করে অনেক ভাবনা চিন্তার জাল বুনে তবেই নূরজাহান প্রতিটি কাজে এগোতেন। তাই যখন তাঁকে ঐ ভয়াবহ খরস্রোতা নদীতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে দেখি, অথচ কোলে দেখি একটি ছোট্ট সরল শিশু, তখন ভাবি নূরজাহান কি শিশুকে সামনে রেখে প্রতিপক্ষের আক্রমণ এড়াবার জন্য এক কৌশলী খেলা খেলতে চেয়েছিলেন? তিনি কি ভেবেছিলেন শিশু-কোলে নূরজাহানকে মহাবৎ খাঁ অনাহত অবস্থায় নিয়ে যাবেন সম্রাটের কাছে—যেখানে যাওয়াই হল নূরজাহানের প্রধান উদ্দেশ্য?

তবে নূরজাহানের শিবিরে যে অব্যবস্থা, যে বিশৃঙ্খলা ছিল, আসফ খাঁ এই সময়ে যে নিষ্ক্রিয় অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই অবস্থায়

নূরজাহান যা করেছিলেন, কোন দিকে দৃকপাত না করেই করেছিলেন। নূরজাহান চরিত্রে এই সাহসের পরিচয় অনেক জায়গাতেই পাওয়া গেছে।

স্বয়ং নূরজাহানকে যুদ্ধের অধিনায়িকার পদ নিতে দেখে মুঘল-বাহিনী নিশ্চয়ই নোতুন উৎসাহে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। নদী পার হবার জন্য যে জায়গাটা সব চেয়ে অগভীর বলে আগে থেকে বেছে রাখা হয়েছিল, কাজের সময় দেখা গেল নদী পার হওয়ার পক্ষে সব চাইতে বিপজ্জনক সেই জায়গাটাই। অগভীর হলে কি হবে, মাঝে মাঝেই রয়েছে মৃত্যুর ফাঁদের মতো বিরাট বিরাট গভীর গর্ত। জলে যে ক'টি নৌকো হাতী ঘোড়া নেমেছিল, স্রোতে আর গর্তের ফাঁদে তাদের অবস্থা অবর্ণনীয় হয়ে উঠল। নদীর মাঝখান পর্যন্ত যেতেই প্রাণান্ত, তা আবার ওপারে যাওয়া, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা।

ওদিকে শত্রুরা আবার যেভাবে সেজেগুজে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিল! প্রথম হাতীর সারি, তারপর ঘোড়া, তারপর অন্য দল। এদিককার বেসামাল অবস্থা দেখে তারা তো উল্লসিত। উল্লসিত হবেই, কারণ ইতিমধ্যে নূরজাহানের সামরিক বাহিনী তো শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল না, সব কিছু নিয়ম-একতা ভেঙে গিয়ে তারা বহু দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। আসফ খাঁ, খাজা আবুল হাসান, ইরাদত খাঁ মিলে একটি দল, ফেদাই খাঁর একটি দল, ওদিকে আসফ খাঁর ছেলে আবু তালিবের একটি দল—সব দল মিলে যেন একটা গোলমাল হট্টগোল বেধে গেল। সেনাপতিই বা কে, সৈন্যই বা কারা! কেউ কারো কথা শুনল না, নির্দেশ নিল না। তার ওপর আহত মানুষ ও জন্তুর মরণ-আর্তনাদ।

একবার নূরজাহানের উচ্চকণ্ঠের আদেশ শোনা গেল……'দেরী নয়, ইতস্তত নয়……সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ কর, শত্রুকে চরম আঘাত কর। তোমাদের অগ্রগতি দুর্জয় হোক, শত্রুসৈন্যের পরাজয় হোক—ভীরু কাপুরুষের মতো তারা পিছিয়ে যাক, পালিয়ে যাক……'

পিছিয়ে গেল, পালিয়ে গেল—শত্রুসৈন্য নয়, নূরজাহানের সৈন্যদল। তাদের দোষ নেই। নিশ্চিত মৃত্যুর থাবা থেকে তারা আত্মরক্ষা করেছিল। তারা বুঝেছিল, শৃঙ্খলাবদ্ধ দুর্ধর্ষ রাজপুত-সেনাবাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে হলে প্রাণ নিয়ে পালানো ছাড়া উপায় নেই।

ঝিলামের জলে দোল-উৎসব লাগল, রক্তে লাল হয়ে উঠল ঝিলামের বুকে বয়ে-যাওয়া জলস্রোত।

নূরজাহান অদম্য মনোবলে তখনও দাঁড়িয়ে ছিলেন ঝিলামের জলে। যে-হাতীর পিঠে বসে ছিলেন তার সামনে শুঁড়ে লাগল তরবারির আঘাত, পেছনে লাগল বর্শার আঘাত। বিরাটদেহী আহত পশু পাগলের মতো চীৎকার করে উঠল, ডুকরে কেঁদে উঠল কোলের শিশুটি। ওর কচি নরম বাহুতে বিঁধে গেছে একটা তীর। এর ওপর কয়েকটি রাজপুত সৈন্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল—নূরজাহানকে বন্দী করে কৃতিত্ব লাভের এই উপযুক্ত সময়। নূরজাহান শত্রুসৈন্যকে এগিয়ে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি হাতীর মুখ ফেরালেন। উপায় নেই, এইভাবে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব—ফিরে যেতেই হবে।

সম্রাজ্ঞী হবার পর নূরজাহানের এই প্রথম পিছিয়ে যাওয়া—প্রথম পরাজয়।

নিজের শিবিরে ফিরে এসে চিবুক শক্ত করে নূরজাহান আহত-শিশুর বাহু থেকে বার করে আনলেন তীক্ষ্ণমুখ তীর, ক্ষতের পরিচর্যা করলেন, মনের মধ্যে বয়ে গেল চিন্তা আর সমস্যার ঝড়ো হাওয়া।

পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরে এলেন আসফ খাঁ, খাজা আবুল হাসান আর সব শেষে ফেদাই খাঁ।

ফেদাই খাঁর প্রচেষ্টাই ছিল সব চাইতে দুঃসাহসিক। সম্রাটকে উদ্ধার করার চেষ্টা যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগেই একবার করেছিলেন, পুরো যুদ্ধের মধ্যেও একবার করলেন। এমন কি সব বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে তিনি সম্রাটের শিবির পর্যন্ত গিয়েছিলেন, শিবির

আক্রমণও করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সঙ্গীসাথীদের বেশ কিছু নিহত এবং নিজের ঘোড়াটি আহত হওয়ায় তিনি ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। সব আশার অবসান হল।

সব চাইতে মজার লজ্জাকর খেল্ দেখালেন আসফ খাঁ। তিনি আর শিবিরেই থাকলেন না। হাতের কাছে যা ছিল গুছিয়ে দু-তিন শ' সৈন্য আর কিছু সঙ্গীসাথী নিয়ে একেবারে পালিয়ে গেলেন আটকে—তাঁর নিজের জায়গীরে। সেখানে আটক দুর্গে আসফ খাঁ নিজেকে আটকে রাখলেন। নইলে মহাবৎ খাঁ যদি একবার আসফ খাঁকে ধরতে পারতেন, তা হলে তাঁর অদৃষ্টে কোন্ শাস্তির খাঁড়া নেমে আসত তা কি আর তিনি জানতেন না ?

ওদিকে খাজা আবুল হাসান কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করে, এদিক ওদিক তাকিয়ে সোজা গিয়ে যোগ দিলেন মহাবতের দলে।

ফেদাই খাঁ চলে গেলেন রোটাস গড়ে ছেলের কাছে। এ যেন যাত্রার যুদ্ধ শেষ করে নাট্যার দল ধড়াচুড়ো ছেড়ে যে যার কোটরে ফিরে গেল।

সব কিছুই এমনভাবে বানচাল হতে দেখে নূরজাহান স্থির করলেন, আপাতত মহাবতের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। নইলে সম্রাটের সঙ্গে দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

নূরজাহান স্বেচ্ছায় মহাবতের কাছে ধরা দিলেন। মহাবৎ খাঁও যথাসম্মানে নূরজাহানকে সম্রাটের কাছে নিয়ে এলেন। কয়েক দিনের অদর্শনের পর সম্রাট নূরজাহানকে দেখে খুশি হলেন। নূরজাহান সম্রাটকে দেখে আশ্বস্ত হলেন।

মহাবৎ খাঁ সৌভাগ্যের মই বেয়ে এবার উঠে এলেন একেবারে উচ্চতম মঞ্চে। সেখান থেকে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন। দেখলেন—সব কিছু তাঁর। সম্রাট-সম্রাজ্ঞী তাঁর হাতের মধ্যে—হাতের মধ্যে সব ক্ষমতা। মহাবৎ নূরজাহান-আসফ খাঁয়ের এতদিনের অবজ্ঞার যেন সুদে-আসলে প্রতিশোধ নিলেন। মুঘল সিংহাসন,

মুঘল সাম্রাজ্যের ওপর মহাবতের কোন লোভ ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন মুঘল রাজসভায় যোগ্যতা ও বীরত্বের শুধু একটু স্বীকৃতি, একটু যোগ্য সম্মান পাওয়া—আর কিছু নয়। যাক, এখন আর আক্ষেপ করার কিছু নেই। এখন শুধু পরের কাজগুলি করে যাওয়া।

সেনাবাহিনী দিয়ে মহাবৎ খাঁ ছেলে বিরোজকে পাঠালেন আটকে। আটক অবরোধ করা হল। আসফ খাঁকে মহাবৎ প্রতি-শ্রুতি দিয়ে জানালেন, তাঁর প্রাণের কোন ক্ষতি হবে না, তিনি শুধু বিরোধিতা ত্যাগ করুন, মহাবৎকে সমর্থন করুন—তা হলেই হবে।

বিপর্যস্ত, ক্লান্ত, লজ্জিত আসফ খাঁ কোন আপত্তি করলেন না, মহাবৎকে তিনি বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

চারদিকের ব্যবস্থা সব ঠিক করে মহাবৎ খাঁ এবার নিশ্চিন্ত হয়ে সম্রাটকে আবার কাবুল যাত্রার অনুরোধ জানালেন।

আবার যাত্রা শুরু হল। পথে জালালাবাদে কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে ১৬২৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে সম্রাট জাহাঙ্গীর কাবুলে পৌছলেন। সম্রাটের আভিজাত্যে, তাঁর জৌলুশ-আড়ম্বরের কোন দিকে কোন ত্রুটি হল না। মুঘল সম্রাট যথারীতি হাতীর পিঠে চড়ে শোভাযাত্রা করলেন, পথের দু'ধারে ছড়াতে ছড়াতে গেলেন সোনা আর রূপো। বাইরের থেকে কেউ বুঝতেও পারল না, মুঘল সম্মানে কোথাও কোন কালো দাগ পড়েছে কিনা! মহবৎ খাঁ সম্রাট-সম্রাজ্ঞীকে তো কোন অসম্মান করেন নি।

অসম্মান করেন নি ঠিকই, তবুও দুটি চোখ জ্বলে উঠেছিল নূরজাহানের। মনের মধ্যে ফুঁসে উঠেছিলেন আসফ খাঁ। অলিখিত অদেখা বিধানে সম্রাট-সম্রাজ্ঞী, আসফ খাঁ, তাঁদের অনুগত লোকেরা মহাবৎ খাঁয়ের বন্দী তো বটে। নূরজাহানের অন্তরাত্মা ধিকি ধিকি করে পুড়ছিল মহাবতের এই প্রাধান্য। ঝিলামের স্রোতে কিনা আজ ভাগ্যের বিধান পাল্টে গেল! পুবমুখো ইতিহাস একেবারে পশ্চিমমুখো হল! একেই কি বলে অদৃষ্ট! নিয়তি!

যতই হোক, নূরজাহান এ অবস্থাকে কিছুতেই মেনে নেবেন না। মেনে নেবার, আর মানিয়ে নেবার চরিত্র আর যাঁর হোক, নূরজাহানের নয়।

রাগ আর দুঃখের আগুন আরও পাকিয়ে পাকিয়ে উঠল, নূরজাহান যখন দেখলেন তাঁর এই অবস্থান্তরে অনেক আমীর-ওমরাহ্ই খুশি। ভাবখানা যেন—বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে,—সবাইকে যেমন চোখ রাঙাতে! এখন কেমন মজা! এবার গড়াতে গড়াতে নীচে নাব, আমরা প্রাণভরে একবার দেখি……

হিন্দু প্রজারাই কি কম খুশি? রাজ্যে এখন কাদের প্রাধান্য? রাজপুতদের। এই রাজপুতরাই তো ঝিলামের তীরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে নূরজাহানের বাহিনীকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করেছিল। বীর বটে রাজপুতানার ছেলেগুলি।

অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য মহাবৎ খাঁ সত্যিই মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন। আভ্যন্তরীণ সবকিছু এখন হাতের মুঠোয়। চারদিকে যে সমস্যাগুলি এতদিন কাঁটার মতো খোঁচাচ্ছিল, সেগুলিও ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ল। এই সময়ে দক্ষিণের বাঘ মালিক অম্বর মারা গেলেন, কান্দাহার চলে যাওয়াতে উত্তর-পশ্চিমেও খুব একটা দুবদবা ছিল না। ওদিকে শাহ্জাহান পরাজয় স্বীকার করেছেন, দুই ছেলে দারা ও আওরংজেবকে আগ্রার দিকে পাঠাচ্ছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। মহাবৎ খাঁ আগ্রার সুবাদার মুজাফ্ফর খাঁকে সেদিকে খরদৃষ্টি রাখতে আদেশ দিয়েছেন। ব্যস, আর চাই কি? মহাবতের সামরিক জীবনে যা কিছু কামনা-বাসনা, তার আর কিছু বাকি রইল না। মহাবৎ খাঁ এতদিন পরে সত্যিই তাঁর পাওনা সম্মানটুকু সুদে-আসলে আদায় করে নিলেন।

মহাবৎ খাঁ মুঘল সাম্রাজ্যে সর্বশক্তিমান হলেন বটে, কিন্তু রাজনীতিতে তিনি পিছিয়ে ছিলেন। সেখানে তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে পারলেন না, দূরদৃষ্টির অভাব ছিল বলেই পারলেন না। নইলে

যে যোগ্যতা নিয়ে তিনি সম্রাটকে বন্দী করেছিলেন, নূরজাহান-আসফ খাঁকে জব্দ করেছিলেন,—সে যোগ্যতা দিয়ে তিনি রাজাকে কঠিন শাসন-শৃঙ্খলায় বেঁধে রাখলেন না কেন? কেন তিনি রাশ টেনে ধরলেন না নিজের রাজপুতদের? যুদ্ধে জয়লাভের পর বিজয়ী সৈন্যদল একটু-আধটু ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে ঠিকই। কিন্তু বাড়াবাড়ি করলে তো প্রতিবাদ আসবেই। উপরন্তু মহাবতের এতটা শক্তি-বৃদ্ধিতে আমীর-অভিজাতরা যে ঈর্ষাতুর হবেন এ-ও তো স্বাভাবিক। মহাবৎ কেন এই সমস্যাগুলি আগের থেকে ভেবে রাখেন নি? রাজনীতির চাল যে কত বক্র, এই জ্ঞানটা মহাবতের ছিল না।

সুতরাং গোলমাল বাধল অচিরে, আর সেই সুযোগে নূরজাহান আবার দৃপ্ত দুটি চোখ মেলে তাকালেন সামনের দিকে। সব কটি ভাবী ঘটনা যেন প্যানোরমিক পটে ফুটে উঠল। নূরজাহান সে দৃশ্য কল্পনা করে খুশি হলেন। সামনে এখন অনেক কাজ, পর পর সাজানো রয়েছে। একটা-একটা করে সারতে হবে। প্রথম কাজ সম্রাটের মুক্তি, নিজের মুক্তি। মহাবৎকে কেন্দ্র করে তাঁর চারদিকে যেভাবে ঈর্ষার পাহাড় জেগে উঠেছে—তাতে আশু মুক্তি সম্বন্ধে নূরজাহানের কোন চিন্তা নেই। আর, একবার মুক্তি পেলে আগের শক্তি ছিনিয়ে নিতে কতক্ষণ?

সুযোগ আসতে বেশী দেরি হল না। মহাবৎ খাঁয়ের রাজপুত সৈন্যদের সঙ্গে সম্রাটের 'আহ্‌দী' সৈন্যদের অচিরেই কথা কাটাকাটি ঝগড়াঝাঁটি মারামারি শুরু হল। রাজপুতরা কাবুলে গিয়েই স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ একদিন তাদের মধ্যে কয়েকজন সম্রাটের জন্য নির্দিষ্ট একটি শিকার-ভূমিতে কয়েকটি ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে এল চরে খাবার জন্য। রাজপ্রহরী আহ্‌দীরা বাধা দিল। প্রথমে বকাবকি থেকে হাতাহাতি, মারামারি—তারপর একজন আহ্‌দী মরেই গেল। বাকি আহ্‌দীরা মহাবতের কাছে গিয়ে নালিশ জানাল, অপরাধের শাস্তি চাইল। মহাবৎ খাঁ একটু যেন নির্বিকার নির্লিপ্তভাবেই

বললেন, বেশ তো, ঠিক কে কে অপরাধী দেখিয়ে দিলেই তিনি শাস্তি দেবেন।

আহ্‌দীরা বুঝল, মহাবৎ খাঁ রাজপুত সৈন্যদের বিরুদ্ধে নালিশ গায়ে মাখলেন না। ঠিক আছে। এর প্রতিশোধ আহ্‌দীরা নিজেরাই নেবে—দেখা যাক।

ওরা দেখে নিল পরের দিনই। ওরা আচম্‌কা ঝাঁপিয়ে পড়ল অপ্রস্তুত ও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে-থাকা রাজপুতদের ওপর। আটশ'র ওপর রাজপুত সৈন্য মারা গেল, মারা গেলেন মহাবতের অতি বিশ্বস্ত দক্ষ কয়েকজন সেনাপতি বন্ধু। প্রায় পাঁচ শ'র মতো রাজপুতকে বন্দী করে চালান করা হল হিন্দুকুশের ওদিকে, সেখান থেকে ক্রীতদাস হয়ে তারা চলে গেল নানা দিকে।

যাকে বলে একেবারে হাড়ির হাল হওয়া, রাজপুতদের তাই হল। লজ্জা অপমানের আর সীমা রইল না।

আনন্দ ও খুশির সীমা থাকল না নূরজাহানের, তাঁর বুদ্ধির যন্ত্র আবার সক্রিয় হয়ে উঠল, আবার তিনি অঙ্ক কষতে শুরু করলেন।

এবার মহাবৎকে ভোলাতে হবে। সম্রাট-সম্রাজ্ঞীর ওপর যেন এতটুকু সন্দেহ না থাকে, এমনভাবে মহাবৎকে ভোলাতে হবে। আর যাবতীয় অভিজ্ঞদের দলে টানতে হবে। তা হলেই কাজ ফতে হবে।

'তোমাকে যে আমি কি বলে ধন্যবাদ দেব, আমি নিজেই ভেবে পাই না······' হঠাৎ সম্রাটের এই ধরনের কথায় মহাবৎ বিস্মিত হন।

'তুমি তো জান না, ঐ নূরজাহান, আর তার ভাই আসফ খাঁ আমাকে দু'দিক থেকে এতদিন যেন সাঁড়াশির মতো চেপে রেখেছিল। ছটফট করেছি কতক্ষণে ওদের কবল থেকে মুক্তি পাব, একটু হাঁপ ছেড়ে মানুষের মতো বাঁচব······তা শেষ পর্যন্ত তুমিই কিন্তু আমাকে

উদ্ধার করলে, তোমার কাজের জন্য নিশ্চয়ই পুরস্কার পাবে…' সম্রাটের কথায় বিস্ময়ের ভাব কেটে গিয়ে এবার মহাবৎ মুগ্ধ হন, কৃতজ্ঞতায় ভরা ছলোছলো দৃষ্টিতে তিনি সম্রাটের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। এতদিন ধরে সম্রাটের কাছ থেকে এই স্বীকৃতি-টুকুই তো তিনি চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন—সম্রাট তাঁকে বুঝবেন, তাঁর কর্মশক্তির সত্যিকারের মূল্য দেবেন।

'তোমাকে তো এতদিন বলি নি, বলবার সুযোগ পাই নি। ঐ যে নূরজাহানকে দেখছ, মেয়েমানুষ হলে কি হবে, তলায় তলায় একটি আস্ত ষড়যন্ত্রবাজ। এমন কি তোমার বিরুদ্ধেও ও যা পাকিয়ে তুলছে না, কি আর বলব, যে-কোন মুহূর্তে তোমার প্রাণপাখী খাঁচা খুলে বেরিয়ে যেতে পারে। খুব সাবধান…'

সম্রাট এত সমস্ত গোপন কথা মহাবৎকেই বললেন? মহাবৎ সম্রাটের এত বিশ্বাসভাজন, এত কাছের মানুষ! মহাবতের বুক ফুলে উঠল গর্বে আর আনন্দে। সম্রাট এতদিন ধরে এই দুঃখ অভিযোগ একা একা সহ্য করেছেন? ভাগ্যিস মহাবৎ নূরজাহানের ওপর রেগেছিলেন, তাই না সম্রাটের উদ্ধার সম্ভব হল! সম্রাটের মনে এত কষ্ট, এত ব্যথা! মহাবৎ তো কই, এতদিন টের পান নি! আর পাবেন কি করে? নরজাহান কি মহাবৎকে সম্রাটের কাছে যেতে দিয়েছেন, না একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে দিয়েছেন?

মহাবৎ জাহাঙ্গীরের চারপাশে কড়া পাহারা তুলে দিলেন, বিধি-নিষেধ অনেকখানি শিথিল করলেন। এতদিন নূরজাহান-আসফ খাঁর কাছে সম্রাট প্রায় বন্দীভাবেই দিন কাটিয়েছেন। এখন মহাবতের কাছে এসে যখন একটু হাঁপ ছাড়তে পেরেছেন, তখন আর পাহারায় এত কড়াকড়ি কেন? আর এইভাবে থাকতে পেয়ে সম্রাট যে খুশি হয়েছেন, সে তো সম্রাটের হাবভাব চলাফেরা দেখলেই বোঝা যায়। কি আনন্দ হুল্লোড় করেই না তিনি প্রায় প্রতিদিনই শিকার করতে যাচ্ছেন, নানা জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছেন। সঙ্গে অবিশ্যি নূরজাহানও

থাকেন। যতই যাই হোক—তাঁকে তো আর ফেলে দিতে পারেন না!

মহাবৎ সত্যিই নিশ্চিন্ত হলেন, বেশ একটা আত্মতৃপ্তিতে সমস্ত শরীর মন জুড়িয়ে গেল।

মহাবৎ খাঁ এতদিন পরে তাঁর স্বপ্ন ও সাধনাকে সফল হতে দেখে মাটিতে আর পা ঠেকাতে পারছিলেন না। সম্রাট যাঁর হাতের মুঠোয় তার আবার ভয় কি? এ দুনিয়ার কাউকে তিনি গ্রাহ্য করেন না। আমীর ওমরাহ্, সেনাপতি কর্মচারী, সামন্ত-উপসামন্ত—মহাবৎ খাঁ সবাইকে যেন কড়ে আঙুলে নাচাতে লাগলেন। তিনি যা আদেশ করবেন তা যেন সকলে বর্ণে বর্ণে মেনে চলে। নইলে তারা টের পাবে মহাবৎ খাঁ এখন কতখানি শক্তি ধরেন, এখন তাঁর কতখানি ক্ষমতা। মহাবৎ খাঁর সগর্জন আদেশে, সদম্ভ চলাফেরায় সব যেন কাঁপতে লাগল—অজানা ভবিষ্যতের আশঙ্কায় সকলে শিউরে উঠল।

শিহরণ জাগল নূরজাহানের দেহে মনে। এই তো তিনি চেয়েছিলেন, বুদ্ধির চরম খেলা তিনি দেখিয়ে যাচ্ছেন। নূরজাহানের গোপন নির্দেশে জাহাঙ্গীর যদি মহাবৎকে অত ঝুড়ি ঝুড়ি মিষ্টি কথা, স্তোকবাক্য না বলতেন—'তুমিই আমাকে নূরজাহান আর আসফ খাঁর হাত থেকে বাঁচিয়েছ, তুমি আমার কত বড় উপকারী বন্ধু…' —এ কথা মহাবৎ যদি জাহাঙ্গীরের কাছে বার বার শুনে মুগ্ধ না হতেন, তা হলে কি মহাবৎ এতদূর এগিয়ে, এত কাণ্ড করে, তারপর এত বড় একটা ভুল করতেন? মুখের কথায় ভুলে গিয়ে সম্রাট-সম্বন্ধে অত শৈথিল্য দেখাতেন, না হঠাৎ উঁচুতে উঠে সকলের সঙ্গে এত উদ্ধত ব্যবহার করতেন? সব কিছুর মধ্যে যে নূরজাহানের কতবড় জাদুর খেলা রয়েছে, তা তাঁর মাথায় ঢুকল না, আশ্চর্য! আরও আশ্চর্য, তিনি টের পেলেন না, তাঁর রাজপুত সৈন্যের সংখ্যা কেমন দিনে দিনে কমছে, আর সম্রাটের সৈন্যসংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে!

ইতিহাসে বিরল এমন এক দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে নূরজাহান

মহাবতের চারদিকে জাল বিছিয়েছিলেন। যেখানে যা দরকার—কখনো মিষ্টি কথায়, কখনো টাকা দিয়ে তিনি সৈন্য ভাঙিয়েছেন, সৈন্য যোগাড় করেছেন। সেনাপতিদের বিভিন্ন জায়গায় একেবারে 'রেডি' করে রেখেছিলেন। লাহোরে খোজা অনুচর হুসিয়ার খাঁকে খবর পাঠালেন দু'হাজার বাছাইকরা সৈন্য নিয়ে সম্রাটের শিবিরের দিকে এগিয়ে আসতে। কারণ ইতিমধ্যে সম্রাট সদলবলে রওনা দিয়েছিলেন লাহোরের দিকে।

যাত্রাপথেও সম্রাট মহাবতের কানে গুনগুন করে কত কি বলতে বলতে গেলেন।

সত্যি এত দিন ধরে ঐ মহিলার হাতে সম্রাট কী নিগ্রহই না ভোগ করেছেন—মহাবৎ মনে মনে ভাবলেন।

হুসিয়ার খাঁয়ের সৈন্যদল রোটাসের কাছে এগিয়ে এল। আর মাত্র যখন একদিনের পথ—হঠাৎ সম্রাটের আদেশ হল, আশ্বারোহী সৈন্যেরা অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হোক, সম্রাট তাদের পরিদর্শন করবেন। শুধু নিজের সৈন্যই নয়, সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের সৈন্যবাহিনীকেও তিনি দেখবেন। তারা যেন সব সম্রাট-শিবিরের সামনের দরজা থেকে লম্বা সার বেঁধে রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের মাঝখান দিয়ে গিয়ে সম্রাট সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করবেন।

তা দেখবেন, সম্রাট যদি তাঁর সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করেন, তা হলে এতে আপত্তির কি আছে? মহাবতের কাছে জাহাঙ্গীর খবর পাঠালেন, তিনি যেন তাঁর সৈন্যদের কুচকাওয়াজ সেদিনটির জন্য বন্ধ রাখেন, তাঁর সৈন্যদলকে যেন সেদিন এদিকে আসতে না দেওয়া হয়—যদিই দু'দলে আবার খিটিমিটি মারামারি শুরু হয়ে যায়! এর আগে তো সম্রাট ও মহাবতের সৈন্যদের মধ্যে এরকম ব্যাপার কয়েক বারই হয়ে গেছে। কি দরকার অনর্থক গোলমালের সুযোগ করে দেওয়া? শুধু পরিদর্শনের দিনটি বই তো নয়।

আর একটি কথা—মহাবৎ খাঁ নিজেও যেন একটু এগিয়ে গিয়ে

দূরে দূরেই থাকেন। ঐ পরিদর্শনের ব্যাপারে ওঁর আর উপস্থিত থেকে দরকার নেই।

এই আদেশ দিয়ে সম্রাট মহাবতের কাছে দু'বার লোক পাঠালেন। প্রথম বার বুলন্দ খাঁকে, দ্বিতীয় বার খাজা আবুল হাসানকে। খাজা আবুল হাসান যেন একটু তীব্র উদ্ধত ভাষায় মহাবৎকে সম্রাটের আদেশ জানালেন। আর ঠিক এর পরেই মহাবৎ খাঁয়ের পায়ের তলার মাটি দুলে উঠল। চারদিকে সব কিছু অন্ধকার হয়ে এল। ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি বুঝতে পারলেন, সম্রাট জাহাঙ্গীর এতদিন ধরে কি ভাবে মিষ্টি কথার জাদুতে তাঁকে নির্বোধ করে রেখে দিয়েছিলেন, আর এই জাদু খেলার পেছনে কার জাদুদণ্ডের ইঙ্গিত ছিল! এতদিন ধরে তিনি শুধু তীরে বসে ঢেউ গুণেছেন, জলের গভীরে ষড়যন্ত্রের যে কি বিরাট পর্বত গড়ে উঠেছিল তা তিনি একবার টেরও পান নি। নূরজাহানের বুদ্ধি আর চাতুরীর সত্যিই সীমা নেই, তুলনা নেই। অসুস্থ অশক্ত স্বামী, যুদ্ধে পরাজয়, বিপর্যস্ত সৈন্য—তবু নূরজাহান তাঁর ক্ষমতার যোগ্যতা আর মেধার পরিচয় দিতে পিছিয়ে যান নি।

মহাবৎ খাঁ একবার শুধু দেখলেন, নিজের সৈন্য দিয়ে নিজেদের বেষ্টন করে জাহাঙ্গীর-নূরজাহান তাদের দলবল নিয়ে কীভাবে কত সহজে মহাবৎ খাঁয়ের হাত ছাড়িয়ে মুক্তি পেয়ে গেলেন, অতিরিক্ত বিশ্বাস করার ফলে জীবনের সঙ্কট মুহূর্তে মহাবৎ খাঁ কী ভাবে ঠকে গেলেন।

নূরজাহানকে এর আগে তিনি কতটুকু চিনেছিলেন? চিনলেন এখন।

মহাবৎ খাঁ কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে রইলেন, তারপরেই চট্ করে উঠে দাঁড়ালেন—আর সময় নেই। নূরজাহান ঝিলামের অপমান সহজে ভুলবেন না। নূরজাহানের ক্রোধের আগুন লেলিহান জিহ্বা মেলে তাঁকে ধরল বলে! আর বসে থেকে ভাবলে চলবে না। শুধু প্রাণটুকু যদি বাঁচাতে হয় তো—এই বেলা।

মহাবৎ খাঁ কখন যে ঘোড়া ছুটিয়ে কোথায় চলে গেলেন, অনেকক্ষণ কেউ তা টের পেল না, যখন পেল, তখন পিছু পিছু ধাওয়া করেও কেউ তাঁর নাগাল পেল না। অনুসরণকারীরা ফিরে এল, হাঁপ ছেড়ে বলল, বাবাঃ, বাতাসের আগে লোকটা ছোটে…।

সব চাইতে ভাবনার কথা, মহাবৎ শুধু একা যান নি, সঙ্গে নিয়ে গেছেন আসফ খাঁ, তাঁর ছেলে আবু তালিব, দানিয়েলের দুই ছেলে আর ক'জনকে। মহাবৎ খাঁ এখন পালিয়ে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু একবার যে তিনি জাহাঙ্গীর-নূরজাহানের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন তার প্রমাণ রাখা চাই তো। আসফ খাঁকে ধরে নিয়ে গেলে লোকে তবু মহাবৎ খাঁয়ের 'ক্যু দ্য মঁ'-তে বিশ্বাস করবে। তা ছাড়া নূরজাহানও একটু সীমার মধ্যে থাকবেন।

ওদিকে সম্রাট শোভাযাত্রা করে বিজয়োল্লাসে পৌঁছলেন রোটাসে। সেখানে বিরাট করে দরবার বসল, সম্রাট তাঁর পূর্ণ মহিমা ফিরে পেলেন।

'ফিরে পেলাম তোমার জন্য। তোমার বুদ্ধিই আমার শক্তি।' জাহাঙ্গীরের সপ্রশংস দৃষ্টিতে নূরজাহান গর্বিত হন, একটু লজ্জাও পান।

নূরজাহানকে দেখে দেখে জাহাঙ্গীর এখনও চোখ ফেরাতে পারেন না। আশ্চর্য! চাঁদের ক্ষয় আছে, ক্ষয় নেই শুধু নূরজাহানের রূপের! সে রূপে এখনও পূর্ণিমার ঐশ্বর্য! কে বলবে নূরজাহান প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পৌঁছেছেন। অনেক ক'টি বছর তিনি পেরিয়ে এসেছেন!

রোটাসে থাকতেই নূরজাহান মহাবতের কাছে খবর পাঠালেন—মহাবৎ খাঁ যেখানে যান, কিন্তু যাঁদের ধরে নিয়ে গেছেন, তাঁদের যেন অবিলম্বে ছেড়ে দেন। নইলে কথা বাড়ালে তাঁরই বিপদ। নূরজাহান সেনাবাহিনী পাঠাতে দেরী করবেন না।

মহাবৎ খাঁ বলে পাঠালেন, উনি দানিয়েলের ছেলেদের পত্রপাঠ

বিদায় দেবেন, কিন্তু আসফ খাঁ আর তাঁর ছেলেকে ছাড়তে একটু সময় নেবেন। যতক্ষণ না তিনি নিজে লাহোর পার হয়ে নিরাপদ জায়গায়—অর্থাৎ নূরজাহানের আওতার বাইরে যেতে পারছেন, ততক্ষণ বন্দী জামিন বাপবেটাকে তিনি ছাড়তে পারবেন না।

উত্তর শুনে নূরজাহান তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। ফের খবর পাঠালেন, মহাবৎ খাঁ ভাল চান তো এখুনি যেন আসফ খাঁকে ছেড়ে দেন, নইলে তাঁর কপালে চরম দুঃখ আছে···

মহাবৎ খাঁ আসফ খাঁয়ের কাছ থেকে বিশ্বস্ততার প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দিলেন, ছাড়লেন না আবু তালিবকে। আরো কিছু দূর এগিয়ে সিন্ধু দেশে তট্টার কাছাকাছি গিয়ে তবে তাঁকে মুক্তি দিলেন।

মহাবৎ খাঁকে এমনি করে হঠিয়ে দিয়ে চলে যেতে বাধ্য করে নূরজাহান গলায় আর একবার বিজয়মালা পরলেন।

শাহজাহান দক্ষিণে থাকতেই শুনেছিলেন মহাবতের 'ক্যু দ্য ম''। উত্তরের এই খবরটি শুনেই তিনি চমকে উঠেছিলেন। শাহজাহানের সঙ্গে ছিল এক হাজার অশ্বারোহী। এই সংবাদ পেয়ে এবং সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে শাহজাহানের দেহে আবার একবার আশার বিদ্যুৎ খেলে গেল। মোহিনী রূপ নিয়ে এই তো আবার এক সুযোগ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে! জাহাঙ্গীর আর নূরজাহানের সামনে উত্তাল ঝিলামের ঘূর্ণিজলকে তিনি তো ঘোলা করে দিতে পারেন! আর একবার কপাল ঠুকতে দোষ কি? তবে তার আগে যোগাড়যন্ত্র করা চাই। হাজার সৈন্যের ওপর আরও অনেক সৈন্য অনেক অস্ত্র চাই। তবেই না মনের আশাকে তিনি রূপ দিতে পারবেন!

কিন্তু দুর্ভাগ্যের খেলা শুরু হল গোড়া থেকেই। যাও-বা হাজার অশ্বারোহী সঙ্গে ছিল, সেনাপতি ও বিশ্বস্ত বন্ধু কিষণ সিং মারা যেতে

তাদের অর্ধেক এদিক ওদিক চলে গেল। উপরন্তু শাহ্‌জাহান যে ভেবেছিলেন পথে তিনি অনেক সৈন্য পেয়ে যাবেন, দলে দলে লোক এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়বে, তিনি তাদের নিয়ে বিরাট বাহিনী গড়ে তুলবেন, বিজয়োল্লাসে এগিয়ে যাবেন, আর সোনার আপেলটি টুক করে পেড়ে নেবেন—সে সব স্বপ্ন ভেঙে গেল, কিছুই হল না। কেউ তাঁর সৈন্যদলে নাম লেখাল না। মাত্র পাঁচশ'টি সৈন্য নিয়ে তিনি তট্টাতে গিয়ে হাজির হলেন। গিয়ে দেখলেন, নূরজাহানের একজন অতি বিশ্বস্ত সেনাপতি তট্টা দুর্গের অধিপতি হয়ে আছেন। সেখানে আছে ভারী ভারী অস্ত্র, হাজার হাজার সৈন্য। সাধ্য কি শাহ্‌জাহান তট্টা দুর্গের ধারে কাছে যেতে পারেন।

শাহ্‌জাহান স্থির করলেন, এখানে যখন ঠাঁই হল না, কোন সুবিধে হল না, তখন হিন্দুস্থান ছেড়ে চলে যাবেন দূরে—পারস্যে। শাহ্ আব্বাসের কাছে না হয় একবার সাহায্যের জন্য আবেদন করবেন। এতে তো কোন দোষ নেই। শাহ্‌জাহানের প্রপিতামহ হুমায়ুনের ভাগ্যও তো তাঁকে নিয়ে এই ভাবেই নাকানিচুবানি খাইয়েছিল, পারস্যের কাছ থেকে সাহায্য নিয়েই তো তিনি আবার হিন্দুস্থানে এসে ভাগ্য ফিরিয়েছিলেন।

শাহ্‌জাহান পারস্যে যেতে চাইলেন বটে, কিন্তু তাঁর সৈন্যেরা চাইল না। তারা সাহসের সঙ্গে প্রাণের বিনিময়েও তট্টা দুর্গ অধিকার করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। কিন্তু ইচ্ছেকে কাজে ফলানো তো সহজ ব্যাপার নয়। ঐ সামান্য সৈন্য আর নামে মাত্র অস্ত্র গোলা-বারুদ নিয়ে আর যাই হোক, তট্টার মতো দুর্গ জয় করা যায় না।

শাহ্‌জাহানের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, মন ততোধিক খারাপ। পারস্যে যাওয়ার পরিকল্পনা এমনিতেই তাঁকে ত্যাগ করতে হল। সব দিকেই যখন হতাশার পাহাড় জমে উঠেছিল, ঠিক সেই সময়ে আবার দুটি খবর এসে পৌঁছল—একটি খবর, পরভেজ মরণাপন্ন, আর একটি খবর—মহাবতের পরাজয়। শাহ্‌জাহানের কাছে দুটো

সংবাদেরই গুরুত্ব ছিল। পরভেজ ছিলেন শাহ্জাহানের প্রতিদ্বন্দ্বী, সিংহাসনের সম্ভব উত্তরাধিকারী, আর অন্যদিকে মহাবৎ পরাজিত, এখন তিনি নিশ্চয়ই শাহ্জাহানের প্রীত্যর্থী—তাঁর সাহায্য ও বন্ধুত্ব-কামী। আর তাই যদি হয়, তা হলে শাহ্জাহান আর একবার বুক বেঁধে নিশ্চয় দাঁড়াবেন।

শাহ্জাহান গুজরাট ও বেরারের ভেতর দিয়ে আবার দক্ষিণে চলে গেলেন। ক'দিন ধরে ভুগে ভুগে এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, এবার আর ঘোড়ার পিঠে চেপে যেতে পারলেন না, অসুস্থ দেহ নিয়ে পালকিতে চড়ে গেলেন।

গুজরাটে গিয়েই শুনলেন পরভেজ মারা গেছেন।

ইতিহাসে লেখা রয়েছে, পরভেজ তাঁর কাকাদের মতোই মদ খেয়ে খেয়ে মারা গেছেন। সুতরাং তাঁর মৃত্যু ছিল স্বাভাবিক, বেশী মদ খাওয়ার অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু বেশ কয়েক বছর পরে বৃদ্ধ শাহ্জাহানকে লেখা আওরংজেবের চিঠি মনের মধ্যে সন্দেহের বিষ ঢুকিয়ে দেয়। আওরংজেব তাঁর বন্দী পিতাকে একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন,—'সিংহাসনে বসবার আগে খসরু আর পরভেজ, যারা আপনার কোন ক্ষতি করে নি, তাদের মেরে ফেলেছিলেন; সেই ঘটনার স্মৃতি এখন কেমন মনে হয়?'—এই ঘটনার মূলে কোন্ গূঢ় রহস্য রয়েছে কে জানে! গোটা মুঘল ইতিহাসটাই তো এই ধরনের ঘটনায় পূর্ণকুম্ভ!

শেষ কয়েকমাস ধরে পরভেজ মৃত্যুর নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। মদ খেতে খেতে তো আগের থেকেই দেহ মন জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তার ওপর ধরল নিদারুণ শূল রোগে। তারপর ধীরে ধীরে সব কিছু থেকে পরভেজ বোধশক্তি রহিত হয়ে পড়লেন, গভীর ঘুমে তিনি অচেতন হয়ে রইলেন। চেতনা ফিরিয়ে আনার জন্য হেকিম ডাক্তারেরা পরভেজের ওপর আসুরিক চিকিৎসা প্রয়োগ করলেন। কপাল ও মাথার বিভিন্ন জায়গায় তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা

দিয়ে দিয়ে দেখা হল তীব্র যন্ত্রণায় রাজকুমারের ঘুম ভাঙে কি না,—চেতনা ফিরে আসে কি না। কিন্তু সব বৃথা। যন্ত্রণা সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে মাঝে মাঝে মুহূর্তের জন্য চেতনা ফিরে এলেও অবশেষে ১৬২৬ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে আটত্রিশ বছর বয়সে পরভেজের মৃত্যু হল।

শাহ্‌জাহান আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে গিয়ে পৌছলেন নাসিকে, সেখানে কিছু জিনিসপত্র রেখে আর একটু দূরে থাইবার নামে একটা জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন, আর এখানে আসবার পথেই মহাবৎ খাঁর কাছ থেকে প্রস্তাব এল—আমাকে মিত্র বলে গ্রহণ করুন, আমি বিশ্বস্ত ও অনুগত হয়ে আপনার সব কাজে সাহায্য করতে প্রস্তুত…। কারণ ইতিমধ্যে মহাবৎ অসহায় ও সর্বহারা হয়ে পড়েছিলেন। যে মুহূর্তে তিনি আসফ খার ছেলে আবু তালিবকে মুক্তি দিয়েছিলেন, সেই মুহূর্ত থেকে নূরজাহান এক বিরাট সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তাঁকে ধরবার জন্য এখান থেকে ওখানে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।

আরও বিপদ হল যখন বাংলাদেশ থেকে যোগাড়যন্ত্র করে নিয়ে-আসা মহাবতের কত আশার বাইশ লক্ষ টাকা দিল্লীর কাছাকাছি এসে লুঠ হয়ে গেল। নূরজাহানের নির্দেশেই এই ব্যাপার ঘটেছিল। তিনি আগের থেকেই জানতে পেরেছিলেন বাংলাদেশ থেকে মহাবৎ খাঁ টাকার যোগাড় করেছেন, আর ঐ টাকার সাহায্যে আবার তিনি দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন। নূরজাহানের খর দৃষ্টি এখন চারদিকে।

মহাবৎ আশ্রয় নিলেন মেবারে, সেখান থেকে শাহ্‌জাহানকে খবর পাঠালেন—তিনি শাহ্‌জাহানের প্রীত্যর্থী, তাঁর বন্ধুত্বকামী।

শাহ্‌জাহান অন্তরের সমস্ত আগ্রহ দিয়ে মহাবৎকে স্বাগত জানালেন, দু'জন দু'জনের সাহায্যের আশায় আবার বেঁচে উঠলেন। দু'হাজার অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে মহাবৎ শাহ্‌জাহানের সঙ্গে দেখা করলেন। মৈত্রীর নিদর্শন স্বরূপ মহাবৎ খাঁ শাহ্‌জাহানকে দিলেন বিশ হাজার টাকা দামের একটি হীরে, হাজারটি মোহর আর কিছু

মূল্যবান উপহার। বিনিময়ে শাহ্জাহান মহাবৎকে দিলেন একটি হাতী, একটি ঘোড়া, মূল্যবান পাথরবসানো তলোয়ার ও একখানি ছোরা। কিছুকাল আগের দুটি পরম শত্রু রাজনীতির কটাক্ষে হলেন পরম মিত্র।

এ মৈত্রীর খবরটি যথারীতি পৌঁছল নূরজাহানের কানে, তাঁর মসৃণ কপালে আবার চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। এত কাণ্ড করেও এই দুই শত্রুর সমন্বয় বন্ধ করতে পারলেন না! কিন্তু পারতে তো হবেই। এই বন্ধুত্ব ছিন্ন করতে না পারলে নূরজাহানের ভাগ্য যে অন্য কথা বলবে!

সম্রাজ্ঞীর কড়া হুকুমে তৈরি হল বিরাট সেনাবাহিনী, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, শাহ্জাহান-মহাবৎ খাঁর বন্ধুত্বকে সমূলে নষ্ট করা, তাঁদের শক্তির দম্ভকে একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া…।

এদিকে জাহাঙ্গীর লাহোরের গরমে অস্থির হয়ে উঠলেন। কাশ্মীরের তুষার-বসন্ত তাঁকে হাতছানি দিল। ১৬২৭ খ্রীস্টাব্দে মার্চ মাসে নূরজাহান, আসফ খাঁ, শাহ্রিয়র ও অন্যান্য সবাইকে নিয়ে জাহাঙ্গীর কাশ্মীরের দিকে রওনা দিলেন।

জাহাঙ্গীর কাশ্মীরে পৌঁছলেন। কাশ্মীরের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ সম্রাটের নয়নাভিরাম, মর্ত্যের স্বর্গ। প্রকৃতি-পাগল সম্রাট মুগ্ধ হলেন, তাঁর রোগপাণ্ডুর মুখে আনন্দোচ্ছ্বাসের আভাস খেলে গেল। কিন্তু ক'দিনের জন্য! বাতাসের নিদারুণ অভাবে জাহাঙ্গীর আকুল আর্তনাদ করে উঠলেন। সমস্ত শরীর কুঁকড়ে গেল বুকটুকুর মধ্যে একটু বাতাস ছড়িয়ে দেবার জন্য। এবারকার হাঁপানী যেন বড় ভয়ঙ্কর হয়ে সম্রাটকে আক্রমণ করল। সমস্ত দেহ-মন দিয়ে সম্রাট রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। বাতাসের জীব একটু বাতাস পাবে না, একী জীবনঘাতী রোগ!

সম্রাটের মরণ-কাতরোক্তি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠল। বাতাস আর মানুষের টানাটানিতে বুঝি-বা প্রাণটুকু বেরিয়ে যায়। প্রতি দিনে পলে পলে সম্রাটের জীবনী-শক্তি কমে আসতে লাগল, তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। খাওয়া কমে গেল, শুধু কয়েক কাপ আঙুর রসের মদ—আর কিছু নয়। ডাক্তার-হেকিমের অনুরোধে জাহাঙ্গীর কেবল মাথা নাড়েন, আপত্তি জানান। নূরজাহানের আকুল প্রশ্নের উত্তর দেন—'কিছু খেতে চাই না, আমাকে শুধু একটু বাতাস দাও। বুকটা যে কান্দাহারের মরুভূমি হয়ে গেল…।'

নূরজাহান ঠোঁট টিপে বসে থাকেন, শ্বেতপাথরের মতো মুখে ধৈর্যের দৃঢ়তা—স্থির শান্ত। বুকের মধ্যে আসন্ন ঝড়ের মত্ত হাওয়া। নূরজাহান অসুস্থ স্বামীর পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন, কপালে মাথায় হাতের পরশ বুলিয়ে দেন। আর তারই সঙ্গে সতর্ক সজাগ হয়ে ওঠেন, কোথাও চাপা কণ্ঠের কোন বাঁকা কথা শোনা যায় কি? রাজনীতির চোরা পথকে বিশ্বাস নেই। নূরজাহান অশান্ত হয়ে ওঠেন, কোথা থেকে কি আঘাত না জানি আসবে।

অশান্তির ধোঁয়া আরও পাকিয়ে ওঠে নূরজাহান যখন শাহ্রিয়রকে দেখেন। কী বীভৎস কুৎসিত চেহারা হয়ে গেছে নূরজাহানের একমাত্র জামাই শাহ্রিয়রের! কুষ্ঠের মতো কি এক দুর্দান্ত রোগে কেশবিরল মাথা, ভ্রূহীন কপাল, পক্ষ্মহীন চোখ, নির্লোম দেহ…মনে হয় না কোন মানুষ—ভাবলেশহীন রক্তমাংসের একটা চলমান পিণ্ড যেন! নূরজাহান শিউরে ওঠেন, হতাশায় ভেঙে পড়েন—যার অদৃষ্টে মানুষের সাধারণ চেহারাটুকুও পাওনা নেই, সে কি করে রক্ষা করবে নূরজাহানের সদম্ভ দাবী আর প্রতিপত্তি!

ডাক্তাররা শাহ্রিয়রের অনেক রকম চিকিৎসাই করলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি মানুষের স্বাভাবিক চেহারা ফিরে পেলেন না। ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন, কাশ্মীরের ঠাণ্ডায় না থেকে শাহ্রিয়র বরং

লাহোরের গরম আবহাওয়ায় বাস করুন, দেখা যাক কোন উপকার হয় কি না।

কিছু দিন পরে সম্রাটও তাঁর দলবল নিয়ে রওনা দিলেন লাহোরের দিকে। অসুস্থ শরীরে কাশ্মীরের শোভাও আর বেশী দিন ভাল লাগল না। পথে বরমগোলা বলে এক জায়গায় জাহাঙ্গীর একটু থামতে চাইলেন, তাঁর পুরনো শিকারের জায়গা। এই জরাজীর্ণ শরীরেও কেমন যেন এক উন্মাদনা জেগে উঠল শিকারের কথা মনে পড়ে।

'আমি শিকার করব, আয়োজন কর'—ক্ষীণকণ্ঠের ক্লান্ত আদেশে এখনও দম্ভের গর্জন। সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে শিকারের আয়োজনে ব্যস্ত হল।

স্বামীর শিকারের উদ্যমে নূরজাহানের মুখে হাসি ফুটল। তিনি আবার নোতুন আশায় বুক বাঁধলেন। সম্রাট ক্লান্ত, সম্রাট জীর্ণ—তবু তিনি বেঁচে থাকুন, নূরজাহান বেঁচে থাকুন।

শিকারের জায়গা বাছা হল। একটা বিরাট উঁচু পাহাড়ের সানুদেশ। শিকারের উদ্দেশ্যে তৈরি একটা দেওয়ালের ওপর বন্দুক রেখে সামনে ছুটে আসা হরিণের গায়ে নিপুণ লক্ষ্যে জাহাঙ্গীর গুলি করলেন, আর ঠিক সেই সময়ে ঘটনাটি ঘটল। শিকারের আয়োজনে ব্যস্ত একজন সৈন্য হঠাৎ পা পিছলে পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ল নীচে। কঠিন পাথরে দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে এই মাত্র হেঁটে-চলে-বেড়ানো মানুষটি তালগোল পাকিয়ে গেল। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ঘটল জাহাঙ্গীরের ভীতিবিস্ফারিত দুটি চোখের সামনে।

বৈচিত্র্যে ভরা ভয়াবহ শাস্তিতে মানুষকে তিল তিল মৃত্যুযন্ত্রণা দিয়ে যে জাহাঙ্গীর একদিন উল্লাসের হাসি হেসেছেন, সেই জাহাঙ্গীর চোখের সামনে হঠাৎ ঘটে যাওয়া এই মৃত্যু দেখে বিবর্ণ হয়ে উঠলেন। তাঁর সমস্ত দেহ মন কেঁপে উঠল, কাঁপতে কাঁপতেই আবার তিনি শয্যা নিলেন। আবার ডাক্তার-বদ্যির ভিড় বাড়ল, নূরজাহানের নিরলস

সেবা চলল। কিন্তু সম্রাট সবাইকে কি করে বোঝাবেন ঐ লোকটির মৃত্যুতে তিনি নিজের মৃত্যুর হাতছানি দেখেছেন, শুনেছেন মৃত্যু-দূতের নিঃশব্দ পদক্ষেপ—মৃত্যু-বিভীষিকা এগিয়ে আসছে, তার স্থির লক্ষ্য এবার হিন্দুস্থানের মালিক জাহাঙ্গীর।

অসহ্য যন্ত্রণায় জাহাঙ্গীর দুটি হাতে বুকখানা চেপে ধরলেন—আর রক্ষা নেই। বাতাস না পেয়ে এবার ফুসফুস দুটো বুঝি ছিটকে বেরিয়ে যাবে। সম্রাট চীৎকার করে উঠলেন, 'শীগগির তাঁবু গুটোও, আর এক মুহূর্তও এখানে নয়…'

পরের দিনই এসে পৌঁছলেন থানা নামে একটি জায়গায়, সেখান থেকে রাজৌরী, রাজৌরী ছেড়ে আবার ভীমবহরের দিকে এগিয়ে চললেন। নির্দিষ্ট জায়গায় আর পৌঁছতে পারলেন না, তার আগেই জাহাঙ্গীর কালের অমোঘ নির্দেশে থেমে গেলেন। মৃত্যুর যন্ত্রণায় তিনি শেষবারের মতো শয্যায় লুটিয়ে পড়লেন। সারা পৃথিবীর বাতাস বুঝি ফুরিয়ে গিয়েছিল, তাই প্রতি নিশ্বাসের টানে জাহাঙ্গীর তলিয়ে যাচ্ছিলেন কোন্ গহন আঁধারে!

চেতনা লুপ্ত হবার ঠিক আগের মুহূর্তে মৃত্যুর নীলিমায় ঘেরা চোখ দুটি সামান্য খুললেন, বিবর্ণ ঠোঁট একটু নড়ে উঠল—'একটু মদ'—সম্রাটের শেষ আজ্ঞা পালনে দেরি হল না। একপাত্র মদ নিয়ে আসা হল, মৃত্যুপথযাত্রীর মুখে মদটুকু ঢেলে দেওয়া হল, কিন্তু গলায় আটকে গেল, ঠোঁটের দু'পাশ বেয়ে সেটুকু গড়িয়ে পড়ল।

রাতের অন্ধকারে মৃত্যুর বিভীষিকা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। রাত কেটে গেল, পূব আকাশের গায়ে প্রভাত সূর্যের লাল আলো ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট জাহাঙ্গীর পরম ক্লান্তিতে চোখ বুজলেন। মুখে ধীরে ধীরে প্রশান্তি নেমে এল।

নূরজাহান দেখলেন, সম্রাটের আর কোন কষ্ট নেই, একটু বাতাসের জন্য নেই সম্রাটের সেই করুণ ভিক্ষা। সম্রাটের বুকে এখন শান্তি, সম্রাটের এখন চিরবিশ্রাম।

মুহূর্তের জন্য নূরজাহান সামনের দিকে দুটি হাত বাড়িয়ে কাকে যেন ধরতে চাইলেন, চোখের সামনে সব কিছু কেমন যেন ঝাপ্সা অস্পষ্ট হয়ে এল।

সেদিনটা ছিল ২৮শে অক্টোবর, ১৬২৭ খ্রীস্টাব্দ।

বেলা বাড়তে লাগল। এতক্ষণ স্থাণুর মতো স্থির হয়ে বসে-থাকা নূরজাহান হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। স্বামীর মৃত দেহটি দেখে চোখ জলে ভরে এল, চোখ মুছে ফেললেন। হুকুম দিলেন, গণ্যমান্য ওমরাহ্‌রা যেন এসে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, বিশেষ আলোচনা আছে। সম্রাট নেই, সম্রাজ্ঞী আছেন—এটা যেন ওঁরা ভুলে না যান।

আসফ খাঁ লোক দিয়ে বলে পাঠালেন, এখন কোন আলোচনারই দরকার নেই···।

তার মানে? নূরজাহান ফুঁসে উঠলেন। শোকাহত নয়, বজ্রাহত নূরজাহানের মুখে সেই আগেকার কাঠিন্য ফুটে উঠল।

আশ্চর্য!—আসফ খাঁর দূত আপন মনে বিড়বিড় করে উঠল।

'সম্রাটের মৃত্যুর পর সব রাজ্যপাট কি ভেসে যাবে যে, আসফ খাঁ আলোচনার দরকার নেই বলছে?' নূরজাহান ঘাড় বাঁকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

বোনের কথা শুনে ভাইয়ের ঠোঁটে বাঁকা হাসি খেলে গেল। তিনি আবার বলে পাঠালেন 'কে বলল রাজ্যপাট ভেসে যাবে? বরং আরো ভালো করে চলবে। তবে তোমার আর এই ব্যাপারে মাথা ঘামানোর দরকার নেই।'

নূরজাহানের মাথা কি টলে উঠল? পায়ের তলায় মাটি কি দুলে উঠল! শূন্য দৃষ্টিতে নূরজাহান সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমার রাজ্যের ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাবো না···?

আড়াল থেকে যেন আসফ খাঁ গর্জন করে উঠলেন, কে বলল

তোমার রাজ্য, তোমার ব্যাপার? এ রাজ্যের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর লোক এসে গেছে। এখন থেকে তুমি চুপ করে থাকবে। আজ ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার পালা শেষ হয়েছে। ঐ তোমার সামনে শুয়ে আছেন তোমার অতীত, ওখানেই তোমার সব কিছুর অবসান···তোমার কবর···

আসফ খাঁ খবর পাঠালেন, 'কিছু করতে যেয়ো না, যেখানে আছ, সেখানেই থাক। শাহ্জাহানের ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছি। আপত্তি নিশ্চয় নেই। এতদিন ওদের দেখাশোনা করেছ—অনেক, অনেক ধন্যবাদ।' আসফ খাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

সম্রাট দু'চোখ বুজলেই কি কি করতে হবে, আসফ খাঁ আগের থেকে সব একেবারে ছ'কে রেখেছিলেন। তাই একদিকে মৃতের সৎকার-ব্যবস্থা হতে লাগল, অন্যদিকে সেখানে বসেই খসরুর ছেলে দাওয়ার বক্স্‌কে সম্রাট বলে ঘোষণা করা হল, অনাড়ম্বর অথচ রাজকীয় কায়দায় তাঁর নামে খুত্‌বা পাঠ করা হল। ওদিকে বানারসী নামে একজন বিশ্বস্ত লোককে আসফ খাঁ ছুটিয়ে পাঠালেন দক্ষিণে শাহ্জাহানের কাছে···'বাপ গত হয়েছেন, শীগগির এস, সিংহাসনে দাওয়ার বক্স্‌কে বসিয়ে কোনমতে ঠেক্‌নো দিয়ে রেখেছি··· শীগ্‌গির···'

নূরজাহান সবই বুঝলেন, তিনি বিস্মিত হন নি। ভাইয়ের মনের খবর, শাহ্জাহান সম্বন্ধে তাঁর স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব—এ তো কিছুই অজানা ছিল না নূরজাহানের! তবে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর ঠিক পর-মুহূর্ত থেকেই আসফ খাঁ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন, ষড়যন্ত্র করবেন,—এতখানি নির্লজ্জতা নূরজাহান সত্যিই আশা করেন নি।

শোকের অশ্রু শুকিয়ে গিয়ে নূরজাহানের চোখে আগুন জ্বলে উঠল। শেষ পরীক্ষার চরম বিপদ এসে গেছে,—তবু নূরজাহান একবার শেষ চেষ্টা করবেনই। ক্ষমতার লাগাম অত সহজে ছাড়া যায় কি? চারদিকে শত্রু, আসফ খাঁ কড়া দৃষ্টি রেখেছেন বোনের

গতি ও কার্যবিধির ওপর। অনেক দিন মুখ বুজে ছদ্মবেশে বোনের খবরদারি সহ্য করেছেন। এত দিন পরে ভাগ্য সহায় হয়েছে, এই সুযোগ কখনও ছাড়া যায়?

আসফ খাঁ নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠলেন—হাজার হোক, মেয়েমানুষ তো! স্বামীর ওপর জোর ছিল, তাই এতদিন যথেচ্ছা ক্ষমতা ফলিয়েছ। স্বামী যখন চলেই গেছেন, আর কেন বাপু? ক্ষমতার লোভ ছেড়ে এবার পাততাড়ি গুটোও না! ভাল কথার পাত্রী তো তুমি নও! সব সময় টগবগ করে ফুটেই যাচ্ছ···

ওদিকে শতদৃষ্টি থাকলেও নূরজাহান এরই মধ্যে একটু ফাঁক পেয়ে শাহ্রিয়রকে লাহোরে খবর পাঠালেন—যত সংখ্যক সম্ভব সৈন্য নিয়ে সে যেন এক্ষুনি ছুটে আসে। একটু দেরি করলেই সব ফসকে যাবে।

লাহোরে খবর যাওয়া মাত্রই শাহ্রিয়রের এমনি একটা অভিষেক হল, তিনি নিজেকে মুঘল সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। করেই লাহোরের রাজকোষাগার অধিকার করলেন, আমীর-ওমরাহ্দের আনুগত্য ও বন্ধুত্ব লাভের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা বিলোলেন, সৈন্য যোগাড়ের চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু করলে হবে কি? আসলে তো যোগ্যতা থাকা চাই। শুধু টাকা দিয়েই কি সিংহাসন পাওয়া যায়? সিংহাসন কি কেনার জিনিস?

ইতিমধ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃতদেহ নিয়ে আসা হল লাহোরের কাছে শাহ্দারায়—সেখানে নূরজাহানের প্রিয় দিলখুসা উদ্যানে জাহাঙ্গীর সমাহিত হলেন।

ওদিকে আসফ খাঁও ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এলেন লাহোরে। সঙ্গে দাওয়ার বক্স্, আর এক সেনাবাহিনী। মুঘল শিবিরের সব ক'জন আমীর-ওমরাহ্ কর্মচারী পূর্ণ সমর্থন জানালেন আসফ খাঁকে, তাঁর প্রতিটি কাজকে। নূরজাহানের আদেশ আর দম্ভকে তাঁরা আর ভয় করেন না।

যুদ্ধ করবার জন্য শাহ্রিয়রও তৈরি হলেন—তিনিও এক সৈন্য বাহিনী সাজিয়ে নিয়েছেন। ভয় ভয় করছে, তবু নিজেকে সম্রাট বলে যখন ঘোষণা করা হয়েছে, তখন রুখে তো একবার দাঁড়াতে হবেই! সৈন্যরা যে কে কেমন যুদ্ধ করে তাও জানা নেই, প্রায় সবাই তো আন্‌কোরা আমদানি, আনাড়ী কিনা তারই বা ঠিক কি?

আসফ খাঁ লাহোরের কাছে এসে আক্রমণ শুরু করলেন। শাহ্রিয়র বাধা দেবার জন্য সৈন্য পাঠালেন বটে, তবে সব একেবারে কচুকাটা হয়ে গেল। দু'পক্ষের সৈন্যবাহিনীর যোগ্যতার মধ্যে আকাশপাতাল তফাত। আসফ খাঁ যুদ্ধ করেছিলেন জয় লাভ করবেন বলে, শাহ্রিয়র যুদ্ধ করেছিলেন লোকে কি বলবে বলে। শাহ্রিয়র খবর পেলেন তাঁর দলের লোকেরা—যারা তাঁর কাছে হাত পেতে টাকা নিয়েছে, তারাই বিশ্বাসঘাতকতা করে দুর্গের দরজা খুলে দিয়েছে। শত্রুরা দুর্গ আক্রমণ করেছে। শাহ্রিয়র আর নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না, ভীত মেয়েমানুষের মতোই হারেমে মেয়েদের ঘরে গিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন, বেতসপাতার মতো কাঁপতে লাগলেন, আর সেই কাঁপুনি অবস্থাতেই একজন খোজা তাঁকে টেনে বার করে নিয়ে এল একেবারে আসফ খাঁয়ের সামনে। প্রায় নাকে খত দেবার মতো নত হয়ে শাহ্রিয়র আসফ খাঁকে আনুগত্য জানাতে বাধ্য হলেন। এর পরেই তাঁকে ফেলে রাখা হল বন্দীশালায়, সেখানে কয়েকদিন পরে—মুঘল রাজনীতির ভয়ঙ্কর নিয়ম অনুযায়ী—শাহ্রিয়রের দুটি চোখ অন্ধ করে দেওয়া হল, শাহ্রিয়রের সিংহাসনের পথ রুদ্ধ হল, চিরকালের মতো রুদ্ধ হল নূরজাহানের উর্ধ্বগতিতে আকাশ-পরিক্রমা।

বানারসী মারফত খবর পেয়েই শাহ্জাহান উল্লাসে আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। কোথায় ভেবেছিলেন মহাবৎকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশে

যাবেন, সেখানে গিয়ে অনিশ্চিত হলেও ভাগ্যের সঙ্গে আর একবার লড়াই করে দেখবেন—খবর এল কিনা সিংহাসন সাজিয়ে রাখা হয়েছে, এখন শুধু তাঁর বসে পড়বার ওয়াস্তা। একেই বলে নসিব। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তাঁরই ইচ্ছেয় কর্ম, নইলে আসফ খাঁর মতো অমন শ্বশুর কটা মেলে?

চারদিন ধৈর্য ধরে শাহ্‌জাহান পিতার শোকপর্ব পালন করলেন, আর তার পরেই চোখের জল আর মনের দুঃখ শিকেয় তুলে রেখে ঝড়ের বেগে উত্তরে আগ্রার দিকে ধেয়ে গেলেন। গুজরাট, মেবার, আজমীর পার হয়ে শাহ্‌জাহান আগ্রায় পৌঁছলেন। সেখানে মহা-সমারোহে শাহ্‌জাহানকে বরণ করা হল, সকলের কণ্ঠ থেকে একযোগে আনন্দধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল—সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন···

আগ্রায় আসবার পথেই শাহ্‌জাহান আসফ খাঁকে খবর পাঠিয়েছিলেন···দাওয়ার বক্‌স্‌, শাহ্‌রিয়র আর যাকে যাকে মনে হয়, সবাইকে যেন একেবারে ফর্সা করে দেওয়া হয়, শাহ্‌জাহানকে যেন এদের মুখ পর্যন্ত না দেখতে হয়। শত্রুকে জিইয়ে রাখার কোন অর্থ হয় না।

তাই হোল—শাহ্‌জাহান যখন সিংহাসনে বসলেন, দেখলেন সব পরিষ্কার, তাঁর পথে বাধা দেবার জন্য একটি কুটো পর্যন্ত পড়ে নেই।

এবার এল খেলাত দেবার পালা। মহাবৎ খাঁ এবার সসম্মানে বহু উঁচুতে উঠে গেলেন। তিনি হলেন আজমীরের গভর্নর, তার সঙ্গে সিপাহ্‌-সালার, উপাধি হল খানখানা—মস্তবড় সেনাপতি।

অন্য দিকে আসফ খাঁ। তিনি হলেন উজীর—জামিন-উদ্‌-দৌলা। রাজ্যশাসনের অনেক ক্ষমতা তাঁর হাতের মুঠোয় এসে গেল।

এবার নূরজাহান।

আকাশচারী ফিনিক্‌স আজ ভগ্নপক্ষ, মৃত্তিকাশ্রয়ী। শাহ্‌জাহান হুকুম জারী করলেন, নূরজাহানের নাম লেখা প্রতিটি মুদ্রা এখন থেকে অচল। এতবড় সাম্রাজ্যে ঐ মুদ্রার আর কোন মূল্য নেই···

আর মূল্য নেই নূরজাহানের। দুনিয়ার আলো নূরজাহান এখন দীপ্তিহীন তামসী।

গুজব ছড়াল শাহ্জাহানের আদেশে নূরজাহান নাকি গতপ্রাণ—তাঁকে নাকি হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্যি নয়। শাহ্জাহান নূরজাহানকে প্রাণে মারেন নি···প্রাণে মারব না, শাস্তিও দেব না, কিন্তু মনে থাকে যেন, এখন থেকে অন্য জীবন,—নেপথ্যের জীবন কর্মহীন বিশ্রাম। বছরে দু'লাখ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করেছি। ওতেই খাওয়া পরা, ওতেই সব। চাঁদের দিকে যেন আর হাত বাড়ানো না হয়, খবরদার···

শাহ্জাহানের সদম্ভ আদেশে নূরজাহান স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

এরপর নূরজাহান চলে গেলেন। চলে গেলেন জালিকাটা পাথরের অনেক পেছনে, ইতিহাসের আড়ালে। ময়দানবের একটা যন্ত্র যেন আচম্কা বিকল হয়ে গেল, লক্ষ ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের একটি আলো যেন নিভে গেল।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর আরও আঠারটি বছর······প্রতি মুহূর্তে শুধু দিনযাপনের গ্লানি—শুধু পুঞ্জীভূত ক্লান্তি আর ফেলে-আসা জীবনের দিকে মাঝে মাঝে দৃকপাত, আর কিছু না। নির্জন জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী কন্যা লাডলী বেগম, দুঃখী স্বামীহারা লাডলী বেগম। মায়ের সঙ্গে তারও নিঃসঙ্গ জীবন কাটে। 'ন-সুদনী' শাহ্রিয়রের কোন্ স্মৃতিটুকু মনে করেই-বা লাডলী বেগম বেঁচে থাকবে!

বছর গড়িয়ে যায়, নূরজাহানের চোখের দৃষ্টি নিথর হয়ে আসে, সৌন্দর্যলক্ষ্মী নূরজাহানের কানের কাছে বেজে ওঠে—রণহুঙ্কার নয়, রংমহলের উচ্ছ্বাস নয়, ষড়যন্ত্রের ·পা কণ্ঠস্বর নয়—বেজে ওঠে মহাকালের অনাহত পদধ্বনি। ইহলোকের বিচিত্র নাটক শেষ হয়েছে······এবার চল, ছুটির নিমন্ত্রণ এসে গেছে।

নূরজাহান আপন মনে আবৃত্তি করেন কবিতা—ফার্সী বয়েত—রাজনৈতিক কোলাহলের ফাঁকে ফাঁকে নিভৃত অবসরে যেগুলি রচনা করেছিলেন—

কুসাদি ঘুঞ্চে অগর্ অজ্ নাসিম-ই-গুলজার অস্ত্।
কলদী-ই-কুফ্ল-ই-দিল্-ই-মা তবাস্সুম-ই-ইয়ার অস্ত্।
ন গুল শানাসদ্ নয়্ রংগ্-ও বুর ন আরিজ-ও জুল্ফ্।
দিল্-এ-কসি কে ব হুসন-ও-অদা গ্রিফ্তার অস্ত্।

মৃদু মন্দ বায়ে বাগিচার পুষ্পকুঁড়ি যেমন তার পাখা মেলে,
হৃদয়-দুয়ারের চাবিতে তেমনি প্রিয়জনের মুখে হাসি খেলে।
যার হৃদয় সৌন্দর্য ও লাবণ্যে অভিভূত, সে কখনো গ্রাহ্য করে না
গোলাপ, তার রং ও তার সুরভিকে।
সে বিচলিত হয় না মুখের সৌন্দর্যে ও কেশপাশে।

* * * *

তুরা ন তুকুম-এ-লাল অস্ত্ বার কিবা-এ হারীর।
শুদস্ত্ কাত্রা-ই-খুন-এ মনৎ গরিবান গীর।

তোমার রেশমী আঙরাখায় যে চুনিপাথর-বোতামটি
রক্তিম আভায় জ্বলে উঠেছে,
সেটি যে আমারই রক্তবিন্দু।

* * * *

নাম্-এ তু বর্দমো জদম্ আতীশ বজানে খিশ,
দর্ আতিশম্ চো শম্য জে দস্ত্-ই জবান-ই খিশ

তোমার নাম আমার জপমালা,
তোমার নামে আমার হৃদয়ে জাগে উদ্দীপনা,
জ্বলে ওটা বাতির মতোই
তোমার কথার ছোঁয়ায় আমি হই দীপ্ত।

* * *

বকৎল্-এ চুন মনীগর খাতিরৎ খুশনূদ মী গরদদ্।
বজায়ঁ মিন্নৎ ওয়ালি টেঘ্-ই-তু দন আলুদ মী গরখুদ্।

আমার মতো কাউকে মৃত্যু-আঘাত দিয়ে
তোমার মন যদি খুশি হয়,
আমি তা হলে কৃতজ্ঞ থাকব।
আমার শুধু ভয় হয়
তোমার তরবারি যে রক্ত-কলঙ্কে কলঙ্কিত হবে!

* * *

ওয়াই বারশা-ইরানে না দীদা,
ঘলতি রা বা-খুদ্ পসন্দীদা;
সর্‌ওয়্ রা কাদ্দ্-ই-য়্যার মীস্ত্ গুইন্দ্।
মাহ্ রা রু-ই-উ বেসনজীদা,
মাহ্ জরমী 'স্ত না তমাম' অয়ার,
সর্‌ওয়্ চূবী 'স্ত্ না তরাশিদা।

হায়, সেই হতভাগ্য কবিরা,
যারা কাব্য-উপাদানে ভুল করেছে।
তারা স[illegible]প্রাস বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছে
প্রিয়তমের সুঠাম দীর্ঘ দেহের।
তারা চাঁদের সঙ্গে তু[illegible]না করেছে
প্রিয়তমার মুখলাবণ্যের।
(কিন্তু) চাঁদ তো শুধু একটি অসম্পূর্ণ বস্তু,
সাইপ্রাস তো শুধু একটি কাষ্ঠ দণ্ড মাত্র।

সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের দুটি পদ্মচোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এল-সে বছরটি ছিল ১০৫৫ আঃ হিজ্‌রা, ১৬৪৫ খ্রীস্টাব্দ।

শের আফকনের মৃত্যুতে নূরজাহানের জন্ম, জাহাঙ্গীরের মৃত্যুতে নূরজাহানের মৃত্যু। ১৬১১ থেকে ১৬২৭—এই ষোলটি বছরে আমরা দেখেছি সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের আবির্ভাব, তাঁর বুদ্ধি, চাতুরী ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশের বিস্ময়কর আলেখ্য।

যে কুলবধূটি একদিন বর্ধমানে এক জায়গীরদারের হাবেলীর দেহলিতলে সাঁঝের বাতি জ্বালিয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করত—তার মধ্যে যে এত বিচিত্র সম্ভাবনা ছিল তা কে জানত। প্রদীপ্ত বাসনাশিখায় জ্বলে উঠেছিল মাটির প্রদীপ। সূর্যবল্লভা হবার জন্য সে মেতে উঠেছিল কঠোর সাধনায়। সাধনায় সে সিদ্ধি লাভ করেছিল, বহু-আকাঙ্ক্ষিত জীবন সে পেয়েছিল, মেহেরউন্নিসা পূর্ণ হয়েছিলেন নূরজাহানে! তিনি অঙ্গে ধরেছিলেন অগ্নিস্নাত রূপ, ঘরেবাইরে বিস্তার করেছিলেন দুর্নিবার প্রভাব। সম্রাট আকবরের পর তাঁর ঐতিহ্য ও ভাবধারাকে সার্থক দক্ষতার সঙ্গে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন নূরজাহান—চালিয়েছিলেন ঈর্ষা, প্রতিহিংসা, ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ষড়যন্ত্র পার হয়ে। নূরজাহানের চরম অভ্যুদয় এখানে। ইতিহাসে মুঘল রাজবংশের প্রথম ছ'জন সগৌরবে চিরভাস্বর; তাঁদের মধ্যে আছেন আরেকজন, তিনি চিরভাস্বতী নূরজাহান।

তবু নূরজাহান ভুল করেছিলেন। ভুল করেছিলেন আকাঙ্ক্ষার চারপাশে কোন সীমা না রেখে, আর সীমা ছিল না বলেই জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরেও তিনি নিজের শক্তি ফলানোর পাগলামি দেখিয়েছিলেন। মাথা উঁচু করে গর্বিত ভঙ্গীতে কথা বলেছিলেন আসফ খাঁর সঙ্গে।

তবে নূরজাহান আর পারেন নি—বিগত জীবনের জের টানা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয় নি। তাই স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি দীর্ঘ আঠারটি বছর পা টিপে টিপে চলার অভিশাপ বয়ে চলেছিলেন।

নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে একান্ত সংগোপনে শেষের দিনটির জন্য অপেক্ষা করেছিলেন।

লাহোরের ইরাবতী নদীর ধারে শাহ্‌দারায় সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধিভবনের কাছেই আর একটি সমাধিভবন—বাহুল্যবর্জিত, নিরাভরণ সাধারণ, কালের প্রকোপে জীর্ণ। তার মধ্যে একটি নয়, পাশাপাশি দুটি কবর—মা আর মেয়ে—নূরজাহান ও লাডলী বেগম। ইতিহাসের দুটি পাথুরে প্রমাণ, আর কিছু নয়।

নূরজাহানের কবরের গায়ে খোদাই করা রয়েছে নূরজাহানেরই রচনা ফার্সী শ্লোক :

বর্ মজার-ই-মা ঘরীবান নই চিরাঘী নয় ঘুলী,
নই পর-ই-পরওয়ানা সুজদ বই সদা-ই বুলবুলী।

কবি সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায়—

গরীব গোরে দীপ জ্বেলো না ফুল দিও না কেউ ভুলে—
শামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুলবুলে।

ইরাবতীর বুকে বয়ে যায় জলোচ্ছ্বাস, তার তীরে তীরে চলে মানবজীবনের তরঙ্গরঙ্গ। সে কলধ্বনি, সে জাগ্রত জীবন মাটির গভীরে পৌঁছায় না। সেখানে শুধু নিঃসীম অন্ধকার, আর নির্বাক ইতিহাস।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Ain-i-Akbari—Edited by Blochman (Asiatic Society of Bengal)
2. Akbar-nama—Translated by Beveridge
3. Badsah-nama—Abdul Hamid Lahori (Elliot & Dowson)
4. Iqbal-nama-i-Jahangiri—Motamid Khan (Elliot & Dowson's History of India, etc. vol. 6)
5. Maasir-i-Jahangiri—Khwaja Kamgar Ghariat Khan (Elliot & Dowson)
6. Muntakhab-ul-Lubab—Khafi Khan (Elliot & Dowson)
7. Tamila-Akbarnamma—Inayatullah
8. Cambridge History of India—Vol. 4
9. Catalogue of Paintings in the Central Museum, Lahore—S. N. Gupta
10. Embassy of Sir Thomas Roe to the Court of the Great Mogul, 1615-1619, Edited by—W. Foster
11. Four Eminent Poetesses of Iran—Dr. Md. Ishaque
12. Hawkin's Voyage—Edited by C. Markham
13. History of Bengal, Vol. 2—Edited by J. N. Sarkar
14. History of Fine Arts in India & Ceylon —V. A. Smith
15. History of Hindustan, Vol, 3—Alexander Dow
16. History of India, Book X—Elphinstone
17. History of India as told by its Historians, Vol. 6 —Elliot & Dowson
18. History of Indian Architecture—J. Fergusson
19. History of Jahangir (5th Edition) —Dr. Beni Prasad
20. Lahore—Syed Md. Latif
21. Medieval India—S. Lane Poole
22. Nurjahan and Jahangir—Caunter, Elphinstone, Lane Poole (Selected and Edited by Susil Gupta)

23. Oxford History of India (3rd Edition)
—V. A. Smith

24. Reign of Jahangir—Gladwin (Edited with notes by K. Rangaswami)

25. Storia do Mogor, Vol. 1—Manucci (Translated and Edited by W. Irvine)

26. Voyage to East India—The Rev. Edward Terry

২৭। নূরজাহান—জগদিন্দ্রনাথ রায়

২৮। নূরজাহান—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৯। বাদশাহি গল্প (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩১৮)—যদুনাথ সরকার